মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প

ভাষান্তর/দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৬৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

গৌতম রায়

মুদ্রক
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৯

দার্জিলিঙে সেই কোজাগরী
পূর্ণিমার স্মৃতিতে
নান্নুকে

সূচী

ভূমিকা

আধুনিক ছোটগল্পের রূপকার গী দ্য মপাসাঁর জন্ম ১৮৫০ সালের ৫ই আগস্ট, ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি অঞ্চলে। বাবা গুস্তাফ মপাসাঁ এবং মা লরা লা পয়তেভির দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। মাত্র পনেরো বছর একত্রে থাকার পর তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং তখন মাত্র বারো বছর বয়সে গী তাঁর মার সঙ্গে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। সেই নিতান্ত বালক বয়সেই বাবা-মার দাম্পত্য জীবনের অনেক অশান্তির স্মৃতি তাঁর মনে গভীরভাবে গাঁথা হয়েছিলো, যা পরবর্তী জীবনে তাঁর বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

ছেলেবেলায় স্কুলে ব্যাকরণ, অঙ্ক, লাতিন ইত্যাদি ছাড়াও মার কাছে শেকসপিয়রের নাটক পড়তেন মপাসাঁ। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা তাঁর পছন্দ ছিলো না। ১৮৬৯ সালে আইন পড়ার জন্যে তাঁকে পারী শহরে পাঠানো হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। বিসমার্কের কূট চক্রান্তের শিকার হয়ে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৮৭০ সালে সেডান যুদ্ধের পরাজয় ফরাসী জনজীবনে এক নির্মম আঘাত হানে। ১৮৭৩ সালে সামরিক বিভাগে কেরানীর চাকরি পেলেন মপাসাঁ। কিন্তু তাঁর অবকাশের অধিকাংশ সময়টাই কাটতো স্তেন নদীতে জলবিহার করে অথবা সাহিত্য-গুরু গুস্তাফ ফ্লবেয়রের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায়। প্রকৃতপক্ষে ফ্লবেয়রই এই সময় তাঁকে সাহিত্যচর্চায় তালিম দিতে থাকেন। ফ্লবেয়রের বাড়িতে তখন সাহিত্যের রীতিমতো আড্ডা বসতো—আসতেন ফ্রেদরিক বেঁত্রি, ক্লদিয়স পপলিন, অ্যালেকসান্দর দঁদে। মাঝে মাঝে রাশিয়া থেকে আসতেন আইভান তুর্গেনিভ। আর ১৮৭৪ থেকে প্রায়ই আসতেন এমিল জোলা। ক্রমে জোলাকে ঘিরে পাঁচজন তরুণ সাহিত্যিকের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। স্তেনের তীরে মেদান গ্রামে জোলার বাড়িতে এই 'মেদান গোষ্ঠী'র আসর বসতো। আসরের সামিল হতেন পল অ্যালেকসি, জোরিস কার্ল উসমান, হেনরি সেয়র্ড, লিয়ন হেনিক এবং মপাসাঁ। এঁরা একটি গল্প-সংকলনও প্রকাশ করেন, যার নাম 'লা সয়ার দ্য মেদান'। সংকলনের প্রথম গল্প এমিল জোলার। কিন্তু তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্পটি লিখেছেন মপাসাঁ। সেটা ১৮৮০ সাল।

আসলে সরকারী চাকরিতে বহাল থাকলেও, ১৮৭৬ থেকে অর্থের প্রয়োজনে

মপাসাঁ ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতেন। কিন্তু ১৮৮০ থেকে স্বনামেই তিনি ফরাসী সাহিত্যে নিজের স্থান অধিকার করে নিলেন। সেই থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত দশ বছরে তিনি অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু আনাতোলে ফ্রাঁসের কথাটা মেনে নিয়ে বলতেই হয় যে, আসলে তিনি 'ছোটগল্পের রাজকুমার'। সমাজজীবনে নানা ধরনের নানান চরিত্র দেখেছেন তিনি। তাই প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচার, প্রতিহিংসা সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর নিপুণ লেখনীতে। তাঁর নতুন আঙ্গিক এবং বাস্তবধর্মী রচনা সমস্ত ফরাসী সাহিত্যের রূপরেখাটাকেই পালটে দিয়েছিলো।

১৮৮৮ সালে ছোট ভাই হার্ভে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাওয়ার পর থেকে গী অত্যন্ত মুষড়ে পড়েন। তাঁর নিজের মনেও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর চুল উঠে যাচ্ছিলো, মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা হতো, স্নায়ু দুর্বল হয়ে উঠতো, চর্মরোগ হতো। আসলে যতদূর জানা যায়, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কোন নীতি-শৃঙ্খলার বাঁধন মানতেন না। অনেক নারীর প্রেম বা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেলেও কেউই তাঁকে সত্যিকারের শান্তি বা তৃপ্তি দিতে পারেনি। পরবর্তী কালে দেহের কিছুটা অংশ পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় এবং একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর শরীরে নিদারুণ সিফিলিস রোগের জীবাণু আশ্রয় নিয়েছিলো। ১৮৯২ সালে কান শহরে প্রথম বার আত্মহননের চেষ্টা করেন মপাসাঁ। অবশেষে ডাক্তার ব্লাশ তাঁকে নিজস্ব স্বাস্থ্যনিবাসে নিয়ে আসেন এবং সেখানেই ১৮৯৩ সালের ৬ই জুলাই তাঁর অশান্ত আত্মা চিরশান্তিতে বিশ্রাম নেয়।

প্রাতরাশে বসতে যেতেই মেয়র মশাই খবর পেলেন, গাঁয়ের চৌকিদার দুজন বন্দীকে নিয়ে তার জন্যে চৌকিতে অপেক্ষা করছে। তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, বুড়ো হোচেতুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক বয়স্ক মধ্যবিত্ত দম্পতির দিকে নজর রাখছে। পুরুষটি মোটাসোটা, লাল-রঙা নাক, মাথায় সাদা চুল, চেহারায় একেবারে মুষড়ে পড়ার ভাব। মহিলাটি খানিকটা গোলগাল, বেঁটেখাটো, শক্ত-সমর্থ চেহারা—উদ্ধত চোখে তিনি চৌকিদারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

'ব্যাপার কি, হোচেতুর?' প্রশ্ন করলেন মেয়র।

চৌকিদার তার অভিযোগ পেশ করলো। বললো, শাঁপিয় জঙ্গল থেকে শুরু করে আরজেঁতিউলের সীমানা পর্যন্ত তার এলাকাটা টহল দেবার জন্যে সে সকাল-বেলা যথা সময়েই বেরিয়ে পড়েছিলো। চমৎকার আবহাওয়া আর গমের অপর্যাপ্ত ফলন ছাড়া গ্রামের মধ্যে অস্বাভাবিক কোন কিছুই তার নজরে আসেনি। বুড়ো ব্রিদেলের ছেলে তখন দ্বিতীয়বার তার আঙুরক্ষেতের ডালপালাগুলো ছেঁটে দিচ্ছিলো। ওকে দেখতে পেয়ে সে ডেকে বললো, 'এই যে বাবা হোচেতুর, জঙ্গলের ধারে গিয়ে দেখে এসো। একজোড়া পায়রা ধরতে পারবে—তাদের বয়েস কিন্তু নির্ঘাৎ একশো তিরিশ বছর!' ওর নির্দেশিত পথে গিয়ে সে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে এবং সেখানে অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনে কোন হীন এবং নৈতিক অপরাধ চলছে বলে সন্দেহ করে। চোর-শিকারীকে আচমকা হাতেনাতে ধরে ফেলার ভঙ্গিমায় সে যখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে, তখন তারা প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির কাছে নিজেদের প্রায় বিলিয়ে দিতে বসেছিলো।

অবাক বিস্ময়ে অপরাধীদের দিকে তাকালেন মেয়র। কারণ পুরুষটির বয়েস অবশ্যই ষাট বছর এবং মহিলার অন্ততপক্ষে পঞ্চান্ন। পুরুষটিকেই তিনি প্রথমে জেরা করতে শুরু করলেন। কিন্তু লোকটির কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ যে তার কথা প্রায় শোনাই যায় না।

'কি নাম আপনার?'

'নিকোলাস ব্যুরে।'

'পেশা?'

'জামা-কাপড়ের ব্যবসা। পারীর র‍্যু দে মারতাসে।'

'জঙ্গলের মধ্যে কি করছিলেন ?'

ব্যবসায়ী নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি নিজের ভুঁড়ির দিকে, হাতদুটি উরুর ওপরে লোটানো।

'পৌর-কর্তৃপক্ষের অফিসারটি যা বললেন, আপনি কি তা অস্বীকার করেন ?'

'না, ম্যসিয়।'

'তাহলে আপনি তা স্বীকার করছেন ?'

'হ্যাঁ, ম্যসিয়।'

'নিজের হয়ে আপনার কিছু বলার আছে ?'

'কিছুই নেই, ম্যঁসিয়।'

'আপনার দুষ্কর্মের সঙ্গিনীটিকে কোথায় পেলেন ?'

'উনি আমার স্ত্রী, ম্যঁসিয়।'

'আপনার স্ত্রী ?'

'হ্যাঁ, ম্যঁসিয়।'

'তাহলে…তাহলে…পারীতে কি আপনারা একসঙ্গে থাকেন না ?'

'মাফ করবেন ম্যঁসিয়, আমরা একত্রেই থাকি।'

'তাহলে তো আপনারা নির্ঘাত পাগল—সম্পূর্ণ পাগল ! নইলে বেলা দশটার সময় গ্রামের মধ্যে ওই অবস্থায় কেউ ধরা পড়ে ?'

ব্যবসায়ীটির অবস্থা একেবারে কাঁদ-কাঁদ। মিনমিনে গলায় বললেন, 'উনিই আমাকে জোরাজুরি করছিলেন। আমি ওঁকে বলেছিলাম যে এরকম করাটা ভীষণ বোকামো হবে। কিন্তু জানেনই তো, মেয়েদের মাথায় একবার কিছু ঢুকলে কিছুতেই আর তা থেকে নিষ্কৃতি নেই।'

মেয়র খোলাখুলি কথাবার্তা পছন্দ করেন। তাই মৃদু হেসে বললেন, 'আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু উলটোটাই হওয়া উচিত ছিলো। মতলবটা যদি শুধুমাত্র ওঁর মাথাতেই থাকতো, তাহলে আপনাদের আর এখানে আসতে হতো না।'

ম্যঁসিয় ব্যুরেঁ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন, 'তোমার কাব্যরোগ আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে, দেখলে ? এখন এই বয়সে অশালীনতার অপরাধে আমাদের আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর দোকানপাট বন্ধ করে, সুনাম বিকিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। এই তো হচ্ছে এর ফল ?'

স্বামীর দিকে একবারও না তাকিয়ে মাদাম ব্যুরেঁ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এতটুকুও বিব্রত বা অর্থহীন সঙ্কোচে অভিভূত না হয়ে, নির্দ্বিধায় নিজের বক্তব্য

বুঝিয়ে বললেন :

'আমি জানি মঁ্যসিয়, আমরা নিজেদের ভীষণ উপহাসাস্পদ করে তুলেছি। কিন্তু দয়া করে আপনি আমাকে নিজের পক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিন। আমার বিশ্বাস, সবকিছু শুনলে আপনি সদয় হয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে যাবার অনুমতি দেবেন—কাঠগড়ায় দাঁড়াবার লজ্জা থেকে আমরা অব্যাহতি পাবো।

'অনেক বছর আগে, আমার বয়েস যখন নিতান্তই কম, তখন এই অঞ্চলেই এক রোববারে মঁ্যসিয় ব্যুরেঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ও তখন একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করতো, আর আমি অন্য একটা দোকানে তৈরি-করা পোশাক-আশাক বিক্রি করতাম। সবকিছু এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, মনে হয় বুঝি গতকালের ঘটনা। তখন রোজ লেভাক নামে এক বান্ধবীর সঙ্গে আমি রু্য পিগালে থাকতাম, আর মাঝে-মধ্যে রোববারের দিনটা এখানে এসে কাটাতাম। রোজের একজন প্রেমিক ছিলো, আমার ছিলো না। ওর সেই প্রেমিকটিই আমাদের এখানে নিয়ে আসতো। এক শনিবারের দিন সে আমাকে হাসতে হাসতে বললো, পরদিন সে তার এক বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সে কি বলতে চাইছে তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বললাম, ওতে কিছু লাভ হবে না। কারণ আমি নিষ্পাপ মেয়ে ছিলাম ম্যঁসিয়।

'পরদিন রেল স্টেশনে মঁ্যসিয় ব্যুরেঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। তখন ও রীতিমতো সুদর্শন ছিলো। কিন্তু আমি কিছুতেই ওর কাছে আত্মসমর্পণ করবো না বলে মনস্থির করে রেখেছিলাম, আর তা করিওনি। যাই হোক, আমরা বেজঁতে গিয়ে পৌছলাম। দিনটা ছিলো ভারি চমৎকার, অমন দিনে অকারণেই মনে কেমন যেন দোলা লাগে। আজও দিনগুলো অমন সুন্দর হলে আমি ঠিক আগেকার মতো হয়ে যাই, বোকার মতো কাজকর্ম করি, বুদ্ধিশুদ্ধি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলি। সবুজ ঘাস, দ্রুত উড়ে যাওয়া সোয়ালো পাখি, টুকটুকে লাল পপি, ডেইজি, ঘাসের সুগন্ধ—সবকিছু মিলে আমাকে আবেগে উচ্ছল করে তোলে। এ যেন ঠিক অনভ্যস্ত মানুষের কাছে শ্যাম্পেনের নেশার মতো!

'যাই হোক, সেদিন আবহাওয়া ছিলো চমৎকার—উষ্ণ আর উজ্জ্বল। দৃষ্টির সঙ্গে চোখের ভেতর দিয়ে, নিশ্বাসের সঙ্গে মুখের ভেতর দিয়ে সে উষ্ণতা সে উজ্জ্বলতা যেন শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। রোজ আর সিমঁ প্রতি মুহূর্তেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিলো। মঁ্যসিয় ব্যুরেঁ আর আমি ওদের পেছন পেছন হাঁটছিলাম। দুজনের কেউই খুব একটা কথাবার্তা বলছিলাম না। কারণ মানুষ যখন

পরস্পরকে তেমন ভালো করে চেনে না, তখন বলার মতো খুব একটা কথাও তারা খুঁজে পায় না।...ওকে ভীরু ভীরু দেখাচ্ছিলো, ওর বিব্রত লাজুক ভাবসাব দেখতে ভালোই লাগছিলো আমার।

'অবশেষে আমরা ছোট্ট জঙ্গলটাতে গিয়ে ঢুকলাম। জায়গাটা স্নিগ্ধ শীতল, ঠিক যেন সন্তস্নানের অনুভূতি। চারজনেই বসলাম। রোজ আর তার প্রেমিকটি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে শুরু করলো, কারণ আমাকে খানিকটা কঠোর আর গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, তা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না। এতটুকুও আত্মনিয়ন্ত্রণ না রেখে ওরা তখন আবার চুম্বন আর আলিঙ্গন শুরু করে দিলো, যেন আমরা আদৌ ওখানে নেই। তারপর দুজনে কি যেন ফিসফাস করে, আমাদের একটি কথাও না বলে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেলো। সদ্য-পরিচিত ওই যুবকের সঙ্গে একেবারে একা ওই অবস্থায় থাকতে আমার কেমন লাগছিলো, তা আপনি নিশ্চয়ই কল্পনা করে নিতে পারেন। কিন্তু আমি এত হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম যে খানিকটা সাহস করে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। জিজ্ঞেস করলাম ও কি করে। তাতে ও জানালো, ও একটা কাপড়ের দোকানের সহকারী, যা আমি এক্ষুণি আপনাকে বললাম। কয়েক মিনিট আমরা একসঙ্গে বেড়ালাম। এবং তাতে সাহস পেয়ে ও আমাকে নিয়ে যা খুশি তা করতে চাইলো। কিন্তু আমি তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিয়ে ওকে যথাস্থানে থাকতে বললাম। তাই নয় কি, ম্যঁসিয় ব্যুরেঁ ?'

ম্যঁসিয় ব্যুরেঁ বিভ্রান্ত হয়ে পায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, কোন জবাব দিলেন না। মহিলা ফের বলে চললেন, 'তখন ও বুঝলো, আমি সত্যিকারের ভালো মেয়ে এবং একজন সম্মানিত মানুষের মতোই ও সুন্দর ভাবে আমাকে ভালবাসতে শুরু করলো। তখন থেকে প্রতি রোববারই ও আমার কাছে আসতো। কারণ ও আমাকে ভীষণ ভাবে ভালবেসে ফেলেছিলো, আর আমিও তাই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরের সেপ্টেম্বরেই ও আমাকে বিয়ে করে, আর র‍্যু দে মারতাসে আমরা ব্যবসাটা শুরু করি।

'কয়েকটা বছর আমাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে, ম্যঁসিয়। ব্যবসাটাতে উন্নতি হচ্ছিলো না। গ্রামে বেড়াতে যাওয়া তখন আমাদের সামর্থ্যের মধ্যেই ছিলো না, আর শেষ পর্যন্ত সে কথাটা আমাদের মনেও রইলো না। ব্যবসায়ে নামলে মানুষ ক্যাশবাক্সের কথাই বেশি করে চিন্তা করে। ভালবাসার কথা যারা খুব একটা চিন্তা করে না, তাদের মতো নিজেদের অজান্তেই বয়েস বাড়ছিলো

আমাদের। কিন্তু যতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করে না সে কি হারিয়েছে, ততক্ষণ সেজন্যে তার কোন দুঃখবোধও থাকে না।

তারপর ব্যবসাটা একদিন ভালো ভাবেই চলতে শুরু করলো, ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের কোন ভাবনা রইলো না। অথচ তখন থেকেই আমার যে কি হলো জানি না, সত্যিই জানি না—আমি আবার একটা স্কুলের ছাত্রীর মতো স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। রাস্তায় ফুলের গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাওয়া কোন ফুলওয়ালাকে দেখলেই আমি চিৎকার করে ডাকতাম। ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধ ক্যাশবাক্সের পেছনে আরাম-কুর্সি থেকে আমাকে টেনে তুলতে চাইতো, আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে উঠতো। নীল আকাশ দেখার জন্যে আমি তখন আসন ছেড়ে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতাম। রাস্তা থেকে আকাশের দিকে তাকালে মনে হতো, আকাশটা যেন পারীর ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া একটা আশ্চর্য নদী আর সোয়ালো পাখিগুলো যেন মাছের মতো যাওয়া-আসা করে তার বুক জুড়ে। আমার এ বয়সে এ সব জিনিস ভাবা একেবারেই বোকামো! কিন্তু সারাটা জীবন যে শুধু কাজই করে গেছে, সে এ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে, বলুন? একটা মুহূর্ত আসে যখন মানুষ অনুভব করে, সে আরও কিছু করতে পারতো। তখন মানুষ দুঃখ করে, দুঃখ পায়—হ্যাঁ, ভীষণ দুঃখ পায়! ভেবে দেখুন, বিশটা বছর আমিও অন্যান্য মেয়েদের মতো অরণ্য-পরিবেশে পুরুষের চুম্বন উপভোগ করতে পারতাম। আমি ভাবতাম, গাছের নিচে শরীর এলিয়ে প্রেমিকের সোহাগ অনুভব করা না জানি কতই মনোরম। দিন-রাত আমার মন জুড়ে শুধু ওই একই চিন্তা। নদীর জলে আমি জ্যোৎস্নাধারার স্বপ্ন দেখতাম, মনে হতো আমি যেন সেই জলে শরীর ডুবিয়ে স্নান করছি।

'প্রথম প্রথম এসব কথা মঁসিয় ব্যুরেঁকে বলতে সাহস পেতাম না। জানতাম, ও তাহলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে—ফের ছুঁচ আর তুলো বিক্রি করতে পাঠাবে আমাকে। সত্যি কথা বলতে কি, ও আমার সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তাও বলতো না। আর আয়নায় নিজের দিকে তাকালে আমিও স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, কারুর মনে দোলা দেবার ক্ষমতাও আমার আর নেই!

'অবশেষে মনস্থির করে একদিন সেই গ্রামে বেড়াতে যাবার জন্যে আমি ওঁকে অনুরোধ করলাম, যেখানে প্রথম আমাদের পরিচয় হয়েছিলো। কোন রকম সন্দেহ না করেই আমার প্রস্তাবে রাজী হলো ও। তারপর আজ সকাল নটা নাগাদ আমরা আবার এখানে এসে পৌঁছলাম।

শস্যক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আমি যেন সেই ছেলেমানুষটি হয়ে গেলাম, দেহে মনে ফিরে এলো কৈশোরের সেই অবুঝ চপলতা—কারণ আপনি তো জানেন, মেয়েদের মনটা কখনই বুড়িয়ে যায় না! স্বামীকে তখন আমি আর এখনকার মতো দেখছিলাম না, দেখছিলাম সেই পুরনো দিনের সুদর্শন যুবকটির মতো। আমি শপথ করে বলছি মঁ্যসিয়—এখন আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা যেমন সত্যি, আমার কথাগুলোও ঠিক তাই। আমি যেন নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছিলাম। আমি ওকে চুমু দিতে শুরু করলাম। আমি ওকে খুন করার চেষ্টা করলেও ও বোধ-হয় অতটা অবাক হতো না। শুধু বলছিলো, 'এই সকালবেলায় কি হলো তোমার? মাথাটা খারাপ হয়ে গেলো নাকি!' কিন্তু আমি ওর কোন কথাই শুনছিলাম না, শুনছিলাম শুধু আমার বুকের দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজ। ওকে আমি জোর করে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেলাম।…

'এই হচ্ছে আমার কাহিনী, মঁ্যসিয় লেমেয়ার। আমি সত্যি কথাই বলেছি, আগাগোড়া সবটুকুই সত্যি।'

মেয়র বিচক্ষণ মানুষ। কুসি ছেড়ে উঠলেন তিনি। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আপনারা নিশ্চিন্ত মনে চলে যান মাদাম। তবে বনে জঙ্গলে আর কখনও এমন দুষ্কর্ম করবেন না যেন।'

চুল্লিতে গনগনে আগুন, চায়ের টেবিল দুজনের মতো করে সাজানো। কাউন্ট দ্য সালুর একটা কুর্সির ওপরে তার টুপি, দস্তানা আর পশমী কোটটা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কাউন্টেস তার বাহারী পোশাকটা খুলে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে মদির হাসি হাসছিলেন, আর মণিমুক্তো পরা আঙুলে দু-একটা চূর্ণ কুন্তল যথাস্থানে পরিপাটি করে রাখছিলেন। স্বামীটি গত কয়েক মিনিট ধরেই ওঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, যেন এক্ষুণি কিছু বলবেন এমনি একটা ভাব—কিন্তু ইতস্তত করছেন। অবশেষে বলেই ফেললেন, 'আজ রাতে তোমার চালচলন বড্ড বেপরোয়া ছিলো!'

সরাসরি স্বামীর চোখের দিকে তাকালেন কাউন্টেস। ওঁর সারা মুখে জয়ের অভিব্যক্তি আর অবজ্ঞার ছায়া। 'অবশ্যই তাই,' কুর্সিতে বসে চা ঢালতে লাগলেন উনি।

স্বামী ওঁর উলটো দিকের আসনে গিয়ে বসলেন, 'এতে আমার নিজেকে যথেষ্ট ইয়ে···মানে অপদস্থ বলে মনে হয়েছে।'

'এটা কি নাটক নাকি?' ধনুকের মতো ভ্রূ বাঁকিয়ে কাউন্টেস প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি আমার চালচলনের সমালোচনা করতে চাইছো?'

'আহা, তা নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, তোমার প্রতি ম'্যসিয় বুরেলের মনোযোগটা নিতান্তই অশোভন ছিলো। আমার অধিকার থাকলে আমি···আমি কখনই ওসব সহ্য করতাম না।'

'কেন সোনা, তোমার কি হলো? গত বছর থেকে তুমি নিশ্চয়ই তোমার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে ফেলেছো। এক বছর আগে কে আমাকে প্রেম নিবেদন করলো কি না করলো, তা নিয়ে তো তোমার কোন মাথাব্যথা ছিলো না! যখন আমি জানতে পারলাম যে, তোমার একটি প্রেমিকা আছে, যাকে তুমি পাগলের মতো ভালবাসো—তখন আমি তোমাকে এমনি করেই কথাটা বলেছিলাম, যেমন করে তুমি আজ আমাকে বললে (কিন্তু আমার বলার পেছনে সত্যিকারের কারণ ছিলো)। আমি বলেছিলাম—তুমি আর মাদাম দ্য সারভি সন্দেহজনক ভাবে জড়িয়ে পড়ছো, তোমার ব্যবহার আমাকে দুঃখ দিচ্ছে, আমাকে অপদস্থ করে তুলছে। কিন্তু তুমি তার জবাবে আমাকে কি বলেছিলে, শুনি? তুমি বলেছিলে, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন—দুটি বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে একটা সহজ অংশি-

দায়িত্বের চুক্তি, এক ধরনের সামাজিক বন্ধন, কিন্তু নৈতিক বন্ধন নয়। সত্যি কিনা, বলো? তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলে যে, আমার চাইতে তোমার প্রেমিকা অনেক বেশি আকর্ষণীয়া, আর আমি বড্ড বেশি মেয়েলি। হ্যাঁ, তুমি ঠিক এই কথাটাই বলেছিলে—'বড্ড মেয়েলি'। অবশ্য এ সমস্ত কথা তুমি খুব সুন্দর ভাবেই বলেছিলে। স্বীকার করছি, তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলে যাতে আমি দুঃখ না পাই। দিব্যি করে বলছি, সেজন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম।

'তারপরেই আমরা আলাদা ভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। অর্থাৎ এক ছাদের নিচে থাকলেও আসলে আমরা আলাদা। আমাদের একটি সন্তান ছিলো, তাই পৃথিবীর কাছে আমাদের একটা ভান বজায় রাখারও প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তুমি আকারে ইঙ্গিতে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলে যে আমি যদি কোন প্রেমিককে গ্রহণ করতে চাই, তাহলে তুমি তাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি জানাবে না—শুধু ব্যাপারটা গোপন থাকলেই হলো। এমন কি এ সমস্ত ব্যাপারে মেয়েদের চাতুর্য নিয়ে তুমি একটা লম্বা-চওড়া মজাদার বক্তৃতা পর্যন্ত দিয়েছিলে। বলেছিলে, মেয়েরা কি করে এ সমস্ত ব্যাপার সামলেসুমলে রাখে এবং আরো কত কি। আমি কিন্তু সবকিছু ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলাম। বুঝেছিলাম তুমি তখন মাদাম দ্য সারভিকে গভীর ভাবে ভালবাসো আর আমার দাম্পত্য প্রেম, বৈধ ভালবাসা—তোমার সুখের পথে কাঁটা। কিন্তু সেই থেকে আমাদের সম্পর্কটা দিব্যি সুন্দর ভাবেই চলছে। সমাজে আমরা একসঙ্গে বেরোই ঠিকই, কিন্তু এখানে—আমাদের নিজেদের বাড়িতে—আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি মানুষ। অথচ গত দু-এক মাস ধরে তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন ঈর্ষাতুর হয়ে উঠছো। এর কারণটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আমি ঈর্ষা করছি না, সোনা। কিন্তু তোমার বয়েস এত কম, তুমি এত আবেগপ্রবণ যে আমার ভয় হচ্ছে, তুমি হয়তো নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে দুনিয়ার কাছে সমালোচনার পাত্রী হয়ে উঠবে।'

'তুমি হাসালে! তোমার নিজের চালচলন কিন্তু সমালোচনার খুব একটা ঊর্ধ্বে নয়। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও! নিজে যা করতে পারো না, অন্যকে তা নিয়ে উপদেশ না হয় নাই বা দিলে।'

'তুমি হেসো না লক্ষ্মীটি, এটা হাসির ব্যাপার নয়। আমি তোমাকে বন্ধুর মতো বলছি, একজন সত্যিকারের বন্ধুর মতো। তোমার মন্তব্যগুলো খুব বেশি পরিমাণে

অভিরঞ্জিত।'

'মোটেই না। তুমি যখন মাদাম দ্য সারভির ওপরে তোমার দুর্বলতার কথা আমার কাছে স্বীকার করলে, আমি তখনই ধরে নিলাম যে তোমাকে অনুকরণ করার অধিকারও তুমি আমাকে দিলে। কিন্তু আমি তেমন কিছুই করিনি...'

'আমাকে বলতে দাও...'

'বাধা দিও না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আমি তেমন কিছুই করিনি। এখন অব্দি আমার কোন প্রেমিক পুরুষ নেই। আমি তেমন একজনকে খুঁজছি, কিন্তু এখনও মনোমতো কাউকে পাইনি। সে অবশ্যই সুন্দর হবে—তোমার চাইতেও সুন্দর। এ তো তোমারই প্রশংসা! কিন্তু তুমি যেন সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছো না?'

'এ ধরনের রঙ্গ-রসিকতা সম্পূর্ণ অহেতুক।'

'আমি মোটেই রঙ্গ-রসিকতা করছি না, একান্ত সত্যি কথাই বলছি। এক বছর আগে তুমি আমাকে যা বলেছিলে, আমি তার একটি কথাও ভুলিনি। আমার যখন ইচ্ছে হবে, আমি তখন একটি প্রেমিক জোটাবোই—তা তুমি যা খুশি বলো বা করো, আমার কিচ্ছু এসে যাবে না। যখন তা করবো, তখন তুমি এতটুকু সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারবে না—অন্য অনেকের মতো তুমি তা বুঝতেই পারবে না।'

'এ সমস্ত কথা তুমি বলছো কি করে?'

'বলছি কি করে? কিন্তু প্রিয়তম, বেচারা অসন্দিগ্ধ ম্যঁসিয় দ্য সারভিকে নিয়ে মাদাম দ্য জাস যখন ঠাট্টা করছিলেন, তখন তুমিই কিন্তু সব চাইতে আগে হেসে উঠেছিলে।'

'তা হতে পারে, কিন্তু তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না।'

'তাই নাকি! তাহলে তোমার ধারণা, ম্যঁসিয় দ্য সারভির বেলায় সেটা কৌতুকের ব্যাপার, কিন্তু তোমার বেলায় তা নয়! সত্যি, পুরুষমানুষ কি বিচিত্র! যাক গে, এ সব নিয়ে কথাবার্তা বলতে আমার ভালো লাগে না। শুধু তুমি তৈরি আছো কি না, তা দেখার জন্যেই আমি কথাটা তুললাম।'

'তৈরি? কিসের জন্যে?'

'প্রতারিত হবার জন্যে। পুরুষমানুষ যখন এ সব কথা শুনে রেগে যায় তখন তার অর্থ, সে তৈরি নেই। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, দু মাসের মধ্যে আমি যদি কোন প্রবঞ্চিত স্বামীর কথা তুলি, তা হলে তুমিই সব চাইতে আগে হেসে উঠবে। প্রবঞ্চিতদের ক্ষেত্রে সাধারণত তাই হয়।'

'সত্যি বলছি, আজ রাতে তুমি ভীষণ রূঢ় হয়ে উঠেছো'। তোমাকে আগে আমি কখনও এমন দেখিনি।'

'হ্যাঁ, আমি বদলে গেছি—খারাপ হয়ে গেছি। কিন্তু দোষটা তোমার।'

'লক্ষ্মীটি, এসো আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কথাবার্তা বলি। আমি অনুরোধ করছি, মিনতি করছি—আজ রাতের মতো ম্যঁসিয় বুরেলের অনুরাগকে তুমি অতটা প্রশ্রয় দিও না।'

'তোমার হিংসে হচ্ছে, আমি জানি।'

'না না। কিন্তু লোকে আমাকে উপহাসের চোখে দেখুক, আমি তা চাই না। আর যদি কখনও দেখি ওই লোকটা আজ রাতের মতো আবার তোমাকে অমন করে দু চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে, তাহলে আমি···আমি ওকে পিটিয়ে শেষ করে ফেলবো।'

'তবে কি তুমি আমার প্রেমে পড়েছো? এও কি সম্ভব?'

'নয় কেন? আরও সাংঘাতিক কিছুও করে ফেলতে পারি, এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার জন্যে আমি দুঃখিত—কারণ আমি আর তোমাকে ভালবাসি না।'

কাউণ্ট উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চায়ের টেবিলটা ঘুরে স্ত্রীর পেছনে এসে দ্রুত ওর গলায় একটা চুমু খেয়ে নিলেন।

কুর্সি ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন কাউণ্টেস। চোখ লাল করে বললেন, 'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়? মনে রেখো আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি মানুষ।'

'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, আমি আদর না করে থাকতে পারিনি। আজ রাতে তোমাকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!'

তাহলে আমার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে, বলো?'

'সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। সুন্দর তোমার বাহু আর কাঁধ! তোমার বুক...'

'ম্যঁসিয় বুরেলকে মুগ্ধ করতে পারবে—'

.'কি নীচ তুমি!···কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার মতো এমন মোহিনী মেয়ে আমি আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'ইদানীং তুমি বোধহয় উপোসী আছো?'

'তার মানে ?'

'বলছি যে, ইদানীং তোমার নিশ্চয়ই উপোস যাচ্ছে।'

'কেন ? কি বলতে চাও তুমি ?'

'যা বললাম, তাই বলতে চাইছি। কিছুদিন তোমাকে নিশ্চয়ই উপোস করতে হয়েছে, আর ক্ষিধের জ্বালায় এখন তুমি একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছো। মানুষ অন্য সময় যা কক্ষনো খায় না, ক্ষিধের সময় তাও খায়। আমি অবহেলিত এক-খাদ্য—আজ রাতে সেই অখাদ্যেও তোমার অরুচি নেই।'

'মার্গারিত! এ সব কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে ?'

'তুমিই শিখিয়েছো। আমার জানত তোমার চার-চারটি প্রেয়সী আছে। অভিনেত্রী, উচু সমাজের মেয়ে, রঙ্গিনী, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই দীর্ঘদিনের অনাহার ছাড়া আমার প্রতি তোমার এই হঠাৎ আকর্ষণের আর কি ব্যাখ্যা দেবো, বলো ?'

'তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বর্বর বলে ভাবতে পারো, কিন্তু আমি দ্বিতীয়বার তোমার প্রেমে পড়েছি। তোমাকে আমি পাগলের মতো ভালবাসি!'

'বেশ, বেশ! তাহলে তুমি চাও...'

'ঠিক তাই।'

'আজ রাতে ?'

'ওহ্, মার্গারিত!'

'দাঁড়াও, তুমি আবার অসভ্যতা শুরু করেছো। আগে শান্ত ভাবে কথাবার্তা বলি, এসো। আমরা দুজন দুজনের কাছে অপরিচিত, তাই নয় কি ? আমি তোমার স্ত্রী, তা ঠিক। কিন্তু আমি স্বাধীন! আমার ইচ্ছে, আমি কোন এক-জনকে ভালবাসবো। তবে যদি সমান মূল্যের ক্ষতিপূরণ পাই, তাহলে তোমা-কেই আমি প্রথম সুযোগ দেবো।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কি বলতে চাইছো তুমি ?'

'বেশ, আরও স্পষ্ট করে বলছি। আমি কি তোমার প্রেয়সীদের মতো সুন্দরী ?'

'হাজার গুণ বেশি সুন্দরী।'

'যে সব চাইতে সুন্দরী, তার চাইতেও ?'

'হ্যাঁ, হাজার গুণ বেশি।'

'তিন মাসে তার জন্যে তোমার কত খরচ হয় ?'

'সত্যি—তুমি কি বলতে চাইছো, বলো তো ?'

'বলতে চাইছি, তোমার সব চাইতে দামী প্রেমিকাটির গয়নাগাঁটি, গাড়ি-ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির জন্যে তুমি তিন মাসে কত খরচ করো ?'

'তা কি করে জানবো !'

'জানা উচিত। ধরা যাক, মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ—কেমন, প্রায় তাই না ?'

'হ্যাঁ, প্রায় তাই।'

'বেশ। আমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দাও, আমি আজ রাত থেকে এক মাসের জন্যে তোমার হবো।'

'মার্গারিত ! তুমি কি পাগল হলে ?'

'না, পাগল নই। তবে তোমার ইচ্ছে হলে তা বলতে পারো। আচ্ছা, শুভ-রাত্রি !'

কাউন্টেস নিজের খাস কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। সমস্ত ঘরটাতে একটা মৃদু সৌরভ। কাউন্ট দোরগোড়ায় এসে হাজির হলেন।

'কি সুন্দর গন্ধ এখানে !'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার ? আমি সব সময় পো দ্য এস্পান ব্যবহার করি—তা ছাড়া কক্ষনো আর কিচ্ছু নয়।'

'তাই নাকি ? আমি খেয়াল করিনি। এটা সত্যিই ভারি চমৎকার।'

'হয়তো তাই। কিন্তু এবারে দয়া করে যাও, আমি এখন শোবো।'

'মার্গারিত !'

'তুমি দয়া করে যাবে কি ?'

কাউন্ট ভেতরে ঢুকে একটা কুর্সিতে বসলেন।

'তুমি তা হলে যাবে না ? বেশ !' বললেন কাউন্টেস। তারপর ধীরেসুস্থে পোশাক খুলতে লাগলেন। ওর শুভ্র বাহু এবং ঘাড় অনাবৃত হলো। চুল খোলার জন্যে মাথার ওপরে হাত তুললেন উনি। ওঁর দিকে এক পা এগিয়ে এলেন কাউন্ট।

'এগিয়ো না বলছি, তা হলে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি রেগে যাবো। শুনতে পাচ্ছো ?' কাউন্টেস বললেন।

ওঁকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু দেবার চেষ্টা করলেন কাউন্ট। কাউন্টেস সাজ-গোছ করার টেবিল থেকে দ্রুত একটা সুগন্ধির শিশি তুলে নিয়ে তাঁর মুখে ছুঁড়ে দিলেন। কাউন্ট প্রচণ্ড রেগে উঠেছিলেন। কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে তিনি বিড়-বিড় করে উঠলেন, 'কি যে বোকামো করো !'

'তা হবে হয়তো। কিন্তু তুমি তো আমার শর্ত জানো—মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ !'

'অসম্ভব!'

'কেন, দয়া করে বলো।'

'কেন? কারণ, কে কবে শুনেছে যে মানুষ টাকা দিয়ে নিজের বৌয়ের কাছে আসে!'

'ওঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর!'

'হয়তো আমি নিষ্ঠুর। কিন্তু আবার বলছি, টাকা দিয়ে নিজের স্ত্রীকে পাওয়ার ধারণাটা একেবারে অসম্ভব! সম্পূর্ণ বোকামো!'

'কিন্তু একটি রঙ্গিনীকে টাকা দেওয়া কি আরও খারাপ নয়? বিশেষ করে তোমার বাড়িতে যখন স্ত্রী রয়েছে, তখন সেটা তো নিশ্চয়ই আরও বেশি মূর্খতা।'

'হতে পারে, কিন্তু আমি পরিহাসের পাত্র হতে চাই না।'

কাউণ্টেস বিছানায় বসে মোজা খুলতেই ওঁর নগ্ন গোলাপী পা দুটি প্রকট হয়ে ওঠে। সামান্য এগিয়ে এসে কাউন্ট নরম গলায় বললেন, 'কি অদ্ভুত চিন্তা তোমার, মার্গারিত!'

'কোন্ চিন্তা?'

'আমার কাছে পাঁচ হাজার ফ্রা চাওয়া!'

'অদ্ভুত? কেন, অদ্ভুত কেন হবে? আমরা দুজন কি দুজনের কাছে অপরিচিত নই? তুমি বলছো, তুমি আমার প্রেমে পড়েছো। বেশ, ভালো কথা। কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো না, কারণ আগেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে—আমি তোমার স্ত্রী। কাজেই তুমি আমাকে কিনে নাও। হায় ঈশ্বর, তুমি কি অন্য মেয়েদের কেনোনি! একটা উটকো মেয়ে তোমার টাকা নষ্ট করবে, তার চাইতে সেটা আমাকে দেওয়াই কি বেশি ভালো নয়? কাজেই স্বীকার করো, স্ত্রীকে টাকা দেবার চিন্তাটা কত্তো অভিনব! তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের তো এ জন্যে মজা পাওয়া উচিত। তা ছাড়া একগাদা পয়সা খরচ না করলে, পুরুষমানুষ কক্ষনো কোন জিনিস সত্যিকারের ভালবাসে না। আর তোমার ওই অবৈধ প্রেমের তুলনায় এতে আমাদের দাম্পত্য প্রেমে নতুন উৎসাহের জোয়ার আসবে। ঠিক বলিনি?' ঘণ্টির দিকে এগিয়ে যান কাউণ্টেস, 'এবারে যদি আপনি না যান মশাই, তাহলে আমি ঘণ্টি বাজিয়ে আমার ঝিকে ডাকবো।'

অখুশি কাউন্ট খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আচমকা পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে ছ হাজার আছে, ডাইনী! কিন্তু মনে রেখো...'

কাউণ্টেস টাকাগুলো তুলে গুনে নিলেন, 'কি মনে রাখবো ?'

'এটা তুমি নিয়ম করে নিতে পারবে না।'

হাসিতে ফেটে পড়লেন কাউণ্টেস, 'প্রতি মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ, নয়তো ফের তোমাকে তোমার ওই অভিনেত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবো। আর আমাকে নিয়ে যদি খুশি হও, তাহলে আরও বেশি চাইবো—দর বাড়িয়ে দেবো।'

প্রিয় বন্ধু আমার, আফ্রিকা সম্পর্কে আমার ধারণা এবং আমার অভিযানের কাহিনী, বিশেষ করে এই মোহিনী মায়ার দেশে আমার প্রেম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা—তুমি জানাতে বলেছো। আমার কৃষ্ণাঙ্গিনী প্রেমিকাদের (ভাষাটা তোমার) নিয়ে তুমি আগে অনেক ঠাট্টা-পরিহাস করেছো। বলেছো, একদিন দেখবে আমি একটি দীর্ঘাঙ্গী, আবলুস কাঠের মতো কালো মহিলাকে নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে এসেছি—তার মাথায় হলুদ রেশমী রুমাল বাঁধা, পরনে ঝলমলে পাতলুন।

নিগ্রো ললনাদের একদিন সময় আসবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তাদের মধ্যে আমি এমন অনেককেই দেখেছি, যাদের সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্যে আমি প্রচণ্ড বাসনা অনুভব করেছি। কিন্তু শুরুতেই এমন একজনের সন্ধান পেলাম, যে এদের তুলনায় আরও সরেস এবং একেবারে আলাদা।

শেষ চিঠিতে তুমি লিখেছো, 'কোন একটা দেশে মানুষ কি ভাবে প্রেম করে সে কথা জানলে, আমি সে দেশটাকে বর্ণনা করার মতো যথেষ্ট ভালো ভাবে বুঝে ফেলতে পারি—যদিও সে দেশটাকে হয়তো আমি কোনদিনই দেখিনি।' তাহলে বলি শোনো, এখানকার মানুষ পাগলের মতো প্রেম করে। যে মুহূর্তে কেউ আঙুলের ডগায় অবিরাম বাসনার উন্মাদ শিহরণ অনুভব করে, যে শিহরণ শারীরিক ক্ষমতা আর ইন্দ্রিয় বাসনাকে অতিরিক্ত উত্তেজিত করে তোলে, সেই মুহূর্তে সামান্য হাতের স্পর্শ থেকে সে সেই প্রয়োজনের সীমায় পৌঁছে যায়, যার জন্যে আমরা অনেক বোকামো করে বসি।

আমাকে ভুল বুঝো না। জানি না, তুমি হৃদয়ের প্রেমকে আত্মার প্রেম বলো কিনা। জানি না, পৃথিবীতে ভাবাবেগে ভরা আদর্শময় তথা অতীন্দ্রিয় প্রেমের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা। অন্তত আমার নিজের কিন্তু তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু অন্য ধরনের প্রেম, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ প্রেমের মধ্যে সত্যিই কিছু বস্তু আছে এবং এই জলবায়ুর দেশে সে প্রেম সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর। এখানকার তাপদগ্ধ আবহাওয়া যা মানুষের শরীরে জরাক্রান্ত রোগীর অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসা আগুনের হলকা যাতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, অদূর মরুভূমি থেকে ধেয়ে আসা মারাত্মক মরুঝঞ্ঝা যা আগুনের চাইতেও ধ্বংসাত্মক আর ক্ষতিকর, অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডের মতো সমস্ত মহাদেশটা যার পাথরগুলো পর্যন্ত হিংস্র সূর্যটা

সাগ্রহে পুড়িয়ে দিয়েছে—তার সবটুকু উত্তাপ একসঙ্গে মিশে রক্তে কামনার আগুন ধরায়, মাংসপেশীতে উত্তেজনা আনে, আমাদের পশু করে তোলে।

কিন্তু এবারে আমার গল্পে আসা যাক। আফ্রিকায় অবস্থানের গোড়া থেকেই আমি কিন্তু স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করিনি। বোনা, কনস্তানতাইন, বিস্কারা এবং স্তেইফ ঘুরে চাবেতের সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে আমি বোগীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পথটা চমৎকার, একটা বিশাল অরণ্যের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে। ছ শো ফুট উচ্চতা থেকে সমুদ্রকে অনুসরণ করে অবশেষে পথটা বোগীর সেই অপরূপ উপসাগরে নেমে এসেছে, যেটা নেপলস, অ্যাজাকিও অথবা দার্নেনিজ উপসাগরের মতোই সুন্দর—যেগুলো কিনা আবার আমার জানা উপসাগরগুলোর মধ্যে সুন্দরতম।

বিশাল, শান্ত সমুদ্র খাঁড়িটা প্রদক্ষিণ করার অনেক আগেই বহু দূর থেকে বোগী দেখা যায়। গাছগাছালিতে ছাওয়া একটা উঁচু পাহাড়ের খাড়াইতে বোগী গড়ে উঠেছে। শ্যামল ঢালের মাঝখানে জায়গাটা যেন একটা শ্বেত বিন্দু, যেটাকে সহজেই সমুদ্রের বুকে লুটিয়ে পড়া কোন জলপ্রপাতের শুভ্র ফেনা বলে ধরে নেওয়া যায়।

ছোট্ট এই মন-ভোলানো শহরটাতে পা দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এখানে আমাকে দীর্ঘদিন থাকতে হবে। যে দিকে তাকানো যায় সর্বত্র শুধু রুক্ষ, বিচিত্র আকৃতির গিরিচূড়া—এত পাশাপাশি তাদের অবস্থান যে খোলা দরিয়া প্রায় চোখেই পড়ে না, উপসাগরটাকে মনে হয় যেন একটা হ্রদ। সেখানকার নীল জলরাশি আশ্চর্য স্বচ্ছ। অথচ মাথার ওপরে আকাশটা ঘন নীল, যেন তাতে দু পোঁচ রঙ লাগানো হয়েছে। ওরা যেন একই আয়নার মাধ্যমে পরস্পরকে দেখছে, একে অন্যের সার্থক প্রতিফলন।

বোগী একটা ধ্বংসস্তূপের শহর। পারঘাটার কাছে এই ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য এত চমৎকার যে তোমার হয়তো মনে হবে, তুমি কোন অপেরা দেখছো। এটাই হচ্ছে প্রাচীন সারাসেন দরওয়াজা, এখন আইভি লতায় ছাওয়া। শহরের চতুর্দিকে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলোর ওপরেও অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ—রোমক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, সারাসেন স্মৃতিসৌধের দু-একটা টুকরো আর আরব্য অট্টালিকার অবশিষ্ট অংশবিশেষ।

শহরের ওপরের দিকে একটা ছোট্ট বাড়ি নিয়েছিলাম আমি। এসব আস্তানা-গুলো যে কেমন, তা তো তুমি জানোই—কারণ এগুলোর কথা বহুবারই বর্ণনা

করা হয়েছে। এগুলোতে বাইরের দিকে কোন জানলা নেই কিন্তু ভেতরের প্রাঙ্গণ থেকে আসা আলোর সমস্ত বাড়িগুলো আগাগোড়া আলোকিত থাকে। এগুলোর দোতলায় একটা করে বিশাল ঠাণ্ডা ঘর আছে, যাতে মানুষ দিনের বেলাটা কাটায়। আর রাত কাটানোর জন্যে আছে ছাদের খোলা চত্বর।

সমস্ত গরম দেশের প্রথামতো আমিও অবিলম্বে দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। সেটা হচ্ছে আফ্রিকার সব চাইতে গরমের সময়—এমন দিন যখন মানুষের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়···মাঠ-প্রান্তর, দীর্ঘ ঝকঝকে রাজপথ সবকিছু জনশূন্য হয়ে থাকে···সকলে যথাসম্ভব কম আচ্ছাদনে শরীর আবৃত রেখে ঘুমিয়ে থাকে অথবা ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা অন্তত করে।

আমার বৈঠকখানায় আরবী ভাস্কর্য রীতিতে গড়া কতকগুলো স্তম্ভ ছিলো। ওই ঘরেই একটা লম্বা নরম কৌচ পেতে, আমি তার ওপরে জেবেল আমুর থেকে আনা একটা গালিচা বিছিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় এসাঁ্যার মতো পোশাক পরে আমি বিশ্রাম নিতে চাইছিলাম, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় ঘুমোতে পারছিলাম না। পৃথিবীতে দু ধরনের যন্ত্রণা আছে। আশা করি তুমি তার কোনটাই কোন দিন জানবে না। এর মধ্যে একটা হচ্ছে জলের চাহিদা, অন্যটা নারীর। জানি না, এদের মধ্যে কোন্‌টা বেশি খারাপ। মরুভূমির মধ্যে এক গ্লাস পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের জন্যে মানুষ যে কোন অন্যায় কাজই করতে পারে। আর কতকগুলো উপকূলবর্তী শহরে সুন্দরী নারীর সঙ্গ পাবার জন্যে মানুষ কি না করে? আফ্রিকায় মেয়ের অভাব নেই, বরং অঢেল পাওয়া যায়। কিন্তু আমার উপমার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বলা যায়, তারা মরু সাহারার বুকে কর্দমাক্ত জলাশয়ের মতোই অস্বাস্থ্যকর।

যাই হোক, একদিন স্বাভাবিকের চাইতে বেশি ক্লান্তি অনুভব করায় আমি চোখ দুটো বন্ধ করে রাখবার বৃথা চেষ্টা করছিলাম। পা দুটোতে এত যন্ত্রণা হচ্ছিলো যে মনে হচ্ছিলো, কেউ যেন ওখানে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। অস্বস্তিতে কৌচের ওপরে ছটফট করছিলাম আমি। শেষ [illegible] আর সহ্য করতে না পেরে, উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। সেটা জুলাইয়ের মাঝামাঝি একটা মারাত্মক গ্রীষ্মের দিন। পথঘাট এমন তেতে রয়েছে যে সহজেই তার ওপরে রুটি সেঁকা যায়। ঘামে ভিজে আমার জামাটা গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে ছিলো। দিগন্ত জুড়ে এক আবছা সাদাটে বাষ্প ছড়ানো, যাতে মনে হয় এই উত্তাপ যেন স্পর্শ করা যায়।

সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর বৃত্তাকারে বন্দর প্রদক্ষিণ করে সুন্দর

উপসাগরটার তীর ধরে স্নানের ঘাটগুলোর দিকে এগুতে লাগলাম। কেউ কোথাও নেই, চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। কোন পাখি বা পশুরও কোন সাড়া নেই, ঢেউগুলো পর্যন্ত উপচে পড়ছে না—সমুদ্র যেন সূর্যের আলোয় ঘুমিয়ে রয়েছে। হঠাৎ শান্ত জলে আধডোবা একটা পাথরের পেছন থেকে সামান্য নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, দীর্ঘাঙ্গী এক নগ্ন নারী বুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বসে বসে স্নান করছে। সন্দেহ নেই, মেয়েটি এই ভেবে নিশ্চিন্তে রয়েছে যে, নিদাঘের এই তপ্ত প্রহরে ও এখানে একেবারে একা। ওর মাথা সমুদ্রের দিকে ফেরানো বলে আমাকে দেখতে পাচ্ছিলো না, আপন মনে শান্ত ভাবে জলের ওপরে নিচে দোল খাচ্ছিলো বার বার। উজ্জ্বল আলোয় স্ফটিক-স্বচ্ছ জলে একটি সুন্দরী মেয়ের ছবির চাইতে বিস্ময়কর জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। মেয়েটি যেন একটা পাথরের মূর্তি। আচমকা ফিরে তাকিয়ে ও অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। তারপর খানিকটা সাঁতার কেটে, খানিকটা হেঁটে পাথরটার আড়ালে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেললো। আমি জানতাম, ওকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। তাই বেলাভূমিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই ওর ঘন কালো চুলে ভরা মাথাটা দেখা গেলো। মুখখানা বেশ বড়সড়। পুরু ঠোঁট। সপ্রতিভ তেজোময় দুটি আয়ত চোখ। আর এই জলবায়ুতে তামাটে হয়ে ওঠা ওর ত্বক যেন একখণ্ড পুরনো, শক্ত, জেল্লা লাগানো হাতির দাঁত।

আমাকে ডেকে ও বললো, 'চলে যান!' শক্ত চেহারার মতো ওর কণ্ঠস্বরও যথেষ্ট জোরালো। আমি নড়লাম না দেখে ও ফের বললো, 'আপনার ওখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না, ম্‌'সিয়।' তবুও আমি সরলাম না, ওর মাথাটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো। দশ মিনিট কেটে গেলো। তারপর আবার ওর চুল, কপাল আর চোখ দুটি একটু একটু করে জেগে উঠলো—এত ধীরে আর সন্তর্পণে যে মনে হচ্ছিলো ও বুঝি লুকোচুরি খেলছে, দেখে নিচ্ছে কাছে-পিঠে কে রয়েছে। এবারে ও ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'আপনি আমাকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ছাড়বেন দেখছি! কারণ আপনি যতক্ষণ ওখানে থাকবেন, আমি কিছুতেই জল ছেড়ে উঠবো না।' তখন আমি উঠে চলে গেলাম, কিন্তু বারকয়েক ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না। যখন ও বুঝলো আমি যথেষ্ট দূরে চলে গেছি, তখন জল থেকে উঠে এলো। তারপর আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিচু হয়ে পাহাড়ের একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে, সামনে ঝোলানো একটা সায়ার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পরদিনও আমি সেখানে গেলাম। তখনও ও স্নান করছিলো। কিন্তু এবারে

ওর পরনে স্নানের পোশাক, ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসতে শুরু করলো ও। এক সপ্তাহ পরে আমরা দুজনে দুজনের বন্ধু হয়ে গেলাম এবং তার এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে গেলাম আগ্রহী প্রণয়ী। ওর নাম ছিলো মারোকা, সেটা ও এমন ভাবে উচ্চারণ করতো যেন তার মধ্যে এক ডজন 'র' রয়েছে। ও ছিলো একজন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিলো এক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে যার নাম পঁতাবেজ। ভদ্রলোক ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী—যদিও তাঁর কাজটা কি, তা আমি কোন দিনই জানতে পারিনি। শুধু দেখতাম, তিনি সর্বদাই মহা ব্যস্ত এবং ও ব্যাপারে আর কিছু নিয়ে আমিও আদৌ মাথা ঘামাইনি।

তার পর থেকে মারোকা ওর স্নানের সময় বদলে নিলো। আর প্রতিদিনই দিবানিদ্রার জন্যে আমার বাড়িতে আসতে শুরু করলো। আহা, সে কি দিবা-নিদ্রা! তাকে বিশ্রাম বলা চলে না কিছুতেই। ও এক আশ্চর্য মেয়ে—খানিকটা পশুপ্রকৃতির, কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট। চোখ দুটো সর্বদা কামনায় দীপ্ত। আধখোলা মুখ, তীক্ষ্ণ দাঁত, এমন কি হাসিতেও হিংস্র রমণ আকাঙ্ক্ষা। দুর্লভ স্তন দুটি দীর্ঘ শঙ্খের মতো। সব মিলিয়ে ওর দেহটা যেন পাশবিক, খানিকটা নিকৃষ্ট অথচ মহিম-ময়ী। অসংযত প্রণয় উপভোগ করার জন্যেই যেন ওর সৃষ্টি। ও আমার মনে সেই সব প্রাচীন দেবীদের কথা জাগিয়ে তুলেছিলো, যাঁরা তাঁদের কোমলতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন ঘাসে ঘাসে আর গাছের তলায়।

ওর মনটা ছিলো দুই আর দুইয়ে চারের মতোই সরল। চিন্তা-ভাবনার বদলে উচ্চকিত হাসি ছিলো ওর স্বতঃবৈশিষ্ট্য।

নিজের সৌন্দর্যের জন্যে সহজাত গর্ববশে ও সামান্যতম আবরণকেও ঘৃণা করতো। অচেতন ঔদ্ধত্য নিয়ে বেপরোয়ার মতো ছুটোছুটি লাফালাফি করতো আমার সারা বাড়িতে। অবশেষে চেঁচামেচি হুটোপুটি করে যখন ক্লান্ত হয়ে উঠতো তখন নিবিড় প্রশান্ত ঘুমে তলিয়ে যেতো নিঃশব্দে—অকরুণ উত্তাপ ছোট ছোট ঘামের বিন্দু ফুটিয়ে তুলতো ওর বাদামী ত্বকের ওপরে।

কখনও কখনও সন্ধ্যার সময় ওর স্বামী কোথাও কাজে বেরিয়ে গেলে ও আবার আমার কাছে ফিরে আসতো। তখন ছাদের চত্বরে শুয়ে থাকতাম আমরা, সূক্ষ্ম স্বচ্ছ প্রাচ্য বস্ত্রের সামান্য আবরণ ছাড়া যেখানে কিনা কোন আড়ালই নেই। পাহাড়-ঘেরা উপসাগর আর শহরে যখন পূর্ণ চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়তো, তখন আমরা অন্য ছাদগুলোতে আধ-শোওয়া নিশ্চুপ মানুষদের ছায়া-ছায়া মূর্তি দেখতে পেতাম। তারায় ভরা রাতের ক্লান্তিকর উষ্ণতায় ওরা মাঝে-মধ্যে উঠে জায়গা

পালটে আবার শুয়ে পড়তো।

আফ্রিকার রাতের নিবিড় উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও মারোকা চাঁদের স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় বিবস্ত্র হবার জন্যে জেদ করতো। কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে বলে ওর মনে এতটুকুও চিন্তা ভাবনা ছিলো না। আমার ভয় এবং মিনতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ও এত জোরে চিৎকার করে উঠতো যে তাতে দূরের কুকুরগুলো পর্যন্ত ডেকে উঠতো।

একদিন আমি যখন তারায় ভরা আকাশের নিচে শুয়ে ঘুমোচ্ছি, তখন ও এসে আমার গালিচার ওপরে হাঁটু মুড়ে বসলো। তারপর ওর ঈষৎ বঙ্কিম ঠোঁট দুখানি আমার মুখের খুব কাছাকাছি এনে বললো, 'তুমি আজ আমার বাড়িতে এসে থাকবে।'

আমি ওর কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলতে চাইছো তুমি ?'

'আমার স্বামী দূরে চলে গেছে, তাই তুমি আমার সঙ্গে এসে থাকবে।'

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, 'কেন, তুমিই তো এসে পড়েছো!'

ওর আতপ্ত নিশ্বাস আমার গলার মধ্যে ঢুকিয়ে, অধরের ছোঁয়ায় আমার গোঁফজোড়া সিক্ত করে, প্রায় আমার মুখের ভেতরে ও বলে গেলো, 'আমি সেটা স্মৃতির সঞ্চয় করে রাখতে চাই।'

তবু ওর কথা আমার বোধগম্য হলো না। তখন ও দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই পাগল। আর বেশি কিছু না বলে, আমি বরং এখানেই থামবো।'

সত্যি কথা বলতে কি, দাম্পত্য-গৃহে অভিসারে যাওয়া আমার একটুও পছন্দ নয়। ওগুলো হচ্ছে ইঁদুর ধরা ফাঁদ, যেখানে অবাঞ্ছিতজনেরা সব সময়েই ধরা পড়ে। কিন্তু ও অনুনয়-বিনয় করলো, এমন কি চিৎকার চেঁচামেচিও করলো এবং শেষটায় বললো, 'দেখো, ওখানে তোমাকে আমি কেমন করে ভালবাসবো!'

ওর ইচ্ছেটা এতই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিলো যে আমি নিজেই নিজের কাছে তার কোন ব্যাখ্যা রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা করে মনে হলো, আসলে স্বামীর প্রতি মারোকার এক গভীর ঘৃণা রয়েছে। আর এটা হচ্ছে নারীর সেই গোপন প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা—যা পুরুষকে প্রতারণা করে, বিশেষ করে তারই নিজের বাড়িতে প্রতারণা করে, আনন্দ পেতে চায়।

'তোমার স্বামী কি তোমার ওপরে খুবই নিষ্ঠুর ?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

ওকে বিরক্ত দেখালো, 'না, খুবই সদয়।'
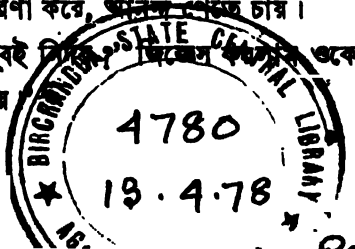
'তুমি কি তাকে পছন্দ করো না ?'

আয়ত চোখ দুটিতে এক রাশ বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকালো ও, 'আমি ওকে সত্যিই খুব পছন্দ করি—ভীষণ পছন্দ। কিন্তু তোমাকে যতটা করি ততটা নয়।'

ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। যখন বোঝার চেষ্টা করছিলাম ও তখন আমার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে এমন একখানা চুমু দিয়ে বসলো, যার ক্ষমতা সম্পর্কে ও খুবই ওয়াকিবহাল। ফিসফিসিয়ে বললো, 'তুমি কিন্তু আজ আসবেই। আসবে না ?' আমি ওর কথায় বিরোধিতা করলাম। আর ও তক্ষুনি উঠে চলে গেলো। এক সপ্তাহের মধ্যে আর ফিরে এলো না। অষ্টম দিনে ও আবার এলো। আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললো, 'আজ রাতে তুমি কি আমার বাড়িতে আসছো ? যদি না আসো, তবে আমি চলে যাবো।'

বন্ধু, আট দিন বড় দীর্ঘ সময়। আর আফ্রিকায় ওই আট দিন যেন পুরো একটা মাস। দু হাত বাড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।' ও এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার দু বাহুর মাঝে।

রাত্রিবেলা কাছের একটা রাস্তায় ও আমার জন্তে অপেক্ষায় ছিলো। আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেলো। বাড়িটা খুবই ছোট, বন্দরের কাছে। প্রথমে ওদের রান্নাঘর পেরিয়ে এলাম, সেখানে ওদের খাবার-দাবার ছিল। তারপর এলাম চুন-কাম করা একটা পরিপাটি করে সাজানো ঘরে। দেওয়ালে অনেকগুলো ছবি, একটা কাচের আধারে কিছু কাগজের ফুল। মারোকা যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করে দিলো। বললো, 'তাহলে এখন তুমি বাড়িতে এলে!'

আমি স্বাভাবিক হাবভাব দেখালেও খানিকটা বিব্রতবোধ করছিলাম—কেমন যেন একটা অস্বস্তি। এই অজানা পরিবেশে নগ্ন হতে কোথায় যেন সংকোচ লাগে, পৌরুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু মারোকা তাকে না জাগিয়ে ছাড়বে না। আমাকে এক রকম জোর করে বিবস্ত্র হতে বাধ্য করে ও। তারপর নিজেও নগ্ন হয়ে পোশাকগুলো দলা পাকিয়ে পাশের ঘরে রেখে আসে। ক্রমশ সাহস আর উত্তেজনা ফিরে পেলাম আমি। বহুক্ষণ ধরে আমার বলিষ্ঠ পৌরুষের স্বাক্ষর রাখ-লাম মারোকার যুবতী শরীরে। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চললো আমাদের আদিম উল্লাস, অথচ তারপরেও আমাদের মধ্যে অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই।

সহসা দরজায় জোর করাঘাত আমাদের চমকে দিল। একটি পুরুষ-কণ্ঠ চিৎ-কার করে বললো, 'মারোকা, আমি।'

ও চমকে উঠলো, 'আমার স্বামী! এই বিছানার নিচে লুকিয়ে পড়ো—শীগগিরি!'

হতবুদ্ধি হয়ে আমি আমার কোটটা খুঁজছিলাম। ও আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, 'এসো, ঢুকে পড়ো!'

আমি সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে বুকে হেঁটে বিছানার নিচে ঢুকে গেলাম। ও গেলো রান্নাঘরে। একটা আলমারি খোলার এবং বন্ধ হবার আওয়াজ পেলাম। কোন একটা জিনিস নিয়ে ও আবার ঘরে ফিরে এলো। বস্তুটা কি, তা আমি দেখতে পেলাম না। কিন্তু সেটা ও খুব তাড়াতাড়ি করে রেখে দিলো। স্বামীটি ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো। ও শান্তগলায় বললো, 'দেশালাইগুলো পাচ্ছি না।' তারপরেই আচমকা বলে উঠলো, 'এই তো, এখানে রয়েছে। দাঁড়াও, আসছি—তোমাকে ভেতরে আনছি।'

লোকটা ভেতরে এলো। আমি তার বিশাল পা দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শরীরের অবশিষ্ট অংশগুলো যদি এই অনুপাতের হয়, তবে সে নিশ্চয় একটা দৈত্যবিশেষ।

চুম্বনের শব্দ পেলাম। মারোকার নগ্ন ত্বকে আলতো আদরের চাপড়। এক-টুকরো হাসি। তারপর লোকটা ফরাসী বিপ্লবগীতি গাইবার মতো জোর উচ্চারণে বললো, 'পয়সার ব্যাগটা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই ফিরে আসতে হলো। তুমি অঘোর ঘুম ঘুমোচ্ছিলে বোধহয়?'

লোকটা আলমারির কাছে গিয়ে, যা চাইছিলো তা খুঁজতে অনেকটা সময় লাগিয়ে দিলো। মারোকা যেন খুব ক্লান্ত—এই ভাবে যখন বিছানায় এলিয়ে পড়লো, তখন সে ওর কাছে এগিয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে সে ওকে সোহাগ করতে চেষ্টা করছিলো, কারণ মারোকা ওর দিকে এক ঝাঁক 'র' ছুঁড়ে দিলো। লোকটার পা দুটো আমার এত কাছাকাছি, যে আমি সে দুটোকে চেপে ধরার জন্যে এক নির্বোধ অবর্ণনীয় বাসনা অনুভব করছিলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখলাম। লোকটা যখন দেখলো তার ইচ্ছেটা সফল হলো না, তখন রেগে গিয়ে বললো, 'আজ রাতে তুমি একটুও লক্ষ্মী মেয়ে নও। আচ্ছা, বিদায়।'

আরও একটা চুমুর শব্দ পেলাম। তারপর সেই পা-জোড়া ঘুরে দাঁড়ালো। অন্য ঘরে যাবার সময় আমি তার জুতোর কাঁটাগুলোও দেখতে পেলাম। সামনের দরজাটা বন্ধ ছিলো, তাই আমি বেঁচে গেলাম!

ধীরে ধীরে আমি আমার নিভৃত আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এলাম। কেমন যেন

অপমানিত বোধ করছিলাম। মারোকা উদ্দাম হাসিতে মুখর হয়ে হাততালি দিতে দিতে আমাকে ঘিরে নাচছিলো। আমি বেপথু শরীরটাকে নিয়ে একটা কুর্সিতে বসে পড়লাম। কিন্তু বসতে না বসতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। কারণ আমি কোন একটা ঠাণ্ডা জিনিসের ওপরে বসে পড়েছিলাম এবং যেহেতু আমার নর্ম সহচরীটির চাইতে আমার দেহে বেশি কোন আচ্ছাদন ছিলো না, তাই-জিনিসটার সরাসরি স্পর্শ আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিলো। ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমি ছুরির মতো ধারালো ছোট্ট একটা কাঠ-কাটা কুঠারের ওপরে বসে-ছিলাম। এটা এখানে কি করে এলো? আমি যখন ভেতরে আসি, তখন নিশ্চয়ই এটা দেখিনি। কিন্তু আমাকে ওভাবে লাফিয়ে উঠতে দেখে, মারোকার তো দু হাত ছড়িয়ে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার উপক্রম!

ওর এই কৌতুক আমার কাছে ঠিক স্থানোপযোগী বলে মনে হলো না। বোকার মতো আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম। তখনও পেছন থেকে নেমে আসা একটা হিম-শিহরণ অনুভব করছিলাম আমি। তাই ওর এই নির্বোধের মতো হাসিতে খানিকটা আহত হলাম।

'তোমার স্বামী যদি আমাকে দেখে ফেলতো?' প্রশ্ন করলাম।

'তাতে কোন বিপদ হতো না,' বললো ও।

'কি বলছো তুমি? বিপদ হতো না? চমৎকার রসিকতা, যা হোক। সে লোকটা তো মাথা নোয়ালেই আমাকে দেখতে পেতো!'

'মাথা সে নোয়াতো না।'

'কেন?' আমি নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করলাম। 'ধরো, তার মাথা থেকে যদি টুপিটা পড়ে যেতো, তবে সে নিশ্চয়ই সেটা কুড়িয়ে নিতো। আর তা হলে...এই পোশাকে আমি আত্মরক্ষার জন্যে যথেষ্ট প্রস্তুতই ছিলাম বোধহয়?'

সবল সুডৌল হাত দুটি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো ও। তারপর যেমন নিচু গলায় বলতো, 'আমি তোমায় ভালবাসি,' তেমনি ফিসফিসিয়ে বললো, 'তাহলে ও আর মাথা উঁচু করে উঠতো না।'

ওর কথা বুঝতে না পেরে বললাম, 'তার মানে?'

আমার দিকে এক ধূর্ত কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে, যে কুর্সিটাতে আমি বসেছিলাম সেটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালো ও। ওর প্রসারিত হাত, হাসি, আধখোলা ঠোঁট, শুভ্র তীক্ষ্ণ হিংস্র দাঁত—সবকিছু সেই কাঠ-কাটার কুঠারটার দিকে আমার আকর্ষণ টেনে নিয়ে গেলো, মোমের আলোয় যার ধারালো ফলাটা ঝকঝক

করে উঠছিলো। যেন ওটা ও তুলে নিতে যাচ্ছে—এমনি ভাবে হাত বাড়িয়ে বাঁ হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে ওর দিকে টেনে নিলো মারোকা। তারপর আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ডান হাত দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলো, যেন ও হাঁটু মুড়ে বসা কোন লোকের গলা কেটে ফেলছে!

বন্ধু, এই হচ্ছে এখানকার লোকের দাম্পত্য কর্তব্য, প্রেম এবং আতিথেয়তা মূল্যায়ন করার রীতি!

সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীতে বোঝাই সমাধিভূমিটা মনে হচ্ছিলো যেন একটা ফুলে ভরা প্রান্তর। উঁচু টুপি, লাল পাতলুন, বুকে আঁটা রঙিন ফিতে, সোনালী বোতাম আর কাঁধে পদমর্যাদাসূচক প্রতীক চিহ্ন নিয়ে অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনীর অফিসাররা সমাধিস্তূপগুলোর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। স্তূপগুলোর ওপরে লোহা, মর্মর পাথর অথবা দারুনির্মিত ক্রুশগুলো যেন উধাও হয়ে যাওয়া মৃতগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে তাদের সাদা অথবা কালো রঙের শোকাতুর বাহুগুলিকে প্রসারিত করে রেখেছে।

এইমাত্র কর্নেল লিমুজিনের স্ত্রীকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। দুদিন আগে স্নান করার সময় উনি জলে ডুবে গিয়েছিলেন। সবই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। পুরোহিতও চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুজন সহকর্মী অফিসারের ওপরে ভর রেখে কর্নেল তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন সমাধিগহ্বরের সামনে—যে গহ্বরের তলায় তখনও ওক কাঠের সেই শবাধারটা দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি, যার ভেতরে তাঁর তরুণী বধূর ইতিমধ্যেই পচে ওঠা দেহটা শোয়ানো রয়েছে।

কর্নেল প্রায় বৃদ্ধ মানুষ, লম্বা-রোগা চেহারা, মুখে সাদা গোঁফ। তিন বছর আগে এক সহকর্মীর কন্যাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। পিতা কর্নেল সতির মৃত্যুর পর মেয়েটি অনাথা হয়ে পড়েছিলো।

যে ক্যাপ্টেন এবং লেফটেন্যান্টের ওপরে ভর রেখে তাদের অধিনায়ক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারা তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলো। তিনি বাধা দিচ্ছিলেন, দু চোখ ভরা জল তিনি বীরের মতো ঠেকিয়ে রেখে বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'না, না…আর একটু কাল!' ওখানেই উনি থাকবার জন্যে জেদ করছিলেন, বারবার তাঁর পা দুটো বেঁকে যাচ্ছিলো সমাধি গহ্বরের পাশে—যে গহ্বরটাকে তাঁর মনে হচ্ছিলো এক অতল পাতাল…যার ভেতরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাঁর হৃদয়, তাঁর জীবন, পৃথিবীতে তাঁর যা কিছু প্রিয়—তাঁর সবকিছু।

সহসা জেনারেল ওরমান্ত এসে হাজির হয়ে কর্নেলের হাত ধরে টানতে টানতে প্রায় জোর করেই সেখান থেকে সরিয়ে আনলেন। বললেন, 'এসো, আমার পুরনো দিনের সহকর্মী, এসো! তুমি কিছুতেই এখানে থাকবে না।'

তাঁর কথা মেনে নিয়ে কর্নেল নিজের বাসস্থানে ফিরে এলেন। পাঠাগারের

দরজা খুলেই টেবিলের ওপরে একখানা চিঠি দেখতে পেলেন তিনি। সেটা হাতে নিতেই বিস্ময় এবং আবেগে তিনি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন।···স্ত্রীর হাতের লেখা তিনি ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। চিঠিতে সেদিনেরই তারিখ আর ডাকঘরের ছাপ। লেফাফা ছিঁড়ে চিঠি বের করে তিনি পড়লেন :

'বাবা, ফেলে আসা দিনগুলোর মতো আজও আপনাকে 'বাবা' বলে ডাকার অনুমতি আমাকে দিন। আপনি যখন এ চিঠি পাবেন, তখন আমি মৃত—মাটির তলায়। তাই হয়তো আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

'আমি আপনার মনে করুণা জাগিয়ে তুলতে, অথবা আমার পাপের গুরুত্ব লাঘব করতে চাই না। আমি শুধু সম্পূর্ণ সত্যটা বলতে চাই, বলতে চাই একটি নারীর সমস্ত সততা দিয়ে—যে নারী আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আত্মহনন করতে চলেছে।

'আপনি যখন দয়াপরবশ হয়ে আমাকে বিয়ে করলেন, তখন আমি কৃতজ্ঞতায় নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিয়েছিলাম, আপনাকে ভালবেসেছিলাম আমার কিশোরী মনের সবটুকু অনুভূতি দিয়ে। আমি আপনাকে ভালবেসেছিলাম, যেমন ভালবাসতাম আমার নিজের বাবাকে—হ্যাঁ, প্রায় ততখানিই। একদিন যখন আমি আপনার হাঁটুর ওপরে বসেছিলাম, আপনি আমাকে চুমু দিচ্ছিলেন—তখন আমি নিজের অজান্তেই আপনাকে 'বাবা' বলে ডেকে ফেলেছিলাম। সে ডাক ছিলো আমার হৃদয়ের আহ্বান, স্বতঃস্ফূর্ত আর সহজাত প্রেরণাময়। সত্যিই আপনি ছিলেন আমার 'পিতা'—তা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমাকে তুমি সব সময় ওই বলেই ডেকো, বাছা। ও ডাক আমাকে আনন্দ দেয়।'

'আমরা শহরে এলাম। তারপর—আমাকে ক্ষমা করবেন বাবা—আমি প্রেমে পড়লাম। দীর্ঘদিন আমি নিজেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম—প্রায় দু বছর। তারপর হায়, আমি হেরে গেলাম! আমি পাপ করেছি, আমি ভ্রষ্টা হয়েছি!

'আর তার কথা? সে কে, তা আপনি কোনদিনই অনুমান করতে পারবেন না। এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট নিশ্চিন্ত, তার কারণ এক ডজন অফিসার সর্বদা আমাকে ঘিরে থাকতো—আমার সঙ্গে থাকতো—যাদের আপনি বলতেন আমার দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ।

'বাবা, আপনি তাকে চিনতে চেষ্টা করবেন না বা তাকে ঘৃণাও করবেন না। সে যা করেছে, তা অন্য যে কোন লোকই তার জায়গায় থাকলে করতো এবং

এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত যে, সে আমাকে ভালবেসেছিলো তার সমস্ত অন্তর দিয়ে।

'কিন্তু শুনুন, একদিন বেকাস দ্বীপে আমাদের দেখা করার কথা ছিলো। আপনি ওই ছোট্ট দ্বীপটাকে চেনেন, মিলের খুব কাছেই দ্বীপটা। সেখানে আমাকে সাঁতার কেটে যেতে হয়েছিলো। আর আমার জন্যে ওকে সেখানে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো ঘন গাছগাছালির আড়ালে—রাত্রি নামা পর্যন্ত সেখানেই ওকে থাকতে হবে, যাতে ফেরার সময় কেউ ওকে দেখতে না পায়। ওর সঙ্গে আমার সবেমাত্র দেখা হয়েছে, এমন সময় ডালপালার ভেতরে একটা ফাঁক দেখা গেলো এবং সেখানে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম আপনার আর্দালি ফিলিপকে। আমার মনে হলো আমরা বুঝি শেষ হয়ে গেলাম, চিৎকার করে উঠলাম আমি। তাতে সে, আমার প্রেমিক পুরুষ, আমাকে বললো, 'তুমি চুপচাপ সাঁতার কেটে ফিরে যাও, সোনা। আমাকে এই লোকট র সঙ্গে একা থাকতে দাও।'

'আমি এত উত্তেজিত হয়ে ফিরে এলাম যে নিজেকে প্রায় ডুবিয়েই দিয়েছিলাম। ফিরে এলাম আপনার কাছে, এই আশঙ্কা নিয়ে যে হয়তো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে বৈঠকখানার বাইরের লবিতে ফিলিপের সঙ্গে দেখা হতে, সে আমাকে মৃদুভাষে বললো, 'আমি মাদামের হুকুম তালিম করার জন্যে রয়েছি। যদি আমাকে দিয়ে কোন চিঠি পাঠাবার থাকে, তো মাদাম আমাকে দিতে পারেন।' তখন আমি বুঝলাম, সে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে—আমার প্রেমিক-পুরুষ কিনে নিয়েছে তাকে।

'আমি তাকে কতকগুলো চিঠি দিয়েছিলাম—বলতে গেলে আমার সমস্ত চিঠিই সে নিয়ে গিয়েছিলো…এনে দিয়েছিলো সেগুলোর উত্তর। এভাবে দু মাস কাটলো। ফিলিপের ওপরে আমাদের আস্থা ছিলো, যেমন ছিলো আপনার নিজেরও।

'বাবা, এবারে ঘটনাটা কি হয়েছিলো বলি। একদিন সেই একই দ্বীপে আমাকে সাঁতরে যেতে হয়েছিলো, কিন্তু একা। সেখানে গিয়ে আমি আপনার আর্দালিকে দেখতে পেলাম। লোকটা আমার জন্যেই সেখানে অপেক্ষা করছিলো। আমাকে সে জানালো, আমাদের সমস্ত কথা সে আপনার কাছে প্রকাশ করে দেবে, আমাদের কাছ থেকে চুরি করে রাখা চিঠিগুলোও আপনার হাতে তুলে দেবে—যদি না আমি তার কামনা পরিতৃপ্তির জন্যে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করি।

'ওহ্, বাবা! আতঙ্কে আমি ভয়ে উঠলাম…কাপুরুষের মতো ভয়, অর্থহীন

ভয়, সবার ওপরে ভয় আপনার জন্যে—যিনি আমার ওপরে কতো সদয় অথচ যাঁকে আমি প্রতারণা করেছি! ভয় ওঁর জন্যেও—হয়তো ওঁকে আপনি খুন করে ফেলবেন, আর ভয় হয়তো আমার নিজের জন্যে!…আমি পাগল হয়ে গেলাম, মরিয়া হয়ে উঠলাম। আরও একবার এই শয়তানটাকে কিনে নেবার কথা ভাবলাম আমি। সেটাও কিনা আমাকে ভালবাসে—ওঃ কি লজ্জার কথা!

'আমরা, মেয়েরা এত দুর্বল…আপনাদের চাইতে অনেক বেশি সহজে আমরা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। তা ছাড়া মেয়েরা একবার নিচে পড়লে, সর্বদা নিচে আরও নিচে পড়তে থাকে। আমি কি করছিলাম, তা কি আমি জানতাম? শুধু বুঝতে পেরেছিলাম, আপনাদের দুজনের মধ্যে যে কোন একজন এবং আমি মরতে চলেছি—তাই ওই পশুটার কাছেই নিজেকে সঁপে দিলাম। তারপর—তারপর যা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিলো, তাই ঘটলো। ও-ই আমাকে বেশির ভাগ পেয়েছে, পেয়েছে বারবার, ভয় দেখিয়ে, যখন খুশি হয়েছে তখনই। অন্যজনের মতো সে-ও আমার প্রেমিক হয়ে উঠলো, প্রতিদিন। জঘন্য নয় কি? এর শাস্তি কি, বাবা?

'এমনি করে আমার ওপর দিয়ে সবকিছু ঘটে গেলো। আমি মরবোই। বেঁচে থাকতে এমন একটা অপরাধের কথা আপনার কাছে স্বীকার করতে পারিনি। মরে গেলে আমি কিছুকেই ভয় করি না। মরণ ছাড়া আমার আর কোন গতি নেই—কোন কিছুই আমাকে ধুয়ে মুছে অমলিন করে রাখতে পারেনি —আমি অতিমাত্রায় কলঙ্কিনী। আমি আর ভালবাসতে পারি না বা ভালবাসা পেতেও পারি না। মনে হচ্ছে, শুধুমাত্র আমার হাতখানা স্পর্শ করতে দিয়েই আমি সকলকে কলঙ্কিত করে ফেলছি।

'এখুনি আমি স্নান করতে যাচ্ছি, আর কোন দিনই ফিরে আসবো না। আপনার কাছে লেখা আমার এ চিঠিটা আমার প্রেমিক-পুরুষের কাছে যাবে। এটা যখন তাঁর কাছে গিয়ে পৌছবে, তখন আমি মৃত। এ বিষয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে, সে আমার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী চিঠিটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে। সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে আপনি তা পড়বেন।

'বিদায়, বাবা! আপনাকে আমার আর কিছুই বলার নেই। আপনার যা ইচ্ছে হয় করবেন, আর ক্ষমা করবেন আমাকে।'

ঘাম জমে ওঠা কপালটা মুছে নিলেন কর্নেল। তাঁর ধীরস্থির স্বভাব, যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াতেন তখনকার শান্ত মেজাজ—আচমকা ফিরে এলো তাঁর

[illegible]। ঘণ্টি বাজালেন তিনি।

একজন ভৃত্য এসে হাজির হলো। 'ফিলিপকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও,' বললেন কর্নেল। তারপর টেবিলের দেরাজটা খুললেন।

লোকটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুকলো—বিশাল চেহারার এক সৈনিক, লাল রঙের গোঁফ, কুটিল দৃষ্টি আর ধূর্ত দুই চোখ।

কর্নেল সোজাসুজি লোকটার মুখের দিকে তাকালেন।

'আমার স্ত্রীর প্রেমিকের নামটা আমাকে বলো।'

'কিন্তু কর্নেল...'

এক ঝটকায় আধ-খোলা দেরাজ থেকে নিজের রিভলভারটা তুলে নিলেন কর্নেল, 'শীগগিরি বলো! তুমি তো জানো, আমি রসিকতা করি না।'

'ইয়ে...মানে হুজুর...উনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন সেণ্ট আলবার্ত।'

নামটা সে উচ্চারণ করতে না করতেই একটা আগুনের ঝলক তার দু চোখের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেলো, মুখ থুবড়ে পড়লো সে। একটা গুলি তার কপালটা ভেদ করে গিয়েছিলো।

রোজারের পদ্ধতি

একদিন আমি রোজারের সঙ্গে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটা ফেরিওয়ালা আমাদের কানের কাছে হাঁক পাড়লো, 'শাশুড়ীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার নতুন পদ্ধতি! কিনুন, কিনুন!'

থমকে দাঁড়িয়ে সঙ্গীটিকে বললাম, 'অনেক দিন থেকেই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বলে ভাবছিলাম, ফেরিওয়ালাটার ডাকে মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, তোমার স্ত্রী যে প্রায়ই বলে 'রোজারের পদ্ধতি', সেটা কি বস্তু? কথাটা নিয়ে ও এত ঠাট্টা তামাশা করে যে মনে হয়, ওটা কোন খুচরো প্রেমের ব্যাপার—যার রহস্যটা তুমি জানো। যখনই ও শোনে কোন যুবক ভয়ংকর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, স্নায়ুর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে—তখনই ও তোমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে বলে, 'ওকে তোমার রোজারের প্রণালীটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত।' সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে, তা শুনে তুমি সর্বদা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠো।'

'তার কারণ আছে,' রোজার বললো। 'আমার স্ত্রী যদি সত্যি সত্যি জানতো ও কি নিয়ে কথা বলছে, তা হলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে থেমে যেতো। আমি তোমাকে গল্পটা বলবো, কিন্তু ঘটনাটা তুমি সম্পূর্ণ গোপন রাখবে। তুমি তো জানো আমি একটি বিধবাকে বিয়ে করেছিলাম, যাকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম। আমার স্ত্রীর মুখে কোন কথাই আটকায় না এবং ও আমার স্ত্রী হওয়ার আগে আমরা একটু-আধটু রসালো কথাবার্তাও বলতাম। অবশ্য বিধবাদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব। তার কারণ বুঝতেই পারছো, তাদের মুখে জিনিসটার স্বাদ রয়ে গেছে। এই ধরনের গল্পগাছা ও সত্যিই খুব পছন্দ করতো। অশ্লীল কথাবার্তায় তেমন কিছু ক্ষতি হয় না। ও ছিলো বেহায়া, আর আমি ছিলাম লাজুক। বিয়ের আগে ও এমন সব ঠাট্টা-পরিহাস আর প্রশ্ন দিয়ে আমাকে বিব্রত করে তুলে মজা পেতো যে, সে সবের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হতো না। হয়তো ওর নির্লজ্জতার জন্যেই আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম। আর সে প্রেমের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমি মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ওকে উৎসর্গ করেছিলাম এবং ওই মুখরা মহিলাটিও সে কথা জানতো।

'বিয়েটা অনাড়ম্বর ভাবেই হবে বলে আমরা স্থির করেছিলাম, মধুচন্দ্রিমাও হবে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে সাক্ষীরা আমাদের সঙ্গেই দুপুরের

খাওয়াদাওয়া সেরে নেবেন। তারপর গাড়িতে করে একটু বেড়িয়ে, আমরা নৈশভোজ করার জন্যে র‍্য হু হেদারে আমার বাড়িতে ফিরে আসবো। সেইমতো সাক্ষীরা বিদায় নিলো, আমরা একটা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। কোচোয়ানকে বললাম, আমাদের বয়া স্ত বুলোঁতে নিয়ে যেতে। সেটা জুনের শেষ, চমৎকার আবহাওয়া।

'আমরা একা হতেই ও হাসতে শুরু করলো। বললো, 'এই হচ্ছে তোমার নিজেকে সাহসী দেখাবার সময়। দেখি, তুমি কি করতে পারো'!

'ওই আমন্ত্রণ আমাকে সম্পূর্ণ অসাড় করে তুললো। আমি ওর হাতে চুমু দিলাম। বললাম, আমি ওকে ভালবাসি। এমন কি দু-দুবার ওর ঘাড়ে চুমু দেবার জন্যে কাছেও টেনে আনলাম। কিন্তু পথচারীরা আমাকে বিব্রত করে তুলছিলো। আর ও আমাকে উত্তেজিত করে তোলার জন্যে মজা করে বলছিলো, 'এর পর ? এর পরে কি' ?

'এই 'এর পরে কি' ? কথাটাই আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিলো। শত হলেও গাড়িতে, পার্কের মধ্যে, উজ্জ্বল দিনের আলোয় মানুষ এর চাইতে বেশি··· মানে, বুঝতেই পারছো আমি কি বলতে চাইছি।

'আমার সুস্পষ্ট বিব্রত অবস্থা দেখে ও খুব মজা পেলো। মাঝে মাঝেই বলতে লাগলো, 'আমার কিন্তু ভারি ভয় হচ্ছে, আমি কি করলাম। তুমি আমাকেও ভীষণ অস্বচ্ছন্দ করে তুলছো, কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে'।

'আমারও নিজের সম্পর্কে অস্বস্তি হতে শুরু করেছিলো। বুঝতে পারছিলাম, বিচলিত হয়ে পড়লেই আমি সম্পূর্ণ অকেজো আর অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবো। নৈশভোজের সময় ভারি আকর্ষণীয় লাগছিলো ওকে। সাহস সঞ্চয় করার জন্যে আমি আমার চাকরটিকে ছুটি দিয়ে দিলাম, কারণ তার উপস্থিতিতে আমার নিজেকে বিব্রত লাগছিলো। আমাদের পারস্পরিক আচার-আচরণ ছিলো সম্পূর্ণ কেতামাফিক—কিন্তু তুমি তো জানো, প্রেমিকরা কেমন বোকা হয়! আমরা একই পাত্র থেকে পান করলাম, খেলাম একই প্লেটে একই কাঁটা-চামচে। মজা করার জন্যে একটা বিস্কুটই দুজনে দুদিক থেকে খেতে শুরু করলাম, যাতে মাঝখানে আমাদের দুজনের ঠোঁট এসে মিলিত হয়।

'ও বললো, 'আমি একটু শ্যাম্পেন পান করতে চাই'।

'বোতলটা আমি ভুল করে তাকওয়ালা ছোট্ট টেবিলটাতে ফেলে এসেছিলাম। নিয়ে এসে মোচড় দিলাম, তারপর ছিপি খোলার জন্যে চাপ দিলাম।

কিন্তু খুললো না। গ্যাব্রিয়েল মুচকি হেসে অস্ফুট স্বরে বললো, 'অশুভ লক্ষণ'।

'বুড়ো আঙুল দিয়ে আমি ছিপিটার ওপরের অংশে চাপ দিলাম, বাঁ দিকে ঘোরালাম, ডাইনে ঘোরালাম—কিন্তু বৃথাই। তারপর আচমকা বোতলের ঠিক মুখের কাছটা ভেঙে ফেললাম।

'বেচারা রোজার,' গ্যাব্রিয়েল দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'ছিপি খোলার একটা প্যাঁচ নিয়ে আমি সেটা অবশিষ্ট টুকরোটার মধ্যে গেঁথে দিলাম, কিন্তু তুলে আনতে পারলাম না। তাই ফের প্রসপারকে ডেকে আনতে হলো। আমার বউ তখন হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে আর বলছে, 'বেশ, বেশ! তাহলে দেখছি তোমার ওপরে আমি নির্ভর করতে পারি!' ও তখন সামান্য মাতাল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু যখন আমরা কফি খাচ্ছি, তখন ওর নেশা আরও চড়েছে। কমবয়সী মেয়েদের বিছানায় পাঠাতে হলে যেমন জননীসুলভ মিনতি করার প্রয়োজন হয়, একজন বিধবার বেলায় তার দরকার হয় না। গ্যাব্রিয়েল শান্ত ভাবেই ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বলে গেলো, 'সিকি ঘণ্টা বসে বসে চুরুট টানো'।

'স্বীকার করছি, যখন ফের ওর কাছে গেলাম তখন আমি নিজের ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। নিজেকে আমার শক্তিহীন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর অসহায় বলে মনে হচ্ছিলো।

'আমি আমার বিধিসঙ্গত জায়গাটা নিলাম, ও কিছুই বললো না। শুধু আমাকে পরিহাস করার বাসনায় ঠোঁটে আলতো হাসি মেখে আমার দিকে তাকালো। ওই মুহূর্তে পরিহাস হচ্ছে সহনশক্তির শেষতম সীমা। স্বীকার করতেই হবে, তাতে আমার হাত পা—দুই-ই অনড় হয়ে উঠলো।

'গ্যাব্রিয়েল কিন্তু আমার অমন হতবুদ্ধি অবস্থা দেখেও আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে কিছুই করলো না। বরং নৈর্ব্যক্তিক ভাবে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি সব সময়েই এ রকম প্রাণবন্ত নাকি'?

'থামো! তুমি একেবারে অসহ্য,' আমি আর না বলে পারলাম না।

'ও তবু হেসেই চললো। কিন্তু অসংযত, উদ্দাম, অশোভন হাসি।

'সত্যি, আমাকে নির্ঘাত একটা গবেটের মতো লাগছিলো।

'উচ্ছ্বাসে নতুন করে ভেঙে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ও হাসতে হাসতে বলছিলো, 'আরে এসো, বেচারা! সাহস করে এগিয়ে এসো!' হাসির বাড়াবাড়িতে ও প্রায় চিৎকারই করছিলো বলা চলে। অবশেষে আমি এত ক্লান্ত হয়ে উঠলাম, ওর

এবং আমার নিজের ওপরে এত ক্ষেপে গেলাম যে মনে হলো, আমি এখান থেকে চলে না গেলে হয়তো ওকে খুনই করে ফেলবো। তাই ওকে একটি কথাও না বলে এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দ্রুত পোশাক পরে নিলাম।

'আমাকে রাগতে দেখে ও সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে উঠলো, 'কি করছো তুমি? কোথায় চললে'?

'কোন জবাব না দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি কাউকে খুন করতে চাইছিলাম, সম্পূর্ণ পাগলের মতো কিছু করতে চাইছিলাম। লম্বা,লম্বা পা ফেলে দ্রুতগতিতে সামনের দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ মনে হলো, কোন মেয়েমানুষের কাছে গেলে হয়। কে জানে—সেটাতে হয়তো যোগ্যতার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে নেওয়া যাবে, একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে, আর তাতে প্রতিশোধও নেওয়া হবে। তাছাড়া আমি যদি স্ত্রীর কাছে প্রতারিত হই, তাহলে তাকেই বরঞ্চ আগে প্রতারণা করবো।

'আর দ্বিধা করলাম না। আমার বাড়ির কাছেই ও ধরনের একটা বাড়ি আছে জানতাম। সাঁতার কাটা মনে আছে কি না দেখার জন্যে কোন লোক যেমনকরে গভীর জলের মধ্যে নিজেকে ছুঁড়ে দেয়, ঠিক তেমনি করে আমিও সেখানে ছুটে গেলাম।

'হ্যাঁ, সাঁতার দিতে আমি পারি। চমৎকার সাঁতার কাটলাম। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে থেকে আমি আমার গোপন, চতুর প্রতিশোধ পদ্ধতি উপভোগ করলাম। তারপর ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে আবার রাস্তায় নেমে এলাম। এখন শৌর্যের কাজ করার পক্ষে নিজেকে আমার শান্ত, সুনিশ্চিত আর প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছিলো।

'ধীরেসুস্থে বাড়িতে ফিরে এসে নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুললাম।

'বালিশে কনুই রেখে গ্যাব্রিয়েল কি যেন পড়ছিলো। মাথা তুলে ভয় জড়ানো গলায় বললো, 'যাক, তা হলে এসেছো! কোথায় ছিলে এতক্ষণ'?

'কোন জবাব না দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পোশাক ছাড়লাম। যেখান থেকে শোচনীয়ভাবে পালিয়ে গিয়েছিলাম, সেখানেই ফিরে এলাম বিজয়ী ঈশ্বরের মতো। ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে উঠেছিলো। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন আমি কোন তুক মন্তর কাজে লাগিয়েছিলাম। সেই থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ও 'রোজারের পদ্ধতি'র কথা বলে, যেন সত্যি সত্যি কোন অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক পন্থার কথা বলছে।

'ঘটনাটা দশ বছর আগেকার। আমার আশঙ্কা, এখনকার দিনে এটা হয়তো আর অতটা কার্যকরী হবে না—অন্তত আমার ক্ষেত্রে। কিন্তু তোমার কোন বন্ধুর যদি বিয়ের রাত সম্পর্কে ভয়টয় থাকে, তবে তাকে আমার ওই কৌশলটার কথা বলে দিও। আর এ কথাও বোলো যে বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস অব্দি সময়ে ফাঁস ঢিলে করার পক্ষে এর চাইতে ভালো পথ আর কিছু নেই।'

বিদেহী

একটা সাম্প্রতিক মামলার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের কথাবার্তার ধারাটা অলৌকিকতার দিকে ঘুরে গেলো। আমাদের প্রত্যেকেরই বলার মতো একটা করে গল্প ছিল, যা আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যি ঘটনা বলে জাহির করলাম। আসলে আমরা কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু মিলে ক্ম্য দ্য গ্রেনেলের একটা প্রাচীন গৃহস্থ বাড়িতে একটা মনোরম সন্ধ্যা উদ্‌যাপন করছিলাম। মজলিসটা এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অবশেষে বিরাশীটি শৈত্যের ভারে ন্যুব্জ দেহ বৃদ্ধ মারকুইস দ্য লা তুর-সামুয়েল ম্যান্টেলপিসে ভর রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং খানিকটা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন :

'আমিও একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা জানি এবং সেটা এতই বিচিত্র যে তা আমার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর স্মৃতি হয়ে রয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছিলো আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে। কিন্তু সেটা আমার মনে এমন ভীতির ছাপ রেখে গিয়েছিলো এবং এখনও রেখেছে যে, আজ পর্যন্ত এমন একটা মাসও যায়নি যে মাসে আমি ঘটনাটা ফের স্বপ্নে দেখিনি। দশ মিনিট ধরে আমি এমন এক ভয়ংকর আতঙ্ক অনুভব করেছিলাম যে সেই থেকে আচমকা কোন শব্দ শুনলে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, রাতের অস্পষ্ট অন্ধকারে আবছাভাবে কোন জিনিস দেখতে পেলে সেখান থেকে ছুটে পালাবার জন্যে এক তীব্র তাগিদ অনুভব করি। মোদ্দা কথা, অন্ধকারে আমি ভয় পাই!

'কিন্তু না, আমার এখনকার বয়েসে পৌছনোর আগে পর্যন্ত সেটা আমার পক্ষে সত্যি ঘটনা বলে প্রকাশ করা উচিত ছিলো না। এখন আমি যা খুশি তাই বলতে পারি। সত্যিকারের বিপদের মুখে আমি কোন দিনই পেছিয়ে আসিনি। কাজেই বিরাশী বছর বয়সে একটা কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কায় আমি আর জোর করে সাহসী হয়ে ওঠারও কোন প্রয়োজন অনুভব করি না।

'ঘটনাটা আমাকে এমন সম্পূর্ণভাবে বিচলিত করে তুলেছিলো, এমন দীর্ঘস্থায়ী এক রহস্যময় অস্বস্তিতে আমাকে ভরিয়ে তুলেছিলো যে আমি কোন দিনই সেটার বিষয়ে কাউকে কিছু বলিনি। যাই হোক, কোন কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা না করে এখন আমি সঠিক যা ঘটেছিলো, তা তোমাদের বলবো।

'আঠারশো সাতাশ সালের জুলাই মাসে আমি রুয়ে'র দুর্গে ছিলাম। একদিন

জাহাজঘাটা দিয়ে হাঁটার সময় একটা লোককে আমার কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকলো, কিন্তু ঠিকমতো বুঝতে পারলাম না লোকটা কে। সহজাত প্রবৃত্তিবশেই আমি থামতে যাচ্ছিলাম, লোকটাও তা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে দিলো।

'লোকটা আসলে আমারই যৌবনের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। পাঁচ বছর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। মনে হচ্ছিলো, ওর বয়েস বুঝি আধখানা শতাব্দী পেরিয়ে এসেছে। চুলগুলো রীতিমতো সাদা। এমন ভাবে সে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটছিলো যে মনে হচ্ছিলো, বুঝি একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে আমার বিস্ময় বুঝতে পেরে সে আমাকে তার দুর্ভাগ্যের কথা শোনালো, যা কিনা তার জীবনটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে।

'একটি মেয়েকে সে পাগলের মতো ভালবেসে বিয়ে করেছিলো। কিন্তু একটা বছর পার্থিব সুখের চাইতেও বেশি আনন্দ উপভোগ করার পর, মেয়েটি আচমকা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। মেয়েটিকে কবর দেবার দিনেই সে তার প্রাসাদ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রুয়েঁতে বসবাস করার জন্যে চলে আসে। এখনও সে রুয়েঁতেই জীবন্মৃত অবস্থায় নিঃসঙ্গ, বেদনার্ত জীবন যাপন করছে—দিন কাটাচ্ছে এমন করুণভাবে যে অনবরত সে শুধু আত্মহত্যা করার কথাই চিন্তা করে।

'আমাকে সে বললো, 'এখন যখন তোমার দেখা পেলাম, তখন তোমাকে আমি আমার জন্যে একটা বিশেষ দরকারী কাজ করতে অনুরোধ করবো। কাজটা হচ্ছে, আমার পুরনো বাড়িটাতে গিয়ে আমার···মানে আমাদের শোবার ঘরের টেবিলটা থেকে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে আসা—সেগুলো আমার ভীষণ দরকার। আমি এ জন্যে কোন চাকরবাকর বা অন্য কোন লোককে পাঠাতে পারি না, কারণ এ ব্যাপারটাতে গোপনীয়তা এবং সম্পূর্ণ নীরবতা বজায় রাখা প্রয়োজন। আর আমার নিজের সম্পর্কে কথা হচ্ছে, তামাম দুনিয়ার কোন কিছুই আমাকে আর ও বাড়িতে ঢোকাতে পারবে না। তোমাকে আমি ঘরের চাবিটা দেবো, সেটা আমি আসার সময় নিজেই আটকে এসেছিলাম। টেবিলের চাবিটাও দেবো আর সেই সঙ্গে মালিকেও একটা চিঠি লিখে দেবো, যাতে সে বাড়িটা তোমাকে খুলে দেয়। কিন্তু আসছে কাল তুমি আমার সঙ্গে এসে প্রাতরাশ করে যেও, তখনই আমরা সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলবো'।

'আমি তাকে ওই সামান্য উপকারটুকু করবো বলে কথা দিলাম। কারণ কাজটা একটু প্রমোদ-ভ্রমণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। ওর বিষয়-সম্পত্তির দূরত্ব

রয়ে থেকে মাত্র কয়েক মাইল, ঘোড়ায় চড়ে সহজেই এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়।

'পরদিন বেলা দশটার সময় আমি বন্ধুটির সঙ্গে একত্রে প্রাতরাশ করলাম, অল্প-স্বল্প কথাবার্তাও বললাম। কিন্তু সে নিজে কথা বললো যৎসামান্য। শুধু মিনতি করে বললো, আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। বললো, আমি যে ওই ঘরটাতে, তার সেই বিগত সুখের দৃশ্যপটে প্রবেশ করবো—সেই চিন্তাটাই তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। সত্যি সত্যি ওকে ভীষণ চিন্তিত এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন একটা প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্ব চলেছে ওর মধ্যে। অবশেষে আমাকে কি করতে হবে, তা সে বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বললো। কাজটা খুবই সহজ। ওর টেবিলের ডানদিকের প্রথম দেরাজ থেকে, যেটার চাবি আমার কাছে রয়েছে, দু বাণ্ডিল চিঠি আর গুটিয়ে রাখা কতকগুলো কাগজ নিয়ে আসতে হবে। বললো, 'ওগুলোতে তুমি যাতে চোখ না বোলাও, সে জন্যে তোমাকে আর মিনতি করার প্রয়োজন নেই'।

'ওর মন্তব্যে আমি যৎপরোনাস্তি আহত হলাম এবং খানিকটা তীক্ষ্ণ ভাষায় সে কথা ওকে শুনিয়েও দিলাম। ও তোতলাতে তোতলাতে বললো, 'আমাকে মাফ করে দাও…আমি দুঃখ কষ্টে বড় কাতর।' দু চোখ ভরে জল এলো ওর।

'একটা নাগাদ আমি কাজটা সেরে ফেলার উদ্দেশ্যে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

'চমৎকার আবহাওয়া ছিলো সেদিন। ভরত পাখির গান আর আমার তলোয়ারের সঙ্গে জুতোর আঘাতের ছন্দময় ধ্বনি শুনতে শুনতে ঘাসের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চললাম। তারপর জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললাম। চলার পথে গাছের ডালপালাগুলো সোহাগের স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছিলো আমার সারা মুখে। এমন একটা উদ্ভাসিত দিনে শুধুমাত্র শক্তসমর্থ হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দেই মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে এক একটা পাতা চেপে ধরছিলাম আমি।

'প্রাসাদ-বাড়িটার কাছাকাছি হতেই পকেট থেকে মালির কাছে লেখা চিঠিটা বের করলাম। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, সেটা মুখ বন্ধ করা। এত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম যে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না করেই ফিরে যেতে বসেছিলাম প্রায়। কিন্তু মনে হলো, তাতে অহেতুক স্পর্শকাতরতা দেখানো হবে। তা ছাড়া বন্ধুটির মনের যা অবস্থা, তাতে সে হয়তো সহজেই খামের মুখটা বন্ধ করে ফেলেছে, কিন্তু নিজেই

তা লক্ষ্য করেনি।

'কাছারি বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিলো, যেন বিশ বছর ধরে সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। খোলা দরজাটা ঝুলে পড়েছে কবজা থেকে। ভেতরের হাঁটা-পথে বড় বড় ঘাস, ফুলের কেয়ারিগুলোকে আর আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় না।

'দরজায় সজোরে করাঘাত করতেই কাছের আর একটা দরজা দিয়ে একটা বুড়ো লোক বেরিয়ে এলো। আমাকে দেখে লোকটা যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। আমার চিঠি পেয়ে সে সেটা পড়লো—আবার পড়লো, উলটেপালটে দেখলো। একবার আপাদমস্তক দেখে নিলো আমাকে। তারপর কাগজটা পকেটে রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'বেশ! তা কি চান আপনি'?

'ছোট্ট করে বললাম, 'এইমাত্র যখন মনিবের ফরমাশটা পড়লে, তখন তো সেটা তোমার জানা উচিত। আমি বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে চাই'।

'লোকটা যেন অভিভূত হয়ে উঠলো, 'তাহলে আপনি···আপনি ওঁর ঘরে যাবেন'?

'আমি ক্রমশ ধৈর্য হারাতে শুরু করেছিলাম। তীক্ষ্ণ স্বরে বললাম, 'অবশ্যই! কিন্তু সেটা কি তোমার মাথা ঘামানোর ব্যাপার নাকি'?

'লোকটা হতবুদ্ধি হয়ে তোতলাতে লাগলো, 'না স্যার—কিন্তু ইয়ে—মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, উনি···উনি মারা যাবার পর থেকে ঘরটা আর খোলা হয়নি। আপনি যদি দয়া করে পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করেন, তাহলে···তাহলে আমি একটু গিয়ে দেখি'···

'ক্রুদ্ধ হয়ে ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'দেখ হে, কোন্ মতলবে তুমি এ সব চালাকি করছো, বলো তো? তুমি ভালো করেই জানো তুমি ও ঘরে ঢুকতে পারবে না, কারণ চাবিটা আমার কাছে'!

'লোকটা আর আপত্তি না করে বললো, 'তাহলে চলুন স্যার, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি'।

'সিঁড়িটা দেখিয়ে, কেটে পড়ো। তোমাকে ছাড়াই আমি পথ খুঁজে নেবো'।

'কিন্তু স্যার···সত্যি বলছি'···

'এবারে আমি সার্থকভাবেই লোকটাকে চুপ করিয়ে দিলাম—এক ধাক্কায় ওকে পাশে সরিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

'প্রথমে রান্নাঘরটা পেরিয়ে এলাম। তারপর চাকর-দম্পতির দখল করে রাখা দুটো ঘর। পাশেই মস্ত বড় একটা হলঘর। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই

বন্ধুর নির্দেশিত দরজাটা চিনতে পারলাম।

'সহজেই দরজাটা খুলে ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। ভেতরে এত অন্ধকার যে প্রথমটাতে কিছুই আলাদা করে ঠাহর করতে পারছিলাম না। শীঘ্রিই থমকে দাঁড়ালাম, দীর্ঘদিন অব্যবহারের একটা বিশ্রী পচা গন্ধ নাকে এসে ঠেকলো। ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখ দুটো সয়ে আসতেই পরিষ্কার দেখতে পেলাম, বিশাল একটা এলোমেলো শোবার ঘর। বিছানায় চাদর নেই, শুধু তোশক আর বালিশ-গুলো ছড়ানো। একটা বালিশ আবার বেশ খানিকটা ডেবে রয়েছে, যেন একটু আগেই একটা কনুই বা মাথা ওখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। কুর্সিগুলোও যেন এলো-মেলো ভাবে ছড়ানো। লক্ষ্য করলাম একটা দরজা, নিঃসন্দেহে পোশাক পালটানোর গা-কুঠরির দরজাটা আধখোলা হয়ে রয়েছে।

'ভেতরে আলো ঢোকানোর জন্যে প্রথমেই জানলাটার কাছে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কবজাগুলোতে এমন মরচে ধরে ছিলো যে কিছুতেই পাল্লা দুটো নড়াতে পারলাম না। এমন কি তলোয়ার দিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। বার বার অর্থহীন প্রয়াসের জন্যে ক্রমশ রেগে ওঠায় এবং আধো অন্ধকার সত্ত্বেও মোটামুটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়ায়, অবশেষে আরও আলো পাবার বাসনা-টাকে খারিজ করে দিয়ে আমি লেখার টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'একটা আরাম-কুর্সিতে বসে, টেবিলের ডালাটা তুলে, নির্দিষ্ট দেরাজটা খুল-লাম। ভেতরটা আগাগোড়া জিনিসপত্তরে বোঝাই। সেগুলোর মধ্যে তিনটে বাণ্ডিলই শুধু আমার দরকার, আর সেগুলো কি করে চিনতে হবে তাও আমার জানা—তাই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলাম।

'ওপরের নামগুলো পড়তে পড়তে আমার চোখ দুটো টনটন করছিলো। হঠাৎ পেছনে পোশাকের খসখসানি শুনতে পেলাম—ঠিক শুনলাম না, যেন অনুভব করলাম। প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি, ভেবেছিলাম জানলা থেকে ছুটে আসা একরাশ দমকা হাওয়া কোন পোশাক-টোশাকে লেগে অমন আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু মিনিটখানেক পরেই একটা প্রায় বোধাতীত নড়াচড়ার শব্দ আমার চামড়ার ওপরে একটা বিশ্রী কাঁপন জাগিয়ে তুললো। অতি সামান্য মাত্রায় হলেও এমন অলীক আতঙ্কে প্রভাবিত হওয়া এতই বোকামো যে আমার আত্মসম্মান-বোধ আমাকে পেছনে ফিরে তাকাতে দিলো না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বাণ্ডিলটা আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। তৃতীয়টার জন্যে হাত বাড়াতে যেতেই একটা ব্যথাতুর দীর্ঘনিশ্বাস ঠিক আমার কাঁধের পেছন থেকে ভেসে এলো। পাগলের মতো

লাফিয়ে উঠে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লাফাবার সময়ে তলোয়ারের হাতলে হাত রেখেই পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, তলোয়ারটা আমার সঙ্গে নেই বলে অনুভব করলে আমি হয়তো তখনই কাপুরুষের মতো ছুটে পালাতাম।

'এক মুহূর্ত আগেই আমি যে কুর্সিটাতে বসেছিলাম, সেটার পেছনে দাঁড়িয়ে সাদা পোশাক-পরা লম্বা চেহারার একটি মেয়ে আমার দিকেই তাকিয়েছিলো তখন।

'আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে এমন এক শিহরণ বয়ে গেল যে আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। ওই ভয়ংকর, অযৌক্তিক আতঙ্ক যে কি ভীষণ বস্তু তা কেউ নিজে অনুভব না করলে বুঝবে না। মন আচ্ছন্ন হয়ে আসে, হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসতে চায়, সমস্ত শরীরটা এক টুকরো স্পঞ্জের মতো নেতিয়ে পড়ে।

'আমি ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃতের প্রতি ভয়ংকর আতঙ্কে আমি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়লাম। বাকি জীবনটার চাইতে সেই সামান্য কটি মুহূর্তে ওই অপ্রাকৃত ভীতিবোধের জন্যে আমি অনেক বেশি দুর্নিবার মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম। ও যদি কথা না বলতো, তা হলে আমি হয়তো মরেই যেতাম! কিন্তু ও কথা বললো, বললো এমন এক মধুর বিষণ্ণ সুরে যা আমার স্নায়ুগুলোকে কাঁপিয়ে তুললো। আমি যে নিজের প্রতি আস্থা এবং বিচারক্ষমতা ফিরে পেয়েছিলাম, সে কথা বলার সাহস নেই। বরং এত ভীত হয়ে উঠেছিলাম যে আমি কি করছিলাম, সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা সহজাত অহঙ্কার, সৈনিকসুলভ মনোভাবের অবশিষ্টাংশ আমাকে খানিকটা ভদ্রস্থ করে রাখলো।

'ও বললো, 'আপনি আমার একটা বিরাট উপকার করতে পারেন'।

'আমি জবাব দিতে চাইছিলাম। কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো—গলা দিয়ে শুধু একটা অস্পষ্ট স্বর বেরিয়ে এলো।

'ও ফের বললো, 'করবেন কাজটা? আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন, সুস্থ করে তুলতে পারেন। আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি…বড্ড যন্ত্রণা!' আরাম-কুর্সিটাতে বসলো ও, আমার দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক চোখে।

'করবেন'? ফের জিজ্ঞেস করলো ও।

'আমার বাকশক্তি তখনও অসার। ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ'।

'কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরি একটা চিরুনি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ও

অস্ফুটে বললো, 'আমার চুলগুলো একটু আঁচড়ে দিন, তবেই আমি সুস্থ হবো। এগুলো আঁচড়াতেই হবে! চেয়ে দেখুন, আমার মাথাটার কি দশা—কি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি আমি'!

'ওর দীর্ঘ, খোলা, চুলগুলো যেন কুর্সির পিঠ ছাপিয়ে মেঝেতে গিয়ে স্পর্শ করছে বলে মনে হচ্ছিলো আমার। কেন আমি শিউরে উঠে চিরুনিটা হাতে নিলাম, আর কেনই বা ওই দীর্ঘ চুলগুলো ধরলাম, যাতে সাপ ধরার মতো একটা ভয়ংকর শীতল অনুভূতিতে আমার সমস্ত অস্তিত্ব ভরে উঠলো—তা আমি বলতে পারি না। সেই অনুভূতিটা আজও আমার আঙুলে লেগে রয়েছে, আজও কথাটা চিন্তা করলে আমি শিউরে উঠি।

'জানি না, কি ভাবে সেই বরফের মতো চুলগুলো আমি আঁচড়ে দিলাম। চুলগুলো পাকালাম, গেরো বাঁধলাম, তারপর বিনুনি করে পাট করে দিলাম। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করলো ও, মনে হলো যেন খুশি হয়েছে। আচমকা বললো, 'ধন্যবাদ!' তারপর আমার হাত থেকে চিরুনিটা ছিনিয়ে নিয়ে আধ-খোলা দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেলো।

'দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা মানুষের মতো একা একা কয়েক মুহূর্ত আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। অবশেষে সম্পূর্ণ আস্থা ফিরে পেয়ে ছুটে গেলাম জানলা-টার কাছে, প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেললাম পাল্লা দুটো। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেলাম দরজার কাছে, যেখান দিয়ে ও বেরিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু দেখলাম সেটা বন্ধ, অনড়!

'ওখান থেকে পালিয়ে আসার এক উন্মাদ বাসনা সর্বগ্রাসী আতঙ্কের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপরে—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা যে আতঙ্কের মুখোমুখি হয়, ঠিক তেমনি আতঙ্ক। এক ঝটকায় খোলা দেরাজ থেকে চিঠির বাণ্ডিল তিনটে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর কি করে জানি না, সিঁড়ি টপকে একছুটে একেবারে বাড়ির বাইরে। কয়েক পা দূরেই আমার ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখলাম। এক লাফে জিনের ওপরে উঠে বসে, উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

'রুয়েঁতে একেবারে আমার বাড়ির সামনে এসে থামলাম। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে প্রাণপণে আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমি একটা অলীক স্বপ্নের শিকার হয়েছিলাম। প্রায় মেনেই নিচ্ছিলাম, আমি যা দেখেছি তা শুধু স্বপ্ন—শুধু

ভ্রান্তি। কিন্তু জানলার দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ নিজের বুকের দিকে চোখ পড়লো। দেখলাম, আমার জামার বোতামে কয়েকগুচ্ছ সুদীর্ঘ চুল জড়িয়ে রয়েছে! কম্পিত আঙুলে একটা একটা করে চুল তুলে আমি সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

'তারপর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবো না মনে করে, আমার আর্দালিকে ডেকে পাঠালাম। ইচ্ছে ছিলো, বন্ধুকে আমার কি বলা উচিত সে সম্পর্কে পুরোপুরি ভালো করে ভেবে দেখবো। চিঠিগুলো আমি তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সে জন্যে বার্তাবহকে সে একটা রসিদও দিয়ে দিয়েছিলো। বন্ধুটি আমার কথা বিশেষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছিলো এবং যখন তাকে বলা হলো, আমি সর্দিগর্মিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছি—তখন সে যেন খানিকটা অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো। পরদিন সকালে সমস্ত ঘটনা খুলে বলবো মনে করে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু সে আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো, তখনও ফিরে আসেনি। দুপুরবেলা ফের তার কাছে গেলাম, বন্ধুটি তখনও অনুপস্থিত। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেও যখন তার খোঁজ পেলাম না, তখন আমি কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টা জানালাম এবং একটা বিচার-বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থাও করা হলো। কিন্তু সে কোথায় আছে না আছে, অথবা কি করে উধাও হয়ে গেলো—কোন বিষয়েই সামান্যতম কোন সূত্র আবিষ্কার করা গেলো না।

'পরিত্যক্ত প্রাসাদটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেলো না। কোন মহিলা সেখানে লুকিয়ে ছিলেন—এমন কোন চিহ্নও মিললো না।

'এই সব নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর পরবর্তী সমস্ত প্রচেষ্টাই পরিত্যক্ত হলো এবং সেই থেকে ছাপ্পান্ন বছর কেটে গেছে, আজও আমি তার কোন খবর শুনতে পাইনি।'

তখন প্যারী অবরুদ্ধ, জনশূন্য আর ক্ষুৎপীড়িত। চড়াই পাখির সংখ্যাও অত্যন্ত কম, আর যা পাওয়া যায় তাই-ই তখন সুখাদ্য।

জানুয়ারী মাসের এক উজ্জ্বল প্রভাতে ঘড়ির কারবারী মঁ্যসিয় মরিসত, যিনি পরিস্থিতির বিপাকে এখন নিষ্কর্মা, উর্দির পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিষণ্ণ এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় ব্যুলেভা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পুরনো দিনের এক সৈনিক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখা।

যুদ্ধের আগে প্রতি রোববার খুব ভোরবেলায় এক হাতে একটা বেতের ছড়ি আর পিঠে একটা টিনের বাক্স নিয়ে মরিসতকে জোর কদমে হেঁটে যেতে দেখা যেতো। কলম্বে অব্দি ট্রেনে গিয়ে, সেখান থেকে তিনি পায়ে হেঁটে মারাঁতে দ্বীপে চলে যেতেন—অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত মাছ ধরতেন সেখানে। ওখানেই মঁ্যসিয় সাভেজের সঙ্গে তাঁর মুলাকাত, যিনি র‍্যু নত্‌রদাম দ্য লোরেত্তিতে সামান্য কিছু শখের জিনিস সংগ্রহ করে রাখতেন। ভদ্রলোক খুবই আমুদে, মরিসতের মতো তাঁরও মাছ ধরার প্রচণ্ড শখ। ক্রমে তাঁদের মধ্যে এক উষ্ণ সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং প্রায়ই সমস্ত দিন ধরে তাঁরা পাশাপাশি মাছ ধরতেন একটিও বাক্ বিনিময় না করে। কোন কোন দিন যখন সবকিছুই সতেজ আর নতুন দেখাতো, বসন্তের সুন্দর সূর্য যখন সকলের মন খুশিতে ভরিয়ে তুলতো—তখন মঁ্যসিয় মরিসত উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠতেন, 'আহা, কি অপূর্ব!' মঁ্যসিয় সাভেজ তখন তাঁর জবাবে বলতেন, 'কোন কিছুই এর সমপর্যায়ের নয়।'

আবার সন্ধ্যা নেমে আসার সময় অস্তগামী সূর্য যখন রঙিন পত্রালীর ওপরে সোনা-ঝরা আলো ছড়িয়ে দুই বন্ধুর চারপাশে বিচিত্র ছায়া ফেলতো, তখন সাভেজ বলতেন, 'কি অপরূপ ছবি!'

'ব্যুলেভাকেও হার মানিয়ে দেয়!' জবাব দিতেন মরিসত।

কথা না বললেও পরস্পরকে বুঝে নিতে পারতেন তাঁরা দুজনে।

সাদর সম্ভাষণ বিনিময় করার পর দুই বন্ধু ফের পাশাপাশি পথ চলা শুরু করলেন। দুজনেই তন্ময় হয়ে চিন্তা করছিলেন অতীত আর বর্তমানের ঘটনাবলীর কথা। একটা কাফেতে ঢুকলেন দুজনে। যখন দুজনের সামনেই এক গ্লাস করে অ্যাবসিন্থ রাখা হলো তখন সাভেজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি সমস্ত সাংঘাতিক

ঘটনাই যে ঘটছে!'

'আর আবহাওয়া!' মরিসত বিমর্ষভাবে বললেন 'এ বছরে এই প্রথম আমরা একটা সুন্দর দিন পেলাম। আচ্ছা, আমাদের মাছ ধরার কথা তোমার মনে পড়ে?'

'পড়ে। হায়রে, আবার যে কবে যাবো!'

দ্বিতীয় বার অ্যাবসিন্থ পান করার পর খানিকটা ঝিমঝিমে ভাব অনুভব করায় ওঁরা কাফে থেকে বেরিয়ে এলেন—শূন্য পাকস্থলীতে অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়ায় মাথাটা যেমন হালকা লাগে তেমনি আর কি। স্নিগ্ধ বাতাস সাভেজকে পুলকিত করে তুললো। উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি বলে উঠলেন, 'ধরো, আমরা যদি যাই?'

'কোথায়?'

'মাছ ধরতে?'

'মাছ ধরতে! কোথায়?'

'আমাদের সেই পুরনো জায়গায়—কলম্বেতে। ফরাসী পল্টন ওর কাছেই ছাউনি ফেলে রয়েছে। কিন্তু আমি জানি, কর্নেল দুমলিঁ আমাদের ছাড়পত্র দেবেন।'

'তবে চলো। আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

এক ঘণ্টা পরে মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে তাঁরা কর্নেলের কুঠীতে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁদের অনুরোধ শুনে কর্নেল মৃদু হেসে রীতিমাফিক ছাড়পত্রও দিয়ে দিলেন। এগারোটা নাগাদ অগ্রবর্তী রক্ষীদলের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তাঁরা। তারপর ছাড়পত্র দেখিয়ে কলম্বের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গন্তব্যস্থলের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে হাজির হলেন। পথের ওধারে আরজেঁতিউল এবং নাঁতেরের দিকে বিস্তৃত বিশাল সমভূমি সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। সমভূমির ওপরে অরগেমঁ এবং স্যানয়েঁর নিঃসঙ্গ পাহাড় স্পষ্ট খাড়া হয়ে রয়েছে। পর্যবেক্ষণের পক্ষে জায়গাটা অতি চমৎকার।

'ছাখো,' পাহাড়গুলোর দিকে দেখিয়ে সাভেজ বললেন, 'প্রাশিয়ানরা ওখানে রয়েছে।'

প্রাশিয়ান! ওঁরা তাদের আগে কখনও দেখেননি, কিন্তু জানতেন প্যারীর সর্বত্র তারা ছড়িয়ে রয়েছে অদৃশ্য অথচ শক্তিমদমত্ত হয়ে—লুট করছে, ধ্বংস করছে, হত্যা করছে নির্বিচারে। এই অপরিচিত এবং বিজয়ী লোকগুলোর প্রতি

কুসংস্কারগত ভীতিবোধ ছাড়াও এক গভীর ঘৃণাবোধ জুড়ে নিয়েছিলেন ওঁরা।

'ওদের কারুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, তো আমরা কি করবো?' জিজ্ঞেস করলেন মরিসত।

'আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলবো,' সত্যিকারের পারীর নাগরিকদের কেতায় জবাব দিলেন সাভেজ।

তা সত্ত্বেও ওঁরা এগিয়ে যেতে ইতস্তত করছিলেন। চতুর্দিকের নৈঃশব্দ ওঁদের ভীতিগ্রস্ত করে তুলছিলো। অবশেষে সাভেজ সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'এসো, সাবধানে এগোনো যাক।'

ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে, চতুর্দিকে উদ্বিগ্ন চোখে নজর রেখে, প্রতিটি শব্দে উৎকীর্ণ থেকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন ওঁরা। নদীর কাছে পৌঁছনোর আগে ওঁদের একফালি জমি পার হতে হবে। ওঁরা ছুটতে শুরু করলেন। অবশেষে নদীর তীরে পৌঁছে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন রুদ্ধশ্বাস অবস্থায়, কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন মনে।

মরিসতের মনে হলো, তিনি কারুর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন—কিন্তু না, কোন শব্দ পেলেন না। ওঁরা সত্যিই নিঃসঙ্গ, ছোট্ট দ্বীপটা দৃষ্টিপথ থেকে ওঁদের আড়াল করে রেখেছে। যে বাড়িটাতে রেস্তোরাঁ ছিলো, সেটা মনে হচ্ছিলো পরিত্যক্ত, জনশূন্য। নিশ্চিন্ত হয়ে ওঁরা সারাটা দিন ভালো ভাবে ক্রীড়াবিনোদনের জন্যে স্থিতু হলেন।

প্রথম মাছটা ধরলেন সাভেজ, দ্বিতীয়টা মরিসত এবং তারপর প্রতি মিনিটে একটা করে মাছ তুলে ওঁরা সেগুলো পায়ের কাছে রাখা জালে ভরতে লাগলেন। এটা সত্যিই অদ্ভুত কাণ্ড! মাসের পর মাস বঞ্চিত থাকার পর মানুষ খুশিমতো সময় কাটানোর সুযোগ পেলে যেমন আনন্দ পায়, তেমনি এক পরম উল্লাস অনুভব করছিলেন ওঁরা। সমস্ত কিছুই ওঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, এমন কি যুদ্ধের কথাও!

হঠাৎ একটা গুড়গুড় আওয়াজ শুনতে পেলেন ওঁরা, পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠলো। ভালেরিঁ পাহাড় থেকে কামান দাগা হচ্ছে। চোখ তুলে ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী দেখতে পেলেন মরিসত। তৎক্ষণাৎ আবার একটা বিস্ফোরণ। তারপর ওই একই জিনিসের পর পর দ্রুত পুনরাবৃত্তি।

'ওরা ফের লাগিয়েছে,' দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে সাভেজ বললেন।

স্বভাবত শান্ত মানুষ মরিসত হঠাৎ এক অদম্য ক্রোধে ফুঁসে উঠলেন, 'হতভাগা বুদ্ধুগুলো! একে অন্যকে মেরে ওরা যে কি আনন্দ পায়!'

'ওরা পশুরও অধম!'

'যতদিন আমাদের সরকাররা থাকবেন, ততদিন এমনিই চলবে।'

'হুঁঃ, এই হচ্ছে জীবন!'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, মৃত্যু!' মরিসত সহাস্যে বললেন।

ওঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন, আর ভালেরি পাহাড়ের ওপর থেকে কামানটা ফরাসীদের মধ্যে পাঠাতে লাগলো মৃত্যু আর নির্জন বিষণ্ণতা।

সহসা ওঁরা সচকিত হয়ে উঠলেন, পেছন দিকে কারুর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন ওঁরা। পেছনে ফিরে দেখলেন, কালো পোশাক-পরা চারটে বিশাল চেহারার লোক ঠিক ওঁদের দিকেই বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে। মাছ ধরার ছিপগুলো ওঁদের হাত থেকে খসে পড়ে স্রোতের জলে ভেসে গেলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাশিয়ান সৈনিকরা ওঁদের বেঁধে ফেললো এবং নৌকোয় তুলে নদী পেরিয়ে একটা দ্বীপে নিয়ে এলো, যে দ্বীপটাকে আমাদের বন্ধুরা জনশূন্য বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রিই দ্বীপের বাড়িটাতে পৌঁছে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন, কারণ বাড়ির পেছন দিকে বিশজন বা ততোধিক সৈনিক দাঁড়িয়েছিলো। বিশাল গাট্টাগোট্টা চেহারার একজন অফিসার পা টান-টান করে একটা কুর্সিতে বসে একটা প্রকাণ্ড নল দিয়ে ধূমপান করছিলেন। ওদের উদ্দেশ করে তিনি চোস্ত ফরাসী ভাষায় বললেন, 'তাহলে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মাছের খেপটা ভালোই হয়েছিলো কি?'

ঠিক তখনই একজন সৈনিক মাছভর্তি একটা জাল এনে তাঁর পায়ের কাছে জমা রাখলো। মাছগুলো সে সযত্নে নিজের হেফাজতে করে নিয়ে এসেছে। অফিসারটি মুচকি হেসে বললেন, 'ভালোই কাজ করেছেন দেখছি! কিন্তু এবারে বিষয়টা পরিবর্তন করা যাক। নিশ্চয়ই আমাদের ওপরে গোপন নজর রাখার জন্যে আপনাদের পাঠানো হয়েছিলো। আমার যাতে সন্দেহ না হয়, সেজন্যে আপনারা মাছ ধরার ভান করছিলেন। কিন্তু আমি অতটা সাদাসিধে মানুষ নই। আপনাদের আমি ধরে ফেলেছি এবং গুলি করে শেষ করবো। এজন্যে আমি দুঃখিত—কিন্তু যুদ্ধ, যুদ্ধই। অগ্রবর্তী রক্ষীদের যখন আপনারা পেরিয়ে এসেছেন, তখন সাংকেতিক শব্দটাও আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। সেটা আমাকে বলুন, আমি আপনাদের মুক্ত করে দেবো।'

বন্ধু দুজন বিবর্ণ মুখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁরা সামান্য কাঁপছিলেন,

কিন্তু কেউই কোন জবাব দিলেন না।

'কেউ কোনদিন জানবে না। আপনারা নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে যাবেন, আর রহস্যটাও আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বলতে অস্বীকার করেন, তবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে। এবারে বেছে নিন!'

ওঁরা নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে রইলেন। প্রাশিয়ান অফিসারটি নদীর দিকে দেখিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনারা নদীর বুকে তলিয়ে যাবেন। আপনাদের নিশ্চয়ই পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব আছেন যাঁরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষায় রয়েছেন?'

তবু ওঁরা নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। কামানটা অনবরত গুড়গুড় করেই চলেছে। অফিসারটি নিজের মুখে নির্দেশ দিয়ে বন্দীদের কাছ থেকে তার কুর্সিখানা সরিয়ে নিলেন। একদল লোক ওঁদের কুড়ি ফুটের মধ্যে এগিয়ে এসে আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

'আমি আপনাদের এক মিনিট সময় দিচ্ছি, তার বেশি একটি মুহূর্তও নয়!'

আচমকা ফরাসী দুজনের কাছে এগিয়ে এসে তিনি মরিসতকে একপাশে ডেকে নিলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'জলদি, সংকেতের শব্দটা বলে দিন! আপনার বন্ধু জানতে পারবেন না। উনি ভাববেন, আমি মত বদলেছি।' কিন্তু মরিসত কিছুই বললেন না।

তারপর সাভেজকে একধারে ডেকে নিয়ে তিনি সেই একই কথা বললেন, কিন্তু তিনিও নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। অফিসার তখন ফের নির্দেশ দিলেন, লোক-গুলো তাদের বন্দুক তুলে ধরলো। সেই মুহূর্তে কয়েক ফুট দূরে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা মাছভর্তি জালটার দিকে মরিসতের দৃষ্টি স্থির হয়েছিলো। দৃশ্যটা তাঁকে দুর্বল করে তুললো, প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। বন্ধুর দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'বিদায়, ম্যঁসিয় সাভেজ!'

'বিদায়, ম্যঁসিয় মরিসত!'

এক মিনিট কাল ওঁরা হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিবিড় আবেগে কাঁপছিলেন দুজনেই—সে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে রাখার ক্ষমতা তাঁদের ছিলো না।

'চালাও গুলি!' অফিসার আদেশ দিলেন।

একযোগে গুলি চালালো লোকগুলো। সাভেজ সোজা মুখ থুবড়ে পড়লেন। দুজনের মধ্যে দীর্ঘকায় মরিসত একটা পাক খেয়ে বন্ধুর দেহের ওপরে আড়াআড়ি-ভাবে আছড়ে পড়লেন আকাশের দিকে মুখ রেখে। দুজনেরই বুকের ক্ষতস্থান

থেকে রক্ত বইতে লাগলো মুক্তধারায়। অফিসারটি পরবর্তী আদেশ দিতেই লোকগুলো উধাও হয়ে গেলো, কিন্তু প্রায় তক্ষুনি ফিরে এলো কিছু দড়ি আর পাথর নিয়ে। সেগুলো তারা দুই বন্ধুর পায়ের সঙ্গে বাঁধলো। তারপর তাদের মধ্যে চারজন ওঁদের নদীর ধারে বয়ে নিয়ে গিয়ে, খানিকটা দুলিয়ে, যতটা সম্ভব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। পাথর দিয়ে ভারী করে তোলা দেহ দুটো সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেলো। খানিকটা জল উছলে উঠলো, সামান্য একটু আলোড়ন জাগলো—তারপর জলস্রোত আবার বয়ে চললো যথারীতি শান্তগতিতে। শুধু দেখা গেলো, সামান্য রক্তের রেখা ভেসে চলেছে জলের ওপরে।

অফিসারটি শান্ত পায়ে বাড়িটার দিকে ফিরতে ফিরতে বিড়বিড় করে বললেন, 'এখনও মাছগুলো জ্যান্ত পাওয়া যাবে।'

ভালোভাবে নজর করে মাছভর্তি জালটা তিনি তুলে ধরলেন। তারপর মুচকি হেসে ডাকলেন, 'উইলহেম!'

সাদা উর্দি-পরা একটি সৈনিক এসে হাজির হলো। মাছগুলো তার হাতে তুলে দিয়ে অফিসারটি বললেন, 'এই কুঁচো মাছগুলো জ্যান্ত থাকতে থাকতে ভেজে নাও—চমৎকার সুস্বাদু খাবার হবে।'

তারপর স্বস্থানে ফিরে গিয়ে কুর্সিতে বসে তামাকের নল থেকে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

তখন পর্যন্ত মাদাম বার্থা দ্য ভাঁসেল তাঁর হতাশ স্তাবক ব্যারণ জোসেফ দ্য ক্রোইসারের সমস্ত অনুনয়ই ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। শীতের সময় ব্যারণ পারীতে তাঁর সঙ্গে আকুল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, এখন নর্ম্যাণ্ডির কার্ভিলে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদে মাদামের সম্মানে এক উৎসব ও শিকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

মাদামের স্বামী মঁ্যসিয় দ্য ভাঁসেল যথারীতি এ সবের কিছুই দেখেননি বা জানেন না। কথিত আছে শারীরিক দুর্বলতার জন্যে তিনি স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকেন, যে কারণে মাদাম তাঁকে কোনদিনই ক্ষমা করবেন না। মঁ্যসিয় বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ, মাথায় টাক, হাত পা ঘাড় নাক সব কিছুই খাটো মাপের এবং ভীষণ কুৎসিত। ওদিকে মাদাম দ্য ভাঁসেল দীর্ঘাঙ্গী, ঘন-বর্ণা, দৃঢ়চেতা তরুণী। স্বামী প্রকাশ্যে 'গিন্নী' বলে সম্বোধন করলে তিনি তাঁর মুখের ওপরেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। কিন্তু তাঁর স্তাবক খেতাবপ্রাপ্ত ব্যারণ জোসেফ দ্য ক্রোইসারের চওড়া কাঁধ, মজবুত গড়ন আর সুন্দর গোঁফজোড়ার দিকে তিনি খানিকটা কোমল দৃষ্টিতেই তাকান। অথচ এখন পর্যন্ত ব্যারণকে তিনি কিছুই দেন-নি।

ব্যারণ কিন্তু মাদামের জন্যে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলছেন। উৎসব, ভোজ-সভা; শিকার নিত্য নতুন আমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং এ সবে প্রতিবেশী গণ্যমান্যজনদের আমন্ত্রণ জানানো—হয়েই চলেছে একের পর এক। সারাদিন ধরে শিকারী কুকুরগুলো জঙ্গলের মধ্যে শেয়াল অথবা বুনো শুয়োরের পালকে তাড়া করে বেড়ায়। আর প্রতিরাত্রে চোখ ধাঁধানো আতসবাজির জলন্ত পালক নক্ষত্রের আলোর সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়, বৈঠকখানার আলোকিত জানলাগুলো বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দেয় আলোর দীর্ঘ কিরণ আর ছায়া-ছায়া কিছু মূর্তি সেখানে ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত।

তখন শরৎকাল, বছরের পিঙ্গল রঙা ঋতু। পাখির ঝাঁকের মতো পাতাগুলো ঘূর্ণিবেগে ঘাসের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বল নাচের পর যখন কোন মহিলার অঙ্গ থেকে পোশাক খসে পড়ে তখন যেমন নগ্ন দেহের গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি এই সময়ে নগ্ন পৃথিবীর ভিজে মাটির ঘ্রাণ বাতাসের সঙ্গে নাকে এসে লাগে।

গত বসন্তের এক আনন্দ সন্ধ্যায় উৎসব চলার সময় ম্যসিয় দ্য ক্রোইসারের

যোগে উদ্যত হয়ে মাদাম ত ভাঁসেল তাকে বলেছিলেন, 'আমি যদি তোমার কাছে ধরা দিই, তাহলেও পাতাগুলো ঝরে যাবার আগে তা হবে না। এই গ্রীষ্মে আমার এত কাজ আছে যে এখন আর ওসবের সময় নেই।' ব্যারণ সেই স্পষ্ট অথচ আনন্দ-দায়ক কথাগুলো ভোলেননি। তাই এখন প্রতিদিন তিনি আরও বেশি করে পেড়াপীড়ি করছেন, প্রতিদিনই নিজেকে আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং ফৌজি ভাষায় বলতে গেলে—সেই সুন্দরী, দুঃসাহসী নারীর হৃদয়ে খানিকটা অধিকারও বিস্তার করেছেন। মাদাম যেন শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার খাতিরেই এখন তাকে ঠেকিয়ে রেখেছেন।

সেদিনটা ছিলো একটা বিশাল বুনো শুয়োর শিকার করার আগের দিন। সন্ধ্যাবেলা মাদাম বার্থা সহাস্যে ব্যারণকে বললেন, 'ব্যারণ, তুমি যদি পশুটাকে মারতে পারো, তাহলে তোমাকে আমার কিছু বলার থাকবে।' সুতরাং সেই একমেব অদ্বিতীয়ম্ জন্তটার বাসা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায় ব্যারণ খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো জঙ্গলতাড়ুয়ারা। পর পর তাদের জায়গা ঠিক করে ব্যারণ নিজেই নিজের জয় সুনিশ্চিত করার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললেন। শিঙাগুলো যখন রওনা হওয়ার সঙ্কেত জানালো তখন ব্যারণ টুকটুকে লাল ও সোনালী রঙের আঁটসাঁট কোট পরে, শক্ত করে কোমর বেঁধে, প্রসারিত বুক আর উদ্দীপ্ত চোখে এমন সতেজভাবে এসে হাজির হলেন, যেন তিনি এই সবেমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। ওরা বেরিয়ে পড়তেই বুনো শুয়োরটা স্থানচ্যুত হয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চললো। পূর্ণ বিক্রমে চিৎকার তুলে শিকারী কুকুরগুলো অনুসরণ করলো সেটাকে। ঘোড়াগুলো তীব্রবেগে ছুটে চললো জঙ্গলকাটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে। আর তাদের অনুসরণরত টানা গাড়িগুলো খানিকটা দূর থেকে নরম পথ ধরে এগিয়ে চললো একান্ত নিঃশব্দে।

দুষ্টুমি করে মাদাম ত ভাঁসেল ব্যারণকে নিজের পাশে রেখেছিলেন। সকলের পিছু পিছু তাঁরা এগিয়ে আসছিলেন সীমাহীন দীর্ঘ এক সরল পথ ধরে, যে পথের ওপরে চার সারি ওক গাছ ঝুঁকে পড়ে যেন প্রায় একটা খিলান তৈরি করে রেখেছে। প্রেম আর উদ্বেগে শিহরিত ব্যারণ এক কান দিয়ে শুনছিলেন সেই তরুণীর ঠাট্টা-তামাশাভরা কলকাকলি, অন্য কানে ক্রমশ দূরে বিলীন হয়ে যাওয়া শিঙাধ্বনি আর শিকারী কুকুরগুলোর চিৎকৃত আস্ফালন।

'তাহলে তুমি আর আমাকে ভালবাসো না?' মাদাম প্রশ্ন করলেন।

'এ সব কথা তুমি বলো কি করে?' ব্যারণ জবাব দিলেন।

'কিন্তু তুমি যেন আমার চাইতে খেলাধুলোয় বেশি করে মন দিচ্ছো,' মাদাম ফের বললেন।

ব্যারণ গুমরে ওঠেন, 'তুমিই কি আমায় জন্তুটাকে মারতে বলোনি ?'

'সেটাকে আমি অবশ্যই কর্তব্য বলে মনে করি,' মাদাম গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন। 'আমার চোখের সামনে তুমি নিজে ওটাকে মারবে।'

কম্পিত ব্যারণ পা দিয়ে তাঁর ঘোড়াটাকে এমন ঠোক্কর দিলেন যে ঘোড়াটা পেছনের পায়ে ভর রেখে লাফিয়ে উঠলো। সবটুকু ধৈর্য হারিয়ে তিনি চিৎকার করে বললেন, 'কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই মাদাম, আমরা এখানে পড়ে থাকলে তা একেবারে অসম্ভব !'

মাদাম তখন ব্যারণের হাতে হাত রেখে অথবা যেন আনমনাভাবে তাঁর ঘোড়াটার কেশরে মৃদু আঘাত করতে করতে নরম স্বরে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে তা করতেই হবে—না হলে সেটা তোমার পক্ষে অনেক বেশি খারাপ হবে।'

ঠিক তখনই ডানদিকে ঘুরে তাঁরা গাছগাছালিতে ছাওয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথে গিয়ে ঢুকলেন। সহসা ওঁদের পথ আটকে রাখা একটা ডাল সরাতে গিয়ে মাদাম ব্যারণের এত কাছে ঝুঁকে পড়লেন যে ব্যারণ অনুভব করলেন, মাদামের চুল তাঁর ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। জান্তব আগ্রহে তিনি দু হাতে মাদামকে জড়িয়ে ধরে, নিজের পুরু গোঁফসুদ্ধ মুখটা মাদামের কপালে রেখে এক সাংঘাতিক চুমু দিয়ে বসলেন।

প্রথমটাতে মাদাম এতটুকুও নড়াচড়া করলেন না, ব্যারণের উন্মত্ত সোহাগের মাঝে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে রইলেন। তারপর একটুখানি ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা ঘোরালেন এবং আকস্মিকভাবেই হোক বা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই হোক, হালকা চুলের অপার ঐশ্বর্যের নিচে ওর ঠোঁটখানি ব্যারণের ঠোঁটের সঙ্গে মিলিত হলো। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই লজ্জা অথবা অনুশোচনায় উনি ঘোড়াটাকে চাবুক লাগিয়ে পূর্ণ-গতিতে এগিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ দুজনে একবারও দৃষ্টি বিনিময় না করে সেই একইভাবে ছুটে চললেন ওঁরা।

শিকারের গোলমাল কাছে এগিয়ে এসেছিলো, মনে হচ্ছিলো ঘন ঝোপগুলো যেন কাঁপছে। হঠাৎ রক্তমাখা বুনো শুয়োরটা তার পেছনে লেগে থাকা কুকুরগুলোকে ঝেড়ে ফেলার প্রচেষ্টায় ঝোপঝাড় ভেঙে বেরিয়ে এলো।

'যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার পেছনে আসুক,' ব্যারণ জয়োল্লাসে চিৎকার করে উঠে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন—জঙ্গলটা যেন গ্রাস করে ফেললো তাঁকে।

কয়েক মিনিট পরে মাদাম যখন একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছুলেন, তখন কর্দমাক্ত ব্যারণ সবেমাত্র উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর কোটটা ছেঁড়া, হাত রক্তমাখা। জন্তুটা শুয়ে রয়েছে লম্বা হয়ে, ব্যারণের শিকারের ছুরিটা আমূল বিঁধে আছে সেটার কাঁধে।

মশালের আলোয় জন্তুটাকে কাটা হলো। উষ্ণ, বিষণ্ন সন্ধ্যা। পাণ্ডুর চাঁদ থেকে হলদে রঙের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে মশালগুলোর ওপরে, যেগুলোর লাক্ষাময় ধোঁয়া রাতটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কুকুরগুলো শুয়োরটার নাড়িভুঁড়ি নিয়ে খেয়োখেয়ি, মারামারি করছে। জঙ্গল-খেদাড়ে আর ভদ্রলোকেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যত জোরে সম্ভব যে যার শিঙা ফুঁকছেন। নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে সেই শিঙাধ্বনি জঙ্গল পেরিয়ে দূর উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ভীরু হরিণদের জাগিয়ে তুললো, বিলাপী শেয়ালগুলোকে সচকিত করলো, বিরক্ত করলো গর্তে ঢুকে থাকা ছোট্ট খরগোশগুলোকে।

আতঙ্কিত রাত-পাখিরা উড়ে যাচ্ছিলো উৎসাহী কুকুরগুলোর ওপর দিয়ে। মহিলারা এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পুরুষদের বাহুতে খানিকটা বেশি ভার রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন—কুকুরগুলোর খাওয়া শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ওঁরা মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন জঙ্গলের দিকে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি এবং উত্তেজনায় অবসন্ন মাদাম ভাঁসেল ব্যারণকে বললেন, 'পার্কে এক পাক ঘুরে আসবে?' কম্পিত-বিচলিত ব্যারণ কোন জবাব না দিয়ে ওঁর সঙ্গে গেলেন এবং প্রায় তক্ষুণি দুজন দুজনকে চুম্বন করলেন। প্রায়-পত্রহীন গাছের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসা চাঁদের আলোয় ধীর পায়ে হাঁটছিলেন ওঁরা। ওঁদের প্রেম, কামনা, নিবিড় আলিঙ্গনের বাসনা এত প্রবল হয়ে উঠলো যে একটা গাছের তলায় ওঁরা সেগুলোর কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিলেন আর কি!

তখন আর শিঙা বাজছিলো না, ক্লান্ত কুকুরগুলো নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিলো নিজেদের খোঁয়াড়ে। তরুণী বললেন, 'চলো, এবারে ফেরা যাক।' ফিরে এলেন দুজনে।

প্রাসাদে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার আগে মাদাম দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'আমি এত ক্লান্ত যে এক্ষুণি গিয়ে শুয়ে পড়বো।' ব্যারণ শেষ চুম্বনের জন্যে দু হাত বাড়াতেই মাদাম বিদায়-সম্ভাষণ হিসেবে ছুটে যেতে যেতে বললেন, 'না—আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার পেছনে আসুক!'

এক ঘণ্টা পরে সমস্ত প্রাসাদ যখন মৃতের মতো নিশ্চুপ, তখন ব্যারণ চুপিসাড়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাদামের দরজায় আঁচড় কাটলেন। মাদাম কোন

সাড়া না পাওয়ায় তিনি দরজাটা খোলার চেষ্টা করে দেখলেন, সেটা খোলা।

জানলার তাকে হাত রেখে অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন মাদাম। ব্যারণ একছুটে ওঁর হাঁটুর কাছে বসে, পোশাকের ওপর দিয়েই পাগলের মতো ওর পায়ে চুমু দিতে লাগলেন। উত্তরে কোন কথা না বলে মাদাম পরম সোহাগে তাঁর চুলে নিজের নরম আঙুলগুলো ডুবিয়ে দিলেন। তারপর আচমকা যেন কোন বিরাট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এইভাবে বেপরোয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি ফিরে আসবো, অপেক্ষা কোরো।' হাত বাড়িয়ে তিনি ঘরের প্রান্তে একটা অস্পষ্ট সাদা জায়গা দেখালেন—সেটা ওঁর বিছানা।

কি করছেন পুরোপুরি না বুঝেই, ব্যারণ কম্পিত হাতে দ্রুত পোশাক ছেড়ে ফেললেন এবং ঠাণ্ডা চাদরের নিচে ঢুকে আরামে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। ক্লান্ত শরীরে বিছানার আরাম পেয়ে প্রেমের কথা প্রায় ভুলেই গেলেন তিনি।

মাদাম কিন্তু ফিরলেন না, ব্যারণকে হতাশ করে তুলতে নিঃসন্দেহে তিনি মজা পাচ্ছিলেন। নিদারুণ স্বাচ্ছন্দ্যে চোখ বন্ধ করে শান্তিতে চিন্তা করতে লাগলেন ব্যারণ, অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই পরম বস্তুর জন্যে যা তিনি এতদিন ধরে আকুল আগ্রহে চাইছিলেন। কিন্তু একটু একটু করে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো শিথিল হয়ে উঠলো, চিন্তাভাবনাগুলো হয়ে গেলো অস্পষ্ট আর ক্ষণস্থায়ী। অবশেষে ক্লান্তিই তাঁকে অধিকার করে ফেললো—ঘুমিয়ে পড়লেন ব্যারণ।

সকাল পর্যন্ত ক্লান্ত শিকারীর গভীর, অজেয় ঘুম ঘুমোলেন তিনি। তারপর, জানলাটা আধখোলা ছিলো বলে, একটা মোরগের ডাক আচমকা তাঁকে জাগিয়ে তুললো। ব্যারণ চোখ খুললেন। নিজের শরীরে একটি স্ত্রীলোকের স্পর্শ অনুভব করে, অবাক বিস্ময়ে নিজেকে এক অপরিচিত শয্যায় আবিষ্কার করে এবং মুহূর্তের জন্যে কিছুই মনে করতে না পেরে তিনি বলে উঠলেন, 'এ কি! আমি কোথায়? ব্যাপারটা কি?'

সারারাত আদপেই না ঘুমিয়ে থাকা মাদাম লাল চোখ আর ফোলা ঠোঁট নিয়ে এই নীরস লোকটার দিকে তাকালেন। তারপর যে স্বরে উনি মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন, তেমনি ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কিছু না, ওটা শুধু একটা মোরগের ডাক। আপনি আবার ঘুমোন ম'সিয়, ও নিয়ে আপনার চিন্তার কিছু নেই।'

সমুদ্রে

সম্প্রতি নিচের খবরটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো :

নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত : বুলোঁ-সুর-মের, ২২শে জানুয়ারী—আমাদের ধীবর সম্প্রদায়, যাঁরা গত দু বছর যাবৎ চরম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে আসছেন, এক ভীতিপ্রদ আকস্মিক দুর্ঘটনা তাঁদের জীবনে এক নিদারুণ বেদনা বয়ে এনেছে। মালিক এম জাভেল পরিচালিত একখানা জেলে-নৌকো বন্দরে ঢোকার সময় আচমকা পশ্চিম দিকে চলে যায় এবং স্রোতের বেগ কমানোর জন্যে তৈরি প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা লেগে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। জীবনতরীর আন্তরিক প্রয়াস এবং রক্ষাকল্পে অন্যান্য সাজসরঞ্জামের যথাসাধ্য ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও নৌকোর চারজন নাবিক এবং কেবিন পরিচারকের জীবনহানি হয়েছে।...

সমুদ্র এখনও দুর্যোগপূর্ণ, আরও বিধ্বংসী ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

ভাবছিলাম, কে এই জাভেল। হয়তো সে হুলো জাভেলের ভাই। যদি তাই হয় তাহলে ওই হতভাগা মানুষটা, যার ডুবে যাওয়া শরীর এখন ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে অথবা নৌকোর ধ্বংসস্তূপের নিচে শুয়ে রয়েছে—সে একদা আর একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার সঙ্গেও জড়িত ছিলো, যে ঘটনা সমুদ্রের আর পাঁচটা মহান নাটকের মতোই সাধারণ অথচ ভীতিপ্রদ।

ঘটনাটা ঘটেছিলো আজ থেকে আঠারো বছর আগে, বড় জাভেল তখনই একটা ট্রলারের মালিক। ট্রলার আসলে এক বিশেষ ধরনের জেলে-নৌকো—অনেকটা চওড়া, যে কোন আবহাওয়া সহ্য করতে পারার মতো মজবুত করে তৈরি। ওরা ঢেউয়ের দোলে দোল খায়, ওঠে নামে বোতলের ছিপির মতো। চ্যানেলের নিষ্করুণ নোনা বাতাসের দাপটেও সর্বদা অক্লান্তভাবে জল কেটে পাল তুলে ভেসে বেড়াতো নৌকোটা—পাশে বয়ে নিয়ে বেড়াতো একটা বিশাল জাল, যেটা সমুদ্রের তলা ঝেড়েমুছে সাফ করে দিতো...তুলে আনতো পাথরের ফাঁক-ফোকড়ে ঘুমিয়ে থাকা প্রাণীগুলোকে, বালির বুকে লেপটে থাকা মোটাসোটা মাছ, বাঁকানো দাড়াওয়ালা কাঁকড়া আর সুচালো গোঁফওয়ালা গলদা চিংড়িগুলোকে।

বাতাস যখন সতেজ হয়ে ওঠে আর ছোট ছোট ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে

সমুদ্রের বুক, তখনই মাছ ধরা শুরু হয়। লোহার হুড়কো দিয়ে মজবুত করা একখণ্ড লম্বা কাঠের সঙ্গে জালটা বাঁধা থাকে, নৌকোর দু প্রান্তে দুটো কপিকলের ভেতর দিয়ে আসা দুটো তারের সাহায্যে সেটাকে নামিয়ে আনা হয়। তারপর বাতাস আর স্রোতের উজান ঠেলে এগিয়ে যাওয়া ট্রলারটা এই অদ্ভুত যন্ত্রটাকে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যায়—লুটতরাজ করে শূন্য করে দেয় সমুদ্রের তলদেশ।

নৌকোয় জাভেলের সঙ্গে ছিলো তার ছোট ভাই, চারজন লোক আর এক-জন পরিচারক। মাছ ধরার জন্যে সুন্দর পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ওরা বুলোঁ ছেড়ে বেরিয়েছিলো। কিন্তু শীঘ্রিই ঝড় উঠলো, বাতাসের ঝাপটা ঠেলে নিয়ে চললো নৌকোটাকে। ওরা ইংলণ্ডের উপকূলবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে গেলো। কিন্তু সেখানে সমুদ্র প্রচণ্ড বিক্রমে পাহাড় এবং সৈকতের গায়ে আছড়ে পড়ছে, অতএব বন্দরে ঢোকা অসম্ভব। ছোট্ট নৌকোটা তখন আবার ফ্রান্সের কূলে ফিরে এলো। কিন্তু সেখানেও প্রবল ঝড় বন্দরে ঢোকা অসম্ভব করে তুললো। বিক্ষুব্ধ সফেন তরঙ্গে বেষ্টিত থাকার জন্যে প্রতিটি বন্দরের প্রবেশপথই তখন বিপদসঙ্কুল।

আবার যাত্রা শুরু করলো নৌকোটা—ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, উলটে পালটে, দোল খেয়ে, বিশাল জলরাশির সঙ্গে সশব্দে ধাক্কা খেয়ে চলতে লাগলো টাল-মাটাল হয়ে। কিন্তু তবু, এ সবই নৌকোটার কাছে খেলার মতো—কারণ প্রতিকূল আবহাওয়ায় সে অভ্যস্ত…যে আবহাওয়া তাকে ফ্রান্স বা ইংলণ্ড, দু দেশেরই তীরের দিকে এগোতে বাধা দিয়েছে…যার জন্যে একটানা পাঁচ-ছদিন ধরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাকে।

অবশেষে ঝড় যখন থামলো, তখন নৌকোটা খোলা দরিয়ায় এসে পড়েছে। তীব্র ঢেউ থাকা সত্ত্বেও পরিচালক তখন জাল নামাবার হুকুম দিলো। অতএব বিশাল জালটাকে পাশের দিকে টেনে নামানো হলো, নৌকোর গলুইয়ের দিকে দুজন এবং পেছনের দিকে দুজন লোক দাঁড়িয়ে কপিকল থেকে তার খুলতে শুরু করলো। একেবারে আচমকাই জালটা সমুদ্রের তলায় গিয়ে ঠেকলো, কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা বড় ঢেউ এসে নৌকোটাকে সামনের দিকে নুইয়ে দিলো ফলে ছোট জাভেল, যে গলুই থেকে জাল নামাবার নির্দেশ দিচ্ছিলো, তার পা গেলো ফসকে। ওদিকে সেই ধাক্কায় কপিকলের তার এবং যে কাঠের ওপর দিয়ে তার দুটো আসছিলো, তা সবকিছুই মুহূর্তের জন্যে ঢিলে হয়ে যাওয়ায় ছোট জাভেলের হাত তার দুটোর মাঝখানে আটকে গেলো। মরিয়া হয়ে সে তখন অন্য হাত দিয়ে তারটা তুলে ধরতে চেষ্টা করলো—কিন্তু জালটা ততক্ষণে পুরোপুরি নেমে এসেছে—ফলে

শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে তারটা, আর নড়লো না। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে তখন চিৎকার করে উঠলো। সবাই ছুটে গেলো তার সাহায্যের জন্যে, এমন কি হাল ছেড়ে তার দাদাও। ওর যে হাতটা তারের চাপে ক্রমশ কেটে যাচ্ছিলো, সেটাকে মুক্ত করার জন্যে সকলে প্রাণপণে তারের দড়িটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, তারটা এক চুলও নড়লো না। 'ওটা কেটে দাও!' পকেট থেকে একটা বড় ফলার ছুরি বের করে একজন বললে। ছুরির কয়েকটা আঘাতেই ছোট জাভেলের হাতটা মুক্ত করা যেতো। কিন্তু দড়িটা কাটার অর্থ হলো জালটা হারানো, এবং জালটার দাম অনেক—পনেরশো ফ্রাঁ। জালটা বড় জাভেলের, যে কিনা বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে প্রচণ্ড আসক্ত।

বড় জাভেল উদ্বেগে চিৎকার করে উঠলো, 'দাঁড়াও, কেটো না! আমি নৌকোটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি।' দৌড়ে গিয়ে সে জোর করে হাল ঘোরাতে লাগলো। কিন্তু নৌকোটা আদৌ সে নির্দেশে সাড়া দিলো না, বাতাস এবং ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলো—কারণ জালের ভারে নৌকোটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিলো।

ছোট জাভেল দাঁতে দাঁত চেপে বিস্ফারিত চোখে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো। সে কোন কথাই বলছিলো না। ইতিমধ্যে মাঝিটা তার ছুরি ব্যবহার করতে পারে, এই আশঙ্কায় তার দাদা ফিরে এসে বললো, 'দাঁড়াও, ওটা কেটো না! আমরা নঙ্গর ফেলবো।'

সম্পূর্ণ শিকল ঝুলিয়ে নঙ্গর ছুঁড়ে দেওয়া হলো। তারপর জাল ধরে রাখার দড়িগুলোকে ঢিলে করে দেওয়ার জন্যে সকলে মিলে তার গোটানো যন্ত্রটার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। অবশেষে তারের দড়ি ঢিলে হলো, রক্তে ভেজা পশমী জামার হাতাসুদ্ধ মুক্ত হলো আহত নিস্তেজ হাতটা।

ছোট জাভেল যেন বুদ্ধু বনে গেছে। ওরা তার জামাটা খুলে দিয়ে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেলো। দেখলো, একতাল ক্ষতবিক্ষত মাংসপিণ্ড থেকে যেন পাম্প করে বের করার মতো তীব্র বেগে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ছোট জাভেল বিড়বিড় করে বললো, 'হাতটা গেছে।'

ডেকের ওপরে যখন রক্তের পুকুর হতে শুরু করেছে, তখন একজন মাঝি চেঁচিয়ে বললো, 'আরে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ওর শরীরে তো আর একটুও রক্ত থাকবে না! হাতটা বেঁধে দাও।'

আলকাতরা মাখানো মোটা সুতোর একখণ্ড কাপড় দিয়ে ওরা ক্ষতস্থানের

ওপরের দিকটা যতটা সম্ভব শক্ত করে বেঁধে দিলো। ফলে রক্তের তোড় ক্রমশ কমতে কমতে অবশেষে একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো।

ছোট জাভেল তখন উঠে দাঁড়ালো, আহত হাতটা ওর পাশে নড়বড় করে ঝুলছে। অন্য হাত দিয়ে ওই হাতটা সে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো, ঝাঁকালো। সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে হাতটা, হাড়গুলো গুঁড়িয়ে গেছে, শুধুমাত্র পেশীর সাহায্যে ঝুলে রয়েছে দেহের সঙ্গে। চিন্তিতভাবে সে বিষণ্ণমুখে হাতটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ভাঁজ করে রাখা একগাদা পালের ওপরে বসে পড়লো—সঙ্গীরা ওকে উপদেশ দিতে লাগলো ক্ষতস্থানটা সর্বদা ভিজিয়ে রাখার জন্যে, যাতে জায়গাটা পচে না যায়। ওরা তার কাছে একটা বালতি রেখে দিলো এবং কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর সে একটা গ্লাস জলে ডুবিয়ে, সেই পরিষ্কার জল দিয়ে সাংঘাতিক ক্ষতটা ধুয়ে দিতে লাগলো।

'তুমি বরঞ্চ নিচের কেবিনে যাও,' ওর দাদা বললো। নিচে চলে গেলো ও, কিন্তু একা থাকতে স্বস্তি অনুভব না করায় এক ঘণ্টা পরেই ফের ওপরে উঠে এলো। তাছাড়া খোলা হাওয়ায় থাকতে ওর ভালো লাগছিলো। ফের পালের ওপরে বসে ও আবার হাতটা ধুয়ে দিতে লাগলো।

ওদিকে অনেক মাছই ধরা পড়লো। সাদা পেটির বড় মাছগুলো ওর পাশেই মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিলো। নিজের ছিন্নভিন্ন মাংসপেশীতে জল ঢালতে ঢালতে ও সেগুলো লক্ষ্য করতে লাগলো।

•

নৌকোটা যখন প্রায় বুলোঁতে পৌঁছে গেছে, তখন আবার নতুন করে ঝোড়ো হাওয়া উঠলো। ছোট্ট নৌকোটা আবার পাগলের মতো উলটে পালটে অসহায় হতাশ ছোট জাভেলকে কাঁপিয়ে তুললো।

রাত নামলো। সকাল পর্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া রইলো। সূর্য উঠলে ইংলণ্ডের উপকূল আবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কিন্তু সমুদ্র এখন একটু কম অশান্ত থাকায় বাতাসের উজান ঠেলে ওরা আবার ফ্রান্সের দিকেই ফিরে চললো।

সন্ধ্যার দিকে ছোট জাভেল নৌকোর সঙ্গীদের ডেকে তার হাতের নিচের দিকের অংশে কালো কালো দাগগুলো দেখালো। ওগুলো সবই পচনশীলতা ভয়ঙ্কর চিহ্ন।

মাঝিরা জায়গাটা দেখলো, দেখে প্রত্যেকেই নিজস্ব মতামত জানালো।

একজন বললো, 'ওটা বোধহয় পচে যাচ্ছে।'

'ওখানে একটু নুনজল দেওয়া দরকার,' বললো আর একজন।

অতএব ওরা খানিকটা নুনজল এনে আহত হাতটাতে ঢেলে দিলো। ছোট জাভেল যন্ত্রণায় পাণ্ডুর হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রইলো, কিন্তু একটুও চিৎকার করলো না। তারপর জ্বালাটা যখন বন্ধ হলো, তখন দাদাকে বললো, 'তোমার ছুরিটা আমাকে দাও।'

দাদা ওকে ছুরিটা দিলো।

'আমার হাতটা সোজা করে তুলে ধরে টেনে রাখো।'

দাদা তাই করলো। ছোট জাভেল তখন নিজেই নিজের হাতটা কাটতে শুরু করলো। ক্ষুরের মতো ধারালো ছুরির ফলায় সে শান্তভাবে সাবধানে শেষ গ্রন্থিটুকুও কেটে ফেললো, রইলো শুধু গোড়ার অংশটুকু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁপে উঠে বললো, 'এটা করতেই হতো। নইলে পুরোটাই পচে যেতো।'

ও যেন পরম স্বস্তিতে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে লাগলো, আবার জল ঢালতে শুরু করলো হাতের অবশিষ্ট অংশটায়।

পরের রাতেও আবহাওয়া খারাপ হয়ে রইলো, কিছুতেই বন্দরে ঢুকতে পারলো না ওরা। আবার যখন রোদ উঠলো তখন ছোট জাভেল তার কাটা হাতটা কুড়িয়ে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। পচন শুরু হয়েছে। সঙ্গীরাও এসে সেটাকে টিপে টিপে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, গন্ধ শুঁকে দেখলো।

বড় ভাই বললো, 'ওটাকে এখন বরং জলে ফেলে দে।'

ছোট জাভেল কিন্তু তাতে রেগে গেলো, 'মোটেই না, আমি তা করছি না। ওটা আমার হাত, তাই নয় কি?' ওটা ফিরিয়ে নিয়ে সে নিজের দু পায়ের মাঝখানে রেখে দিলো।

'তাতে ওটার পচে যাওয়া বন্ধ হবে না,' বড় ভাই বললো।

ছোট জাভেলের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এলো। নৌকোটা যখন অনেক দিন ধরে সমুদ্রে থাকে, তখন মাছগুলোকে তাজা রাখার জন্যে ওরা সেগুলোকে পিপেতে নুনের স্তরের মধ্যে রেখে দেয়। বললো, 'আচ্ছা, এটা নুনের মধ্যে রাখা যায় না?'

'তা যায়,' বললো অন্যেরা।

তখন গত কয়েক দিন ধরে ওরা যে পিপেগুলোকে বোঝাই করেছিলো, তারই একটাকে খালি করে ফেললো। তারপর হাতটা তলায় রেখে, তার ওপরে নুন বিছিয়ে আবার এক এক করে মাছগুলো রেখে দিলো।

একজন মাঝি রসিকতা করে বললো, 'ওটা আমরা মাছগুলোর সঙ্গে আবার

বিক্রি না করে ফেলি।'

[illegible] ভাই ছাড়া সকলেই তাতে হেসে উঠলো।

তখনও জোরালো বাতাস বইছিলো। পরদিন বেলা একটা পর্যন্ত ওরা [illegible] ঠিক বাইরেই ঘুরে বেড়ালো। আহত লোকটা তখনও ক্ষতস্থানে সমানে জল ঢেলে চলেছে আর মাঝেমাঝেই উঠে দাঁড়িয়ে, নৌকোর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছে। বড় ভাই হাল ধরে ওকে লক্ষ্য করছে আর মাথা নাড়ছে আপন মনে।

অবশেষে ওরা কূলে এসে ভিড়লো।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ক্ষতটা সুন্দরভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। ভালো করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রোগীকে তিনি বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু জাভেল হাতটা না নিয়ে কিছুতেই শুতে যাবে না। দ্রুত বন্দরে ফিরে এসে সে নির্দিষ্ট পিপেটা খুঁজে বের করে, তাতে একটা ঢেরা চিহ্ন দিয়ে রাখলো।

সঙ্গীরা ওর সামনেই পিপেটা খালি করলো, বিচ্ছিন্ন অঙ্গটা আবার ফিরে পেলো জাভেল। কোঁচকানো হাতটা নুনের মধ্যে ভালোভাবেই সংরক্ষিত ছিলো। এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা একটা তোয়ালের মধ্যে হাতটা মুড়ে, ছোট জাভেল সেটাকে বাড়িতে নিয়ে গেলো।

ওর স্ত্রী এবং সন্তানেরা সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলো স্বামী এবং পিতার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এই প্রাণহীন অঙ্গটাকে, আঙুলগুলোকে স্পর্শ করলো, নখের ফাঁকে জমে থাকা নুনের গুঁড়োগুলোকে খুঁটে খুঁটে ফেললো। তারপর একটা ছোট্ট শবাধার তৈরী করার জন্যে ছুতোরকে ডেকে পাঠানো হলো।

পরের দিন জেলে নৌকোর সমস্ত মাঝিমাল্লারা ছোট জাভেলের বিচ্ছিন্ন হাতটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করলো। প্রধান শবানুগমনকারী, জাভেলরা দুই ভাই, পাশাপাশি চললো সকলের আগে আগে। কবরখননকারী বগলে জড়িয়ে নিয়ে গেলো শবাধারটা।

ছোট জাভেল সেই থেকে আর সমুদ্রে যায়নি, উপকূলেই একটা হালকা গোছের কাজ খুঁজে নিয়েছিলো। পরে যখনই সে তার ওই দুর্ঘটনার গল্প করতো, তখনই কোন গোপন কথা বলার মতো ফিসফিসিয়ে বলতো, 'আমার ভাই যদি জালটা কেটে দিতে চাইতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমার হাতটা এখনও থাকতো। কিন্তু ও কোনদিনই নিজের সম্পত্তির মায়া ছাড়তে পারে না।'

১৮৮২ সালের তেসরা মে তারিখে হ্যাভ্‌র ছেড়ে চীন-সমুদ্রের উদ্দেশে যাত্রা করে, পালতোলা তিন মাস্তলের জাহাজ 'নত্‌রদাম-দ্য-ভ্যাঁ' চার বছর অনুপস্থিতির পর ১৮৮৬ সালের আটই আগস্ট ফের মার্সাই বন্দরে ফিরে আসছিলো। চীন বন্দরে প্রথম মাল খালাস করার পরেই বুয়েনস এয়ারসে নিয়ে যাবার জন্যে নতুন মাল পেয়ে গিয়েছিলো জাহাজটা এবং সেখান থেকে ফের মাল নিয়ে তাকে যেতে হয়েছিলো ব্রেজিলে।

যাত্রাপথের পরিবর্তন, ক্ষয়ক্ষতির মেরামতি, কয়েক মাস ধরে বায়ুপ্রবাহের ধীরতা, ঝড়ঝাপটায় দিকভ্রান্তি, সমুদ্রযাত্রার নানান ঘটনা-দুর্ঘটনা, ইত্যাদি ইত্যাদি—এই তিন মাস্তলওয়ালা নর্মান জাহাজটিকে তার স্বদেশ থেকে বহু দূরে সরিয়ে রেখেছিলো। এখন খোল বোঝাই করা অ্যামেরিকান খাবার ভর্তি টিনের কৌটো নিয়ে সে আবার মার্সেইতে ফিরে এসেছে।

বন্দর ছাড়ার সময় ক্যাপ্টেন এবং মেট ছাড়া জাহাজে চোদ্দজন নাবিক ছিলো—আটজন নর্মান আর ছজন ব্রিটন। কিন্তু ফেরার সময় অবশিষ্ট ছিলো মাত্র পাঁচজন ব্রিটন এবং চারজন নর্মান। বাদবাকি ব্রিটনরা পথেই মারা গিয়েছিলো, আর নর্মান চারজন উধাও হয়ে গিয়েছিলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। তাদের বদলি হিসেবে দুজন অ্যামেরিকান, একটি নিগ্রো এবং একজন নরওয়েবাসীকে এক সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরের একটা পানশালা থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছিলো।

মাস্তলের ওপরে আড়াআড়িভাবে পাল আর দড়িদড়া গুটিয়ে রাখা বিশাল জাহাজটাকে মার্সেই থেকে আসা একটা জাহাজ গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো ঘূর্ণিজলের স্রোত পেরিয়ে, প্রাসাদ-দুর্গের সমুখ দিয়ে এবং তারপর উপকূলের কাছাকাছি সবকটা ধূসর পাহাড়ের ধার দিয়ে—অস্তগামী সূর্য যেগুলোকে সোনালী বাষ্পে ঢেকে রেখেছিলো। অবশেষে জাহাজটা সেই প্রাচীন বন্দরে এসে ঢুকলো—যেখানে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে আসা ছোট বড় সমস্ত আকৃতির জাহাজ তালগোল পাকানো অবস্থায় মাছের ঝোলের মতো অববাহিকার জলে মৃদু মৃদু দোল খায়। পচা জলের মধ্যে স্বল্প পরিসরে শামুক-গুগলিগুলো পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে থাকে, ঘষা লাগে, মনে হয় যেন জাহাজগুলোর জারক রসে ওগুলোকে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে।

'নত্রদাম-দ্য-ভঁ্যা' একটা দু-মাস্তলওয়ালা ইতালীয় জাহাজ আর একটা মধ্যযুগীয় ব্রিটিশ জাহাজের মাঝখানে জায়গা করে নিলো। আসলে ওরা নিজেরাই সরে গিয়ে সঙ্গী জাহাজটাকে দুজনের মাঝখানে জায়গা করে দিলো। তারপর শুল্ক ভবন আর বন্দরের নিয়মকানুন চুকে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন তার দুই-তৃতীয়াংশ নাবিককে রাত্তিরটা ডাঙায় কাটানোর অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো, মার্সেইতে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। গ্রীষ্মদিনের এই সন্ধ্যায় গরমের সঙ্গে রসুন দেওয়া রান্নার গন্ধ অসংখ্য কলকণ্ঠস্বর, গাড়ির আওয়াজ, চাবুকের স্বনন আর দক্ষিণ দেশের আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে মিশে ভেসে বেড়াচ্ছিলো কোলাহলমুখর শহরটার ওপর দিয়ে।

ওরা দশজন, গত কয়েক মাস ধরে সমুদ্র যাদের টালমাটাল করেছে, তারা ডাঙায় পা দিয়ে শহরজীবনে অনভ্যস্ত মানুষের মতো দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে দুজন দুজন করে ধীর পায়ে এগিয়ে চলছিলো। চলার পথে তারা এধার ওধার করছিলো —গত ছেষট্টিদিন সমুদ্রে থেকে তাদের দেহে যে রাক্ষুসে খিদে জমে উঠেছিলো তার তাড়নায় বন্দরমুখী সরু গলিঘুঁচিতে গন্ধ শুঁকে খুঁজেপেতে দেখছিলো বার বার। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারার তরুণ সিলেস্টিন দুকূলসের নেতৃত্বে নর্মানরাই এগুচ্ছিলো সকলের আগে আগে। অতীতেও ডাঙায় নেমে দুকূলসকেই ওদের নেতৃত্বের ভার নিতে হয়েছে সর্বদা। কোন্ জায়গায় গেলে লাভ আছে, সে কথা সে আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণীর মতো করে বলতো, নিজস্ব পদ্ধতিতে নিরালা রাস্তা খুঁজে বের করতো এবং খুব একটা ঝগড়া-বিবাদে নিজেকে জড়াতো না—বন্দর-শহরে নাবিকদের মধ্যে যা কি না প্রায়শই লেগে থাকে। একবার সে ধরা পড়েছিলো বটে, কিন্তু আসলে কাউকেই সে ভয় করতো না।

অজ্ঞাত পথগুলোর মধ্যে কোন্‌টা উপকূলের দিকে চলে গেছে এবং কোত্থেকে নিষিদ্ধ গন্ধ বইছে, যেখানে তাদের ঢোকা উচিত—সে বিষয়ে খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সিলেসটিন একটা আঁকাবাঁকা গলিপথ বেছে নিলো। বাড়িগুলোর দরজায় ঝোলানো রঙিন কাচের লম্ফে অসংখ্য নম্বর লেখা। সঙ্কীর্ণ খিলানের নিচে চাকরবাকরদের মতো ঢিলে বহির্বাস পরা যে মেয়েগুলো কুর্সিতে বসেছিলো, তারা ওদের দেখে নর্দমাটার দিকে তিন পা এগিয়ে এলো। নর্দমাটা রাস্তাটাকে ঠিক মাঝখান দিয়ে ভাগ করে রেখেছে, তার ওধার দিয়ে বেশ্যাপল্লীর সান্নিধ্যে এসে ইতিমধ্যেই উত্তেজিত হয়ে ওঠা পুরুষমানুষগুলো ইচ্ছাসুখে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

এক সময় একটা বিরাট হলঘরের শেষ প্রান্তে কালো চামড়া দিয়ে আড়াল করা দ্বিতীয় এক খোলা দরজার পেছন থেকে আচমকা এক বিশাল চেহারার বিস্রস্ত বেশবাশ বারাঙ্গনা সামনে এসে হাজির হলো। মোটা সুতীর সাদা চাদরের নিচে তার ভারি উরু আর পায়ের গুলিগুলো প্রকটভাবে ফুটে রয়েছে। খাটো ঝুলের সায়াটা দেখে মনে হয়, যেন একটা হাঁফিয়ে ওঠা কোমর-বন্ধনী। সোনালী লেস লাগানো কালো মখমল দিয়ে তৈরি কাঁচুলির নিচে তার স্তনের নরম মাংস, কাঁধ আর বাহু দুটি ঈষৎ গোলাপী আভা ফুটিয়ে রেখেছে। দূরের কোণ থেকে সে বলছিলো, 'এখানে আসবে নাকি, হ্যাগো সোনার চাঁদ ছেলেরা ?' এক সময় সে উঠে গিয়ে ওদের একজনকে চেপে ধরে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে নিজের দরজার কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করতে লাগলো—যেমন করে একটা মাকড়সা নিজের চাইতে বড় আকারের পতঙ্গকে নিজের কাছে টেনে আনে। লোকটা এই আকস্মিক সংগ্রামে উত্তেজিত হয়ে সামান্য বাধা দিতে থাকে আর অন্যেরা থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে—মনস্থির করতে পারে না অবিলম্বে ভেতরে ঢুকে পড়বে, না কি ক্ষুধাবৃদ্ধিকারী এই প্রমোদভ্রমণকে আরও দীর্ঘায়িত করে তুলবে। প্রাণপণ প্রচেষ্টার পর মেয়েটি যখন নাবিকটাকে নিজের ঘরের দোরগোড়ায় টেনে আনলো, যেখানে সমস্ত বাহিনী তাকে অনুসরণ করার জন্যে প্রস্তুত—তখন এই ধরনের বাড়ির সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিচারকর্তা সিলেস্টিন সহসা চিৎকার করে বললো,-'ওখানে যেও না মার্শাঁ! ওটা ঠিক জায়গা নয়।'

সিলেস্টিনের নির্দেশ মেনে নিয়ে লোকটা তখন একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলো এবং হতাশ বেশ্যাটির অশ্লীল গালাগাল শুনতে শুনতে সকলে আবার একত্রে মিলিত হলো। গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে গলির সামনের দিকে অন্যান্য মেয়েরা নিজেদের দরজা ছেড়ে বেরিয়ে এলো, কর্কশ গলায় প্রতিশ্রুতিময় আমন্ত্রণ ছুঁড়ে দিতে লাগলো তাদের দিকে। গলির সামনের দিক থেকে ভেসে আসা প্রেমের দ্বারপালিকাদের মিষ্টি-মধুর প্রলোভন আর পেছন থেকে হতাশ বারাঙ্গনাদের অশ্লীল অভিশম্পাত—এই দুয়ে মিলে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে ক্রমশ এগিয়ে চললো ওরা। মাঝেমাঝেই অন্য কিছু লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছিলো—জুতোর নাল ঠুকে এগিয়ে যাওয়া সৈনিক পুরুষ…নাবিক…নিঃসঙ্গ কিছু নাগরিক…অথবা ব্যবসা সংস্থার কেরানী। তবু এই বিশাল নোংরা বসতির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো ওরা—যেখানকার নোংরা রাস্তায় পচা জল-কাদার মৃদু প্রবাহ, চার দেওয়ালের মাঝখানে যেখানে নারীমাংসের স্বাগত আমন্ত্রণ।

অবশেষে মনস্থির করলো ভুকলস। বাইরের দিকটা খানিকটা আকর্ষণীয়—
এমন একটা বাড়ির কাছে এসে সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো সে।

তারপর শুরু হলো এক পুরোপুরি মদনোৎসবের দৃশ্য। ছজন নাবিক পুরো চার ঘণ্টা সময় প্রেম আর কারণবারিতে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রাখলো নিজেদের। ছ মাসের বেতন এইভাবে নষ্ট হয়ে গেলো নিঃশেষে।

বড় ঘরটার পানশালাতে রাজা-মহারাজার মতো অধিষ্ঠিত হয়ে কোণের দিকে ছোট ছোট টেবিল নিয়ে বসে থাকা সাধারণ খদ্দেরদের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো ওরা। খদ্দের না জোটা একটি মেয়ে এসে ওদের কাছে বসলো—মেয়েটির পরনে বুড়ো খুকি অথবা কাফের মজলিশে গাইয়েদের মতো পোশাক। প্রতিটি পুরুষমানুষই ভেতরে ঢুকে সমস্ত সন্ধ্যাটার জন্যে একটি করে জুটি বেছে নিচ্ছিলো, কারণ স্থূল রুচি কখনো পালটায় না। ওরা তিনটে টেবিল একসঙ্গে জুড়ে নিয়েছিলো। প্রথম দফায় পানের পরেই দলটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেলো—যতজন নাবিক ততজন মেয়ে এসে সংখ্যা বাড়িয়ে তুললো ওদের। ক্ষণেক্ষণেই কাঠের সিঁড়িতে বিভিন্ন জুটির যুগল পায়ের শব্দ উঠছিলো। অন্য যুগল প্রেমিকরা উধাও হয়ে গেলো সঙ্কীর্ণ দরজাগুলোর আড়ালে, যেগুলো আসলে বিভিন্ন ঘরে গিয়ে ঢোকার পথ।

এক এক পাত্র পান করে নেবার জন্যে আর একবার তারা নিচে নেমে এলো—তারপর আবার ফিরে গেলো নিজেদের ঘরে। কিন্তু একটু পরেই আবার নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে।

এখন, প্রায় মাতাল অবস্থায়, ওরা রীতিমতো চেঁচামেচি করতে শুরু করে দিলো। প্রত্যেকেই নিজেদের ভেতরকার পশুটাকে মুক্ত করে দিয়ে, লাল লাল চোখে, পছন্দ করে নেওয়া মেয়েমানুষটিকে হাঁটুতে বসিয়ে গান গাইলো অথবা তারস্বরে চিৎকার করলো, শক্ত মুঠিতে ঘুষি মারলো টেবিলের ওপরে, আর এক এক চুমুক মদ নামিয়ে দিতে লাগলো গলা দিয়ে। এর মধ্যেই সিলেস্টিন ডুকলস তার পায়ের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে থাকা একটি লালমুখো বিশাল চেহারার মেয়েমানুষকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরছিলো, আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো ওর দিকে। অন্যদের তুলনায় সে মাতাল হয়েছিলো কম, যদিও তুলনায় সে যে কম মদ খেয়েছে—তা নয়। তার মনে তখন অন্য চিন্তা, সঙ্গীদের চাইতে তার মনের অবস্থা অনেক বেশি কোমল। কিছু কথাবার্তা শুরু করার চেষ্টা করছিলো সিলেস্টিন—কিন্তু

চিন্তাগুলো তার কাছে ধরা দিতে এসেও সরে যাচ্ছিলো, ফিরে এলেও উধাও হয়ে যাচ্ছিলো আবার, নিজেই বুঝতে পারছিলো না আসলে কি বলতে চায় সে।

'কবে থেকে, মানে কত দিন ধরে তুমি এখানে আছো?'

'ছ মাস,' জবাব দিলো মেয়েটি।

সিলেস্টিন খুশি হলো, যেন এটা মেয়েটির সৎ চরিত্রেরই প্রমাণ। ফের প্রশ্ন করলো, 'এ জীবন তোমার ভালো লাগে?'

সামান্য ইতস্তত করলো মেয়েটি। তারপর হতাশার সুরে বললো, 'অভ্যেস হয়ে যায়। অন্য ধরনের জীবনের চাইতে এ জীবনে ঝঞ্ঝাট বেশি নয়। তা ছাড়া ঝি বা ঝাড়ুদারনীর পেশা সব সময়েই বাজে।'

সিলেস্টিন যেন ওর মন্তব্যের যথার্থতা মেনে নিলো। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এ অঞ্চলের মেয়ে নও?'

শুধু মাথা নেড়ে জবাব দিলো মেয়েটি।

'অনেক দূর থেকে এসেছো?'

এবারেও ঠোঁট না খুলে সায় জানালো ও।

'কোত্থেকে?'

মেয়েটি যেন চিন্তাভাবনা করে স্খলিত কণ্ঠে বললো, 'পারপিনা থেকে।'

ফের খুশি হয়ে উঠলো সিলেস্টিন, 'আচ্ছা!'

এবারে প্রশ্ন করলো মেয়েটি, 'আর তুমি,…তুমি কি নাবিক?'

'হ্যাঁ, সুন্দরী।'

'তুমি কি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছো?'

'হ্যাঁ। আমি দেশ, বন্দর সব কিছু দেখেছি।'

'সারাটা পৃথিবীই ঘুরেছো বোধহয়?'

'একবার নয়—বরং দুবার।'

আবার দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হলো মেয়েটিকে, যেন ভুলে যাওয়া কিছু খুঁজে বের করতে চাইলো মস্তিষ্কের কুঠরি থেকে। তারপর খানিকটা আলাদা সুরে, গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'সমুদ্রযাত্রার সময় তুমি কি অনেক জাহাজের দেখা পেয়েছো?'

'হ্যাঁ গো, সুন্দরী।'

'নত্রদাম-দ্য-ভঁ্যা-র সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

ভুকলস ঢোক গিললো, 'হয়েছে—সপ্তাহ খানেকের আগে হয়নি।'

মেয়েটি পাণ্ডুর হয়ে উঠলো, সমস্ত রক্ত সরে গেলো ওর গাল দুটি থেকে। জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি ? একেবারে সত্যি ?'

'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি।'

'দিব্যি করে বলো। আমাকে মিথ্যে বলছো না ?'

সিলেস্টিন দু হাত ওপরে তুলে ধরলো, 'ভগবানের দিব্যি, মিথ্যে নয়।'

'সিলেস্টিন দুকলস এখনও সে জাহাজে আছে কি না, তুমি জানো ?'

সিলেস্টিন অবাক হয়ে গেলো, খানিকটা অস্বস্তিও অনুভব করলো সেই সঙ্গে। জবাব দেবার আগে আরও কিছুটা জেনে নেবার বাসনায় প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি তাকে চেনো ?'

মেয়েটি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, 'আমি না—আমার পরিচিত একটি মেয়ে।'

'এখানকার কোন মেয়ে ?'

'না, তবে এখান থেকে খুব একটা দূরেও থাকে না।'

'রাস্তার ওপরে থাকে ? কোন্ ধরনের মেয়ে সে ?'

'কেন, একটা মেয়ে···আমার মতোই একটা মেয়ে !'

'লোকটার সঙ্গে মেয়েটির কি সম্পর্ক ?'

'এক গাঁয়ের মেয়ে বলেই আমার বিশ্বাস।'

দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক, লক্ষ্য করতে লাগলো পরস্পরকে। অনুভব করলো, দুজনের মধ্যে গুরুতর একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

দুকলস ফের কথা শুরু করে, 'আমি ওই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে পারি।'

'কি বলবে তাকে ?'

'বলবো···বলবো, আমি সিলেস্টিন দুকলসকে দেখেছিলাম।'

'সে ভালোই আছে, তাই নয় কি ?'

'তোমার বা আমার মতোই ভালো—শক্তসমর্থ যুবক।'

মেয়েটি আবার নিশ্চুপ হয়ে যায়, যেন নিজের ভাবনাচিন্তাগুলোকে সংহত করে নেবার চেষ্টা করতে থাকে। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করে, 'নত্রদাম-দ্য-ভ্যঁ্যা কোথায় গেছে ?'

'কেন, মার্সেইতেই রয়েছে !'

মেয়েটি নিজের চমকে ওঠা লুকোতে পারলো না, 'সত্যি ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'দুকলসকে তুমি চেনো ?'

'হ্যাঁ, চিনি বইকি।'

তবু ইতস্তত করতে থাকে মেয়েটি। তারপর ভীষণ শান্ত গলায় বলে, 'ভালো। ভালোই হলো।'

'ওর ব্যাপারে তোমার ইচ্ছেটা কি?'

'শোনো! ওকে তুমি বলবে…নাঃ, কিছু না…'

ক্রমশ আরও বেশি করে হতভম্ব হয়ে ওঠে ডুকলস। মেয়েটির দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। অবশেষে প্রশ্ন করলো, 'তুমি নিজেও কি তাকে চেনো?'

'না,' বললো ও।

'তাহলে…তাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও?'

সহসা মনস্থির করে উঠে পড়ে মেয়েটি। একছুটে পানশালার মালিকানের কাছ থেকে এক বোতল লেবু জাতীয় পানীয় নিয়ে এসে বোতলের মুখটা খুলে ফেলে। তারপর সেটা একটা গ্লাসে ঢেলে, গ্লাসটার ফাঁকা অংশটা সাদা জলে ভর্তি করে এগিয়ে দেয় ডুকলসের দিকে, 'এটা খেয়ে নাও।'

'কেন?'

'নেশা কাটিয়ে দেবার জন্যে। তারপরে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো।'

কোন প্রতিবাদ না করে সেটা খেয়ে নেয় ডুকলস। তারপর হাতের উলটো পিঠে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, এবারে বলো—শুনছি তোমার কথা।'

'তুমি প্রতিজ্ঞা করো, আমার সঙ্গে তোমার যে দেখা হয়েছে সে কথা তুমি তাকে বলবে না—আর আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি, তা তুমি কার কাছে জেনেছো সে কথাও বলবে না। তোমাকে শপথ করে বলতে হবে।'

'বেশ,' হাত তুলে ডুকলস বললো, 'শপথ করছি, বলবো না।'

'ভগবানের কাছে শপথ?'

'হ্যাঁ, ঈশ্বরের কাছে।'

'বেশ। তাহলে তুমি তাকে বলবে যে তার বাবা মারা গেছে, মা মারা গেছে, ভাইটিও মারা গেছে। এক মাসের মধ্যেই টাইফয়েড জ্বরে তারা তিনজনে মারা গেছে…১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে—আজ থেকে সাড়ে তিন বছর আগে।'

ডুকলস অনুভব করলো তার সমস্ত শরীরে রক্তস্রোত প্রচণ্ড গতিময় হয়ে উঠেছে। এমন অভিভূত হয়ে উঠলো যে কয়েক মুহূর্ত সে কোন জবাবই দিতে পারলো না। তারপরেই মেয়েটির কথায় তার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করলো।

জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ঠিক জানো ?'

'হ্যাঁ, ঠিক জানি।'

'কে বলেছে তোমাকে ?'

ডুক্লসের কাঁধে হাত রেখে গভীর দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকালো মেয়েটি, 'দিব্যি করে বলো, তুমি সে কথা ফাঁস করে দেবে না ?'

'দেবো না, দিব্যি করলাম।'

'আমি তার বোন।'

'ফ্রাঁসোয়া!' নিজের অজান্তে নামটা উচ্চারণ করে ফেললো ডুক্লস।

আরও একবার স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি কি যেন ভেবে নিতে চাইলো। তারপর নিদারুণ এক ভীতিবোধে কেঁপে উঠে, প্রায় বিড়বিড় করে বলার মতো নিচু গলায় বললো, 'তাহলে তুমি…তুমিই সিলেস্টিন!'

ওরা কেউ আর এতটুকুও নড়ছিলো না, দুজনের দৃষ্টিই দুজনের দিকে স্থির। ওদের চতুর্দিকে ডুক্লসের সঙ্গীসাথীরা তখনও চিৎকার চেঁচামেচি করছিলো। গ্লাসের আওয়াজ, ঘুষির শব্দ, গানের তালে তালে জুতো ঠোকার আওয়াজ আর মেয়েদের কর্কশ তীক্ষ্ণ চিৎকার মিশে যাচ্ছিলো তাদের গানের গর্জনের সঙ্গে।

ডুক্লস অনুভব করলো, ফ্রাঁসোয়া তার শরীরে ঝুঁকে পড়েছে…লজ্জায়, ভয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে তার বোনটি। কেউ যাতে শুনতে না পায় সে জন্যে ফিস-ফিস করে ডুক্লস বললো, 'কি দুর্ভাগ্য! চমৎকার একটা কাজ করলাম, যা হোক!'

পরমুহূর্তেই মেয়েটির দু চোখ জলে ভরে ওঠে। চুপি চুপি বলে, 'সে কি আমার দোষ ?'

আচমকা ডুক্লস বললো, 'তাহলে ওরা সবাই মারা গেছে ?'

'হ্যাঁ, সবাই।'

'বাবা, মা আর ভাইটি ?'

'তিনজনে একই মাসে—যা বলেছি তোমাকে। পোশাকটুকু ছাড়া আমার আর কিচ্ছু ছিলো না। ওষুধের দোকান আর ডাক্তারের কাছে দেনা হয়ে গিয়েছিলো। আসবাবপত্তর বিক্কিরি করে যা পেয়েছিলাম, তাই দিয়ে ওদের তিনজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ মেটাতে হলো।…তারপর উকিল সাহেব কাশোর বাড়িতে বাঁদীর কাজ করতে গেলাম। সে লোকটাকে তুমি ভালো করেই চেনো—সেই খোঁড়াটা। তখন আমার বয়েস ঠিক পনেরো, কারণ তুমি যখন চলে গিয়েছিলে তখন আমার বয়েস পুরো চোদ্দ বছরও হয়নি। ওই লোকটার সঙ্গে আমি সেই

খারাপ কাজটা করে ফেললাম—আসলে কম বয়সে সবাই বড় বোকা থাকে। তারপর বাচ্চা রাখার কাজ নিয়ে গেলাম আর একজনের বাড়িতে। সে লোকটাও আমাকে লুটেপুটে খেয়ে হ্যাভরে একটা ঘরে এনে তুললো। কিন্তু সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই সে আমার কাছে আসা বন্ধ করে দিলো। তিন তিনটে দিন আমি এক কণাও খাবার না খেয়ে ছিলাম। তারপর কোন কাজ যোগাড় করতে না পেরে অন্য অনেকের মতো একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম। আমিও অনেক জায়গা দেখেছি···নোংরা সব জঘন্য জায়গা! রুয়েঁ, এভ্রোঁ, লিলি, বোরদো, আর তারপর এই মার্সেই—যেখানে এখন রয়েছি।'

ওর চোখ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করে—নাক পেরিয়ে, গাল ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঢুকতে থাকে মুখের মধ্যে। বলে, 'ওহ্, সিলেস্টিন, আমি ভেবেছিলাম অ্যাদ্দিনে তুমিও হয়তো মরে গেছো!'

'আমি নিজে থেকে তোমাকে চিনতে পারিনি,' ডুকলস বললো। 'তখন তুমি কত্তো ছোট ছিলে, আর এখন কতো বড় হয়ে গেছো! কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারলে না কেন?'

'আমি এত পুরুষমানুষ দেখেছি যে সবাইকেই এক রকম বলে মনে হয়,' হতাশ ভঙ্গিমায় হাত নেড়ে জবাব দিলো ও।

তখনও স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলো ডুকলস। এক নিদারুণ আবেগের অকরুণ যন্ত্রণায় চাবুক খাওয়া একটা শিশুর মতো কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো তার। তখনও মেয়েটি পা ছড়িয়ে তার হাঁটুর ওপরে বসে রয়েছে, নিজের বাহুবন্ধনে ওকে জড়িয়ে রেখেছে ডুকলস—তার একখানি হাত মেয়েটির পিঠের ওপরে। শুধু ক্রমাগত ওর দিকে তাকিয়ে থাকার ফলেই এতক্ষণে ওকে চিনতে পারছে সে ···তার ছোট্ট বোনটি! যাদের সঙ্গে ওকে সে দেশে রেখে চলে এসেছিলো, তাদের সবাইকেই ও মরতে দেখেছে—আর সে নিজে তখন টালমাটাল হচ্ছে সমুদ্রের বুকে। আচমকা দুই বিশাল থাবায় ওর মাথাটা ধরে আর একবার ওকে ভালো করে দেখলো ডুকলস, শুরু করলো চুমু দিতে। তারপর ফুঁপিয়ে উঠলো প্রচণ্ডভাবে, উত্তাল তরঙ্গের মতো নিদারুণ ফোঁপানি গলা বেয়ে উঠতে লাগলো তার—শুনলে মনে হয় যেন মাতালের হিক্কা। স্খলিতভাবে বললো, 'হ্যাঁ, এই তো তুমি··· তুমিই তো···আমার ছোট্ট ফ্রাঁসোয়া!'

তারপর লাফিয়ে উঠে বীভৎস গলায় শপথ উচ্চারণ করতে শুরু করলো সিলেস্টিন আর টেবিলে এমন এক ঘুষি মারলো যে গ্লাসগুলো ছিটকে পড়ে চুরমার

হয়ে ভেঙে গেলো। পরক্ষণেই তিন পা এগিয়ে এসে টালমাটাল হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো মেঝের ওপরে। ওই অবস্থাতেই সে গড়াগড়ি দিতে দিতে কাঁদলো, হাত-পা আছড়ালো আর মৃত্যুযন্ত্রণার মতো অধীর আর্তনাদ করতে লাগলো।

সমস্ত সঙ্গী-সাথীরা তখন ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিলো। একজন বললো, 'একটু-আধটু মাতাল হয়নি, একেবারে পুরো।'

'বিছানায় শুইয়ে দেওয়া উচিত,' বললো আর একজন।

'ও যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা সবাই একসঙ্গে গিয়ে কয়েদখানায় ঢুকবো,' অন্য একজন বললো।

লোকটার পকেটে টাকাকড়ি ছিলো বলে বাড়িউলী তাকে একটা বিছানা দেবে বলে প্রস্তাব জানালো। তার সঙ্গীরা তখন এতই মাতাল হয়ে উঠেছে যে তারা নিজেরাই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তবু ওকে তারা ধরাধরি করে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে তুলে একটি মেয়ের ঘরে এনে শুইয়ে দিলো, যে মেয়েটি একটু আগে ওরই সঙ্গিনী ছিলো। সেই পাপ-শয্যার পায়ের কাছে একটা কুর্সিতে বসে ভোর না হওয়া পর্যন্ত সারারাত মেয়েটি নিঃশব্দে শুধু কাঁদলো, যেমন কেঁদেছিলো লোকটা নিজেও।

সঙ্গত কারণেই দীর্ঘদেহী শীর্ণকায় যাজক অ্যাবে মারিগঁর নাম হয়েছিলো 'ঈশ্বরের সৈনিক'। ধর্ম সম্পর্কে খানিকটা গোঁড়া হলেও, আসলে তিনি ছিলেন এক মহান চরিত্রের ন্যায়পরায়ণ মানুষ। তাঁর সমস্ত বিশ্বাসই ছিলো স্থির, কখনও তার এতটুকু নড়চড় হতো না। তাঁর ধারণা ছিলো, ঈশ্বরকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছেন—ঈশ্বরের অভিলাষ, ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনি।

গ্রামের ছোট্ট কুটিরটার বাগান-পথে পায়চারি করতে করতে মাঝেমাঝেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতো, 'ঈশ্বর কেন ওই জিনিসটা সৃষ্টি করলেন?' তারপর মনে মনে নিজেকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে একগুঁয়ের মতো কারণটা অনুসন্ধান করতেন. আর প্রায় সব সময়েই কারণটা খুঁজে পেয়েছেন মনে করে এক নিবিড় আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। তিনি এমন মানুষ ছিলেন না যে ধর্মীয় নম্রতায় মিনমিন করে বলবেন, 'হে প্রভু, তোমার উদ্দেশ্য বোধের অতীত!' তিনি যা বলতেন, তা হচ্ছে, 'আমি ঈশ্বরের দাস। তাঁর উদ্দেশ্য আমার জানা উচিত। আর না জানলে তা অন্তত আবিষ্কার করা উচিত।'

প্রকৃতির মধ্যে প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর কাছে যথাযথ এবং প্রশংসনীয়ভাবে যুক্তিসম্মত বলে মনে হতো। 'কেন' এবং তার 'কারণ' সর্বদাই সুষম। ভ্রমণে আনন্দ দেবার জন্যে প্রভাতের সৃষ্টি, ফসল ফলানোর জন্যে দিন, ঘুমের প্রস্তুতির জন্যে সন্ধ্যা আর ঘুমের জন্যে রাতের অন্ধকার।

কৃষিকাজের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে চার ঋতু একের পরে এক যথাযথভাবে ঘুরেফিরে আসে। প্রকৃতির কোন উদ্দেশ্য নেই, অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন আবহাওয়া—যাদের কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যে বিভিন্ন প্রাণী নিজেদের অভ্যস্ত করে নিয়েছে—আসলে তারা লক্ষ্যহীন, এমন সন্দেহ তাঁর কখনও হতো না।

কিন্তু মেয়েদের তিনি ঘৃণা করতেন, ঘৃণা করতেন নিজের অচেতন মনে। মেয়েদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিলো সহজাত। প্রায়শই তিনি খৃষ্টের বাণী পুনরাবৃত্তি করে বলতেন, 'নারী, তোমায় নিয়ে আমি কি করবো?' এবং সেই সঙ্গে জুড়ে দিতেন, 'এ কথা প্রায় বলা চলে যে, ঈশ্বর তাঁর হাতের ওই বিশেষ কাজটির

জন্যে নিজেই নিজের ওপরে অসন্তুষ্ট।' সত্যি সত্যিই মেয়েরা তাঁর কাছে ছিলো, 'দ্বাদশবার অপরিষ্কৃত শিশুর মতো নোংরা'—যার কথা কবি বলেছেন। ছলনাময়ী নারীই সৃষ্টির প্রথম পুরুষকে ফাঁদে ফেলেছিলো এবং এখনও নারী সেই জঘন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নারী দুর্বল, কিন্তু ভয়ঙ্কর—রহস্যময়ভাবে ঝামেলা পাকিয়ে তোলে ওরা। রমণীর বিষাক্ত সৌন্দর্যের চাইতেও প্রেমময় হৃদয়টিকে তিনি ঘৃণা করতেন অনেক বেশি।

মেয়েদের কোমলতা মাঝেমাঝেই তাঁকে আকর্ষণ করতো। যদিও তিনি নিজেকে আক্রমণের ঊর্ধ্বে বলে জানতেন, তবু ওদের হৃদয়ে সতত-শিহরণ-তোলা প্রেমপিয়াসায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। তাঁর মনে হতো, শুধুমাত্র পুরুষকে প্রলুব্ধ এবং পরীক্ষা করার জন্যেই ঈশ্বর স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন। কাজেই প্রতিরক্ষার জন্যে যথোচিত সাবধানতা না নিয়ে নারীর কাছে যাওয়া উচিত নয়। কারণ যে সমস্ত ভয় মানুষ সযত্নে মনের মধ্যে লালন করে, সেগুলো ধারেকাছেই ওত্ পেতে থাকে। প্রসারিত বাহু আর পুরুষের দিকে খোলা অধর তুলে থাকা নারী সত্যিই যেন একটা ফাঁদ।

শুধুমাত্র সন্ন্যাসিনীদেরই তিনি খানিকটা বরদাস্ত করতেন, কেননা অঙ্গীকারের ব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করে ওরা নির্দোষ হয়েছে। তবু ওদের সঙ্গেও তিনি কঠোর ব্যবহার করতেন। কারণ ওদের শৃঙ্খলিত অন্তর আর শোধিত হৃদয়ের গভীরেও তিনি সেই শাশ্বত কোমলতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতেন, যা কি না অহরহ তাঁর হৃদয়কেও স্পর্শ করতো—যদিও তিনি একজন যাজক।

তাঁর এক বোনঝি কাছেই একটা ছোট্ট বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকতো। তাঁর ইচ্ছে ছিলো, ওকে তিনি নারীসংঘ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের সভ্যা করে নেবেন। মেয়েটি সুন্দরী, চপলমতি আর ভীষণ দুষ্টু। অ্যাবে ধর্মোপদেশ দিলে, ও হাসতো। উনি যখন ওর ওপরে রাগ করতেন, ও তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড আবেগে চুমু খেতো। অ্যাবে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইতেন। অথচ এতে তিনি এক সুমিষ্ট আনন্দের আস্বাদ অনুভব করতেন, যা প্রতিটি মানুষের মতো তাঁরও মনের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা পিতৃত্বের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতো।

প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথে পাশাপাশি চলতে গিয়ে প্রায়ই তিনি ওকে ঈশ্বরের কথা—তাঁর প্রভুর কথা বলতেন। মেয়েটি শুনতো খুব কমই। সে তখন আকাশ আর তৃণপুষ্প দেখতো প্রাণের আনন্দে, যে আনন্দের ছোঁয়া ফুটে

উঠতো ওর দু চোখের ছলছল উচ্ছলতায়। কখনও কোন উড়ে যাওয়া পতঙ্গ ধরার জন্যে ও ছুটে যেতো সামনের দিকে, ধরে এনে আবেগে চিৎকার করে বলতো, 'দেখ মামা, কি সুন্দর! ইচ্ছে করছে, চুমু খাই!' উড়ন্ত পতঙ্গ অথবা সুমিষ্ট ফুলকে এই চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা যাজককে উদ্বিগ্ন, বিরক্ত এবং উত্তেজিত করে তুলতো। কারণ এর মধ্যেও তিনি নারীহৃদয়ের চিরন্তন অদম্য কোমলতা দেখতে পেতেন।

গির্জার ঘণ্টাবাদকের স্ত্রী অ্যাবে মারিগঁর ঘরদোরের দিকে নজর রাখতো। একদিন সে খুব সাবধানে যাজককে জানালো যে তাঁর ভাগ্নীর একটি প্রেমিক আছে। যাজক তখন দাড়ি কামাচ্ছিলেন। কথাটা শুনে এক নিদারুণ উত্তেজনায় বাকশক্তিরহিত হয়ে, সমস্ত মুখে সাবান মাখা অবস্থায় তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর, চিন্তা এবং বাকশক্তি ফিরে পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'মিথ্যে কথা! তুমি মিথ্যে বলছো মেলান!'

কিন্তু গ্রাম্য স্ত্রীলোকটি নিজের বুকে হাত রেখে বললো, 'আমি যা বলছি তা যদি মিথ্যে হয় তবে প্রভু যেন আমার বিচার করেন, মঁ্যসিয় ল্যা কুরি। আমি বলছি, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আপনার বোন শুয়ে পড়লেই ও তার কাছে যায়। নদীর ধারে দুজনে দেখা করে। আপনাকে শুধু দশটার পর থেকে মাঝ-রাতের মধ্যে সেখানে যেতে হবে, তাহলে নিজেই সবকিছু দেখতে পাবেন।'

দাড়ি কামানো বন্ধ করে তিনি ঘরের মধ্যে দ্রুততালে পায়চারি করতে শুরু করলেন—গুরুতর চিন্তার সময় সর্বদাই তিনি এমনি করে থাকেন। তারপর ফের যখন দাড়ি কামাবার চেষ্টা করলেন, তখন নাক থেকে কান পর্যন্ত তিন তিনবার ছড়ে গেলো। প্রচণ্ড রাগে সারাটা দিন তিনি গুম হয়ে রইলেন। প্রেমের দুর্জয় শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর যাজকীয় অসম্প্রীতি তো ছিলোই, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও যুক্ত হলো প্রতারিত পিতা, লুণ্ঠিত শিক্ষক এবং একটা শিশুর কাছে অবহেলিত আত্মা-রক্ষকের নৈতিক ঘৃণা। বাবা-মাকে ছাড়াই, এমন কি তাঁদের পরামর্শও উপেক্ষা করে মেয়ে যখন নিজের বর পছন্দ করে নিয়েছে বলে ঘোষণা করে, তখন বাবা-মার যেমন আত্ম-অহমিকায় আঘাত লাগে, মারিগঁও ঠিক তেমনি দুঃখ অনুভব করছিলেন।

রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর তিনি খানিকটা পড়াশুনো করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারলেন না। ক্রমশ তাঁর ক্রোধ বেড়েই চললো। ঘড়িতে দশটা বাজতেই তিনি তাঁর লাঠিখানা তুলে নিলেন।

ওক কাঠে তৈরি এই সাংঘাতিক মুগুরটা তিনি রাত্রিবেলায় রোগী দেখতে যাবার সময় সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন। শক্ত মুঠিতে ধরে সেই ভয়ঙ্কর মুগুরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি বাতাসে আতঙ্কজনক বৃত্ত রচনা করছিলেন, আর হাসিমুখে তাই দেখছিলেন। তারপর হঠাৎ একসময় সেটা ওপরে তুলে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে একটা কুর্সির ওপরে সজোরে নামিয়ে আনলেন। ফলে কুর্সির পেছনটা দু টুকরো হয়ে মেঝের ওপরে আছড়ে পড়লো।

বাইরে বেরুবার জন্যে তিনি দরজা খুললেন, কিন্তু প্লাবিত জ্যোৎস্নার দুর্লভ ঐশ্বর্য দোরগোড়ার কাছেই তাঁকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিলো। এক মহান চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি, অথচ স্বপ্নবিলাসী কবিদেরই তাতে একমাত্র অধিকার। গির্জার একজন পিতা হওয়া সত্ত্বেও আচমকা তাঁর মন নরম হয়ে উঠলো। বিষাদময়ী রজনীর অপরূপ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য এক নিবিড় আবেগে ভরিয়ে তুললো তাঁর সমস্ত চেতনা।

তাঁর ছোট্ট বাগানটাতে উদাসী জ্যোৎস্নায় স্নান করে ওঠা সারি সারি ফলের গাছগুলো সবুজের পোশাক পরা সরু সরু ডালপালা নিয়ে পথের ওপরে ছায়াময়, অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। বাড়ির প্রাচীরের গায়ে বেয়ে ওঠা রাক্ষুসে পুষ্পিত লতার মিষ্টি গন্ধে নিশ্বাস ভরে উঠছে—উষ্ণ স্বচ্ছ রাত্রির মাঝে সুরভিত আত্মার মতো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে তার আশ্চর্য সুবাস।

বুক ভরে নিশ্বাস নিতে শুরু করলেন মারিগঁ। মাতাল যেমন করে মদ্যপান করে তেমনিভাবে বায়ুপান করতে লাগলেন তিনি। ভাগ্নীর কথা প্রায় ভুলে গিয়ে মুগ্ধ আবিষ্ট মনে হাঁটতে লাগলেন ধীরে পায়ে।

উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে সোহাগী জ্যোৎস্নার জোয়ারে স্বপ্নমাখা নিশীথিনীর স্নানরত কোমল-বিধুর রূপ দেখে থমকে দাঁড়ালেন মারিগঁ। মস্ত দাদুরীর নাতিদীর্ঘ ধাতব স্বরের ঐকতান মিলিয়ে যাচ্ছে অসীম মহাশূন্যে। মোহিনী জ্যোৎস্নায় মিশে রয়েছে বিরহী নাইটিঙ্গেলের দূরাগত গান—যে গান কোন চিন্তা নয়, শুধু স্বপ্ন বয়ে আনে। আলতো, থির থির করে কেঁপে ওঠা সেই আশ্চর্য সুরের সঙ্গে চুম্বনের যেন কি এক মধুর সাদৃশ্য রয়েছে!

আবে চলতে থাকেন—তিনি জানেন না, কেন তাঁর সাহস ঝিমিয়ে আসে। সহসা নিজেকে ভীষণ দুর্বল আর শ্রান্ত বলে মনে হয় তাঁর। বসে পড়তে ভীষণ ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় সেখানেই একটুখানি থেমে গিয়ে ঈশ্বর আর তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির গুণগান করতে। তাঁর ঠিক নিচেই, ছোট্ট নদীটার বাঁক বরাবর দীর্ঘ

এক সারি পপলার গাছ। নদীর আঁকাবাঁকা তীরে, আশেপাশে মিহি কুয়াশার এক অলৌকিক স্বচ্ছ আবরণ বাতাসে গা ভাসিয়ে নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে একরাশ জমাট বাঁধা সাদা বাষ্পের মতো—চাঁদের আলোয় রূপোলী ঝিলিক উঠছে সেখান থেকে।

হৃদয়ের গভীরে এক শক্তিময় আবেগের তাড়নায় আবার থমকে দাঁড়ালেন যাজকবর। একটা আবছা সন্দেহ, এক অস্পষ্ট অস্বস্তিবোধ পেয়ে বসলো তাঁকে। অনুভব করলেন, একটা পুরনো প্রশ্ন আবার তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠেছে।

কেন ঈশ্বর এমনটি করলেন? রাত্রি যদি নিদ্রা, নিশ্চেতনতা, বিশ্রাম আর বিস্মরণের জন্যেই হবে, তবে কেন তিনি রাতকে দিনের চাইতে মোহমদির, প্রত্যুষ আর প্রদোষের চাইতে মধুরতর করলেন? সূর্যের চাইতে কাব্যময় এই ধীরগতি নক্ষত্রগুলি—যাদের দেখে মনে হয় বিরাট জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সবকিছুকে আধো আলোয় রহস্যময় করে তোলার জন্যেই বুঝি ওদের সৃষ্টি—তারা কেন সবগুলো ছায়ার ঐশ্বর্যকে এমন করে উজ্জ্বল করে তোলে? কেন অন্য সকলের মতো মধুকণ্ঠী বিহঙ্গেরা এই সময় বিশ্রাম নেয় না? কেন তারা আবছা বিপজ্জনক অন্ধকারে বসে গান গায়? সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কেন এই আধো-ঘোমটার আবরণ? কেন হৃদয়ে এই থরথর কম্পন, প্রাণে এই জড়োজড়ো আবেগ আর দেহে এই বিধুর অবসাদ? রাত যখন নিদ্রা বয়ে আনে, তখন কেন এই প্রলোভনের প্রদর্শনী—যা মানুষ কখনও দেখতে পায় না? কার জন্যে তবে এই অমূর্ত দৃশ্যশোভা, স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে আসা এই উদ্বেল কাব্যের বন্যাধারা?...অ্যাবে এ সবের কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

নিচের চারণভূমির কিনারা ধরে দুটি ছায়ামূর্তি তখন কুয়াশায় ঝিকিয়ে ওঠা বনস্পতির খিলানের তলা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিলো। পুরুষটি দুজনের মধ্যে দীর্ঘকায়, এক হাতে প্রেমিকার গলা জড়িয়ে রেখে মাঝেমাঝেই সে ওর কপালে চুমু দিচ্ছিলো। চতুর্দিকের নিষ্প্রাণ মাঠ-প্রান্তরকে ওরা যেন প্রাণময় করে তুলেছে, শুধু ওদের জন্যেই সমস্ত পরিবেশে জেগে উঠেছে এক রূপময় স্বর্গসুষমা। মনে হচ্ছিলো আসলে ওরা দুটিতে মিলে যেন এক, ওদের জন্যেই যেন এই নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রির সৃষ্টি। যাজক অ্যাবে মারিগঁর দিকে ওরা এগিয়ে আসছিলো জীবন্ত উত্তরের মতো—যেন তাঁর প্রভু অনুগ্রহ করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন।

স্পন্দিত হৃদয়ে তিনি বিহ্বল, আর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঈশ্বরের

ইচ্ছাপূরণের জন্যে অনুষ্ঠিত রুথ আর বোয়াজের প্রেমের মতো পবিত্র বাইবেলের কিছু কিছু মহান প্রণয় দৃশ্যের সঙ্গে এর যেন এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পেলেন তিনি। তাঁর মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে গেলো সমস্ত সঙ্গীতের সার অনন্ত সঙ্গীত, আকুল ক্রন্দন, শরীরের আহ্বান আর সমস্ত প্রেমময় আবেগ-উচ্ছল কাব্য-কবিতা —যা প্রেমের দহনে দীপ্ত। নিজেকে তিনি নিজেই বললেন, 'মানুষের প্রেমকে তাঁর আদর্শের পোশাকে আবৃত করার জন্যেই বোধহয় ঈশ্বর এমনধারা রাত্রির সৃষ্টি করেছেন।'

হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলা যুগলের কাছ থেকে সরে এলেন তিনি। মেয়েটি সত্যিই তাঁর ভাগ্নী। এখন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি নিজেই ঈশ্বরকে অমান্য করতে যাচ্ছিলেন কি না। কারণ এমন দৃষ্টিনন্দন ভাবে ঘিরে রেখে ঈশ্বর কি সত্যিই প্রেমকে অনুমোদন করেননি?

বিস্ময়ে বিহ্বল মারিগঁ প্রায় লজ্জিত হয়ে পালিয়ে এলেন—যেন তিনি এমন এক মন্দিরে ঢুকে পড়েছিলেন, যেখানে তাঁর প্রবেশের কোন অধিকারই নেই।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। জার্মানরা ফ্রান্স দখল করে রেখেছে। সফল প্রতিপক্ষের দু হাঁটুর মাঝখানে পড়ে থাকা কুস্তিগীরের মতো সারাটা দেশ যেন হাঁফাচ্ছে।

অনশন আর হতাশায় দীর্ঘ দিন ধরে নিপীড়িত হওয়ার পর পারী থেকে আসা প্রথম ট্রেনটা দেশ-গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ঢিমে তালে এগিয়ে যাচ্ছিলো। যাত্রীরা জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলো বিধ্বস্ত প্রান্তর আর দগ্ধ গ্রামগুলোর দিকে। যে কটা বাড়ি এখনও খাড়া হয়ে রয়েছে, সেগুলোর সামনে কুসিতে অথবা ঘোড়ার পিঠে বসে তামার কাঁটা লাগানো কালো শিরস্ত্রাণ পরা প্রাশিয়ান সৈনিকরা তামাকের নল ফুঁকছে। অন্যেরা কাজকর্ম আর নয়তো গল্পগুজব করছে, যেন ওরা ওই পরিবারেরই এক-একজন। বিভিন্ন শহরের ভেতর দিয়ে গেলেই দেখা যাবে, সমস্ত রেজিমেন্টগুলো বর্গাকারে দাঁড়িয়ে ড্রিল করছে এবং গাড়ির চাকার ঘড় ঘড় আওয়াজ সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তেই শোনা যাবে তাদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত কর্কশ স্বরের প্রতিটি ফৌজি নির্দেশ।

'সমস্ত অবরোধকালীন সময়টাতে ম্যঁসিয় দুবুই পারীতে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর হয়ে কাজ করেছেন। এখন তিনি চলেছেন স্ত্রী আর কন্যার সঙ্গে মিলিত হতে—আক্রমণ শুরু হবার আগেই যাদের তিনি দূরদর্শীর মতো স্যুইটজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অনশন এবং দুঃখ-দুর্দশাও এই ধনী শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ীর ভুঁড়িটি কমাতে পারেনি। মানুষের বর্বরতার প্রতি সীমাহীন তিক্ত অভিযোগ এবং দুঃখময় হতাশায় ভরা গত একটা বছরে অনেক নিদারুণ ঘটনা পেরিয়ে এসেছেন তিনি। অথচ এখন যুদ্ধের শেষে সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় এই প্রথম তিনি প্রাশিয়ানদের দেখতে পেলেন—যদিও তিনি দুর্গ প্রাচীরে পাহারা দিয়েছেন, হাড়-কাঁপানো শীতের রাতেও একনিষ্ঠ ভাবে নজর রেখেছেন ঘোড়ার পিঠে বসে। আতঙ্ক আর ঘৃণা মেশানো দৃষ্টিতে ওই দাড়িওয়ালা সশস্ত্র লোকগুলোকে দেখছিলেন তিনি, যারা কিনা ফ্রান্সের মাটির সর্বত্র ঘাঁটি করে বসেছে—যেন এটাই ওদের দেশ-বাড়ি। মনে মনে এক অসহায় স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা অনুভব করছিলেন ম্যঁসিয় দুবুই, অথচ সেই সঙ্গে মিশে ছিলো সতর্কতা আর আত্মরক্ষার অন্ধ প্রবৃত্তিটি—যা কোন সময়েই আমাদের ত্যাগ করে যায় না।

দুজন ইংরেজ মুসাফিরও যাচ্ছিলো ওই একই কামরায়, অবিচলিত কৌতূহলী

চোখে এদিক সেদিকে তাকাচ্ছিলো তারা। দুজনেরই শক্ত সমর্থ চেহারা। নিজেদের ভাষায় কথা বলতে বলতে তারা মাঝেমধ্যে ভ্রমণনির্দেশিকাটা খুলে দেখছে, আর জোরে জোরে নির্দিষ্ট জায়গাগুলোর নাম শব্দ করে পড়ছে।

হঠাৎ ছোট্ট একটা গ্রাম্য স্টেশনে ট্রেনটা এসে থামতেই দোতলা পাদানিতে তলোয়ারের ঝনৎকার তুলে একটা প্রাশিয়ান অফিসার কামরাটার মধ্যে লাফিয়ে উঠলো। লোকটার লম্বা চেহারা, পরনে আঁটসাঁট উর্দি, মুখে প্রচণ্ড বিরক্তির কুঞ্চন। চুলগুলো এত লাল যে মনে হয় বুঝি আগুন ধরে রয়েছে। তার চাইতে খানিকটা পাতলা রঙের মস্ত গোঁফ আর দাড়িগুলো লোকটার মুখটাকে যেন ঠিক দু ভাগে ভাগ করে রেখেছে।

ইংরেজ দুজন নতুন জেগে ওঠা আগ্রহে হাসি-হাসি মুখে লোকটার দিকে তাকাতে শুরু করলো, আর ম্যঁসিয় দুবুই এমন ভান করতে লাগলেন যেন তিনি পত্রিকা পড়ছেন। এক কোণে গুটিসুটি হয়ে বসে ছিলেন তিনি—ঠিক চৌকিদারের উপস্থিতিতে চোর-ছ্যাঁচড়ের মতো অবস্থা।

ট্রেনটা ফের চলতে শুরু করেছিলো। ইংরেজ দুজন আগের মতোই বকবক করছে, বিভিন্ন যুদ্ধের সঠিক জায়গাগুলো দেখার জন্যে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন হাত তুলে দিগন্তের কিনারায় একটা গ্রামের দিকে দেখাতেই, প্রাশিয়ান অফিসারটা তার লম্বা পা দুটো টান টান করে, পেছন দিকে একটু হেলেদুলে বসে, ফরাসী ভাষায় বললো, 'ওই গ্রামটাতে আমরা এক ডজন ফরাসী মেরেছিলাম, আর শ-খানেকেরও ওপরে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

কৌতূহলী ইংরেজরা তক্ষুনি বলে উঠলো, 'আচ্ছা! কি নাম ওই গ্রামটার?'

'ফার্সবুর্গ,' প্রাশিয়ানটা বললো। 'ওই ফরাসী চৌকিদারগুলোকে আমরা কান পাকড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।' ম্যঁসিয় দুবুইয়ের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, গোঁফের ফাঁক দিয়ে অপমানকর ভাবে হাসলো লোকটা।

শুধু বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর দখল করে রাখা গ্রামের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে ট্রেনটা। রাস্তায়, মাঠের পারে, দরজার সামনে কিংবা কাফের বাইরে আড্ডা মারা অবস্থায়—সর্বত্রই জার্মানদের দেখা যায়। আফ্রিকার পঙ্গপালের মতো মাটির বুক ছেয়ে রেখেছে ওরা।

হাত নাচিয়ে অফিসারটি বললো, 'আদেশ দেবার ভার যদি আমার ওপরে থাকতো, তাহলে আমি পারী দখল করে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতাম—

প্রত্যেকটা লোককে খুন করে ফেলতাম। ফ্রান্স বলতে আর কিছু থাকতো না।'

ইংরেজ দুজন মার্জিতভাবে শুধু বললো, 'হ্যাঁ, তা বটেই তো।'

'বিশ বছরের মধ্যে পুরো ইউরোপটাই আমাদের হয়ে যাবে,' অফিসারটা বলেই চললো। 'একা প্রাশিয়া ওদের সকলের পক্ষে যথেষ্ট হয়েও বেশি।'

ইংরেজ দুজনের অস্বস্তি লাগছিলো, তারা এ কথার কোন উত্তর দিলো না। দীর্ঘ গোঁফের পেছনে তাদের নৈর্ব্যক্তিক মুখ দুটো যেন দুটি মোমের মুখোশ। প্রাশিয়ান অফিসারটি হাসতে শুরু করলো। হাসতে হাসতে হেলেদুলে ব্যঙ্গ করতে লাগলো পারীর পতন আর পরাজিত শত্রুদের দীনতা নিয়ে। ব্যঙ্গ করলো অষ্ট্রিয়াকে নিয়ে, যা নাকি মাত্র কিছুদিন আগেই জয় করে নেওয়া হয়েছে—ব্যঙ্গ করলো অষ্ট্রিয়াবাসীদের প্রচণ্ড হিংস্র অথচ অর্থহীন প্রতিরক্ষার বাহারকে। গারদ্ মোবাইল আর তার অপদার্থ সাঁজোয়া বাহিনীকেও ব্যঙ্গ করলো লোকটা। ঘোষণা করলো, দখল করে নেওয়া কামানগুলো দিয়ে বিসমার্ক নাকি একটা লোহার শহর গড়তে চলেছেন। তারপরেই নিজের জুতোজোড়া দিয়ে ম্ঁসিয় দুবুইয়ের উরুতে একটা ঠোক্কর মেরে বসলো। ম্ঁসিয় দুবুইয়ের চুলের গোড়া অব্দি লাল হয়ে উঠলো, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি।

ইংরেজ দুজন এমন নির্লিপ্তভাবে বসে রইলো যেন তারা পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেকে বহুদূরে নিজেদের দ্বীপটাতেই রয়েছে। অফিসারটি তামাকের নলটা বের করে স্থির দৃষ্টিতে ফরাসী ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন, 'আপনার কাছে তামাক নেই, তাই না?'

'না, ম্ঁসিয়,' ম্ঁসিয় দুবুই জবাব দিলেন।

'তাহলে এরপরে ট্রেনটা থামলে, আপনি আমার জন্যে খানিকটা তামাক কিনে আনতে পারেন।' নতুন করে হাসতে শুরু করলো জার্মানটা, 'আমি আপনাকে একটা পানীয়ের পয়সা দিয়ে দেবো।'

ট্রেনটা বাঁশি বাজিয়ে গতি কমিয়ে এনেছিলো। যে স্টেশনে এসে তারা থামলো, সেটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কামরার দরজা খুলে জার্মানটা এক হাতে ম্ঁসিয় দুবুইকে চেপে ধরলো, 'যান! যা বলেছি, তাই করুন—জলদি!'

সমস্ত স্টেশনটা প্রাশিয়ান সৈন্যরা দখল করে রেখেছে। কাঠের জাফরির ওধার থেকে আরও কিছু সৈন্য তাকিয়ে রয়েছে এধারে। ফের যাত্রা শুরু করার জন্যে ইঞ্জিনটা ইতিমধ্যেই বাষ্প সঞ্চয় করতে শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যেই ম্ঁসিয় দুবুই হঠাৎ এক লাফে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন এবং স্টেশন মাস্টার

সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সবেগে পাশের কামরায় গিয়ে উঠলেন।

এখানে তিনি সম্পূর্ণ একা। হৃৎস্পন্দন এত বেড়ে উঠেছিলো যে দ্রুত হাতে ওয়েস্টকোটটা খুলে ফেললেন তিনি। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে কপালের ঘাম মুছে নিলেন।

আর একটা স্টেশনে এসে ট্রেনটা থামতেই হঠাৎ জার্মানটা দরজার সামনে এসে হাজির হলো। এক লাফে ভেতরে এসে ঢুকলো লোকটা, তার ঠিক পেছনেই ইংরেজ দুজন—কৌতূহলের জন্যে তারাও না এসে পারেনি। ফরাসী ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসলো জার্মানটা, তখনও তার মুখে মৃদু হাসির রেখা। বললো, 'আমি যা করতে বলেছিলাম, আপনি তা করতে চাননি।'

'না, মঁ্যসিয়, ' জবাব দিলেন মঁ্যসিয় দুবুই।

ট্রেন তখন সবেমাত্র স্টেশনটা ছাড়িয়েছে। অফিসারটি বললো, 'তাহলে আপনার গোঁফজোড়া কেটে নিয়ে আমি পাইপটা ভরি।'

ফরাসী ভদ্রলোকের দিকে সত্যি সত্যিই হাত বাড়ালো লোকটা। ইংরেজ দুজন তখনও সেই একই রকম নিরাসক্তভাবে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টিতে। ততক্ষণে জার্মানটি মঁ্যসিয় দুবুইয়ের গোঁফ ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে, কলার চেপে ধরে, লোকটাকে তার আসনে জোর করে চেপে ধরলেন মঁ্যসিয় দুবুই। প্রচণ্ড রাগে তার কপালের ধার দুটো তখন দপদপ করছে, দু চোখে আগুন। এক হাতে জার্মানটির গলা চেপে ধরে অন্য হাতে তার মুখে প্রচণ্ড ঘুষি বসাতে লাগলেন তিনি। প্রাশিয়ানটি প্রাণপণে উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ার খোলার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু দুবুই তার ভুঁড়ির প্রচণ্ড ভারে লোকটাকে চেপে ধরে ক্রমাগত ঘুষি ছুঁড়ে যাচ্ছেন, নিশ্বাস ফেলার অবকাশটুকুও নিচ্ছেন না, এমন কি ঘুষিগুলো কোথায় পড়ছে তাও তিনি জানেন না। জার্মানটার সমস্ত মুখ বেয়ে রক্ত নামলো, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ। থুথুর সঙ্গে ভাঙা দাঁতগুলো ছিটিয়ে দিয়ে বৃথাই সে বারবার এই ক্ষিপ্ত মানুষটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো।

ঘটনাটা ভালোভাবে দেখার জন্যে ইংরেজ দুজনকে উঠে দাঁড়িয়ে কাছে চলে আসতে হলো। আনন্দ আর কৌতুহলে ভরপুর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারা—প্রতিপক্ষ দুজনেরই পক্ষে বা বিপক্ষে বাজি ফেলতে তারা প্রস্তুত।

আচমকা এই হিংস্র প্রচেষ্টায় পরিশ্রান্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মঁ্যসিয় দুবুই।

তারপর একটিও কথা না বলে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

প্রাশিয়ানটি আর পালটা আক্রমণ চালালো না, এই বন্য আচরণ তাকে বিচলিত এবং আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলো। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতেই সে বললো, 'পিস্তল যুদ্ধে খুশি করতে না পারলে, আমি আপনাকে খুন করে ফেলবো।'

'আপনার যখনই ইচ্ছে হবে, বলবেন। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।' জবাব দিলেন দুবুই।

'এখানেই স্ট্রাসবুর্গ শহর। আমার সহকারী হবার জন্যে আমি দুজন অফিসারকে নিয়ে আসবো। ট্রেনটা স্টেশন ছাড়ার আগে যেটুকু সময় থাকবে, সেটুকুই যথেষ্ট।'

ম্যঁসিয় দুবুই ইঞ্জিনটার মতোই হাঁফাতে হাঁফাতে ইংরেজ দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা আমার সহকারী হবেন কি ?'

'নিশ্চয়ই,' একসঙ্গে জবাব দিলো তারা।

ট্রেন থামলো। প্রাশিয়ানটা এক মিনিটের মধ্যেই পিস্তলধারী দুই সহকর্মীকে ডেকে নিয়ে এলো। তারপর সবাই মিলে একটা উঁচু জায়গার দিকে এগিয়ে চললো।

ইংরেজ দুজন অনবরত ঘড়ি দেখছিলো। পাছে ট্রেন ধরতে দেরী হয়ে যায়, সে জন্যে তাড়াহুড়ো করে যোগাড়যন্ত্র করতে লাগলো তারা। ম্যঁসিয় দুবুই জীবনে কোনদিন পিস্তল ছোঁড়েননি। ওরা প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বিশ পা দূরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলো। প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কি প্রস্তুত ?'

'হ্যাঁ, ম্যঁসিয়,' জবাব দেওয়ার সময়েই ম্যঁসিয় দুবুই লক্ষ্য করলেন, রোদ আটকাবার জন্যে একজন ইংরেজ তার ছাতাটা খুলে নিয়েছে।

'গুলি ছুড়ুন!' নির্দেশ দিলো একজন।

কোন কিছু চিন্তা না করে এলোপাতাড়ি গুলি চালালেন ম্যঁসিয় দুবুই এবং অবাক হয়ে দেখলেন, প্রাশিয়ানটি দু হাত ওপরে তুলে কেমন যেন টলমল করছে। পরক্ষণেই সোজা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো লোকটা। তার মানে, অফিসারটিকে মেরে ফেলেছেন তিনি।

'আহ্!' কৌতূহলের নিবৃত্তিতে আনন্দে অধীর একজন ইংরেজ কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠলো। অন্যজন, যে তখনও ঘড়িটা হাতে ধরে রেখেছে, সে দ্রুততালে কুচকাওয়াজ করার ভঙ্গিতে দুবুইকে টানতে টানতে স্টেশনের দিকে নিয়ে চললো আর তার সঙ্গীটি দু পাশে দু হাত টান করে গুণতে লাগলো, 'এক,

দুই! এক, দুই!'

জোর কদমে কুচকাওয়াজ করতে করতে স্টেশনের দিকে এগুচ্ছে তিনজন, যেন মজাদার কাগজে ছাপা তিনটে ভাঁড়ের ছবি।

ট্রেনটা তখন প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে। কামরায় লাফিয়ে উঠলো তিনজনে। ইংরেজরা টুপি খুলে, তিনবার সেটা মাথার ওপরে দুলিয়ে উচ্ছ্বাসভরে চিৎকার করে উঠলো, 'হিপ হিপ হিপ, হুররে!' তারপরই গম্ভীরভাবে একজন একজন করে ম্যঁসিয় দুবুইয়ের সঙ্গে ডান হাত মিলিয়ে ফিরে গেলো নিজের নিজের জায়গায়।

ব্রানিজার ভেনাস

কয়েক বছর আগে ব্রানিজাতে একজন বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত বাস করতেন। জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা আর ঈশ্বরভীরুতার জন্যে তাঁর যতো না খ্যাতি ছিল, সুন্দরী স্ত্রীর জন্যে তার চাইতে কম ছিলো না। মেয়েটি সম্পূর্ণভাবেই 'ব্রানিজার ভেনাস' নাম পাবার উপযুক্ত—নিজের অপরূপ রূপলাবণ্যের জন্যে তো বটেই, তার চাইতেও বড় কথা ট্যালমুডে বিশিষ্ট পণ্ডিতের গৃহিণী হবার জন্যে। কারণ নিয়ম অনুসারে ইহুদি দার্শনিকদের গৃহিণীরা কুৎসিত হয় আর নয়তো তাদের কোন শারীরিক ত্রুটি থাকে।

ট্যালমুডে বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: 'এ কথা সকলেই ভালোভাবে জানে যে প্রকৃত বিবাহ স্বর্গেই অনুষ্ঠিত হয়। একটি পুরুষশিশু জন্ম গ্রহণ করার সময়েই এক দৈবকণ্ঠ তার ভাবী স্ত্রীর নাম ঘোষণা করে দেন এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘোষণা করেন তার ভাবী স্বামীর নাম। কিন্তু যথার্থ পিতারা যেমন সন্তানদের জন্যে ভালো পোশাকগুলো রেখে দিয়ে বাড়িতে কেবলমাত্র খারাপ পোশাকগুলোই পরিধান করেন, তেমনি ঈশ্বরও আচার্যদের জন্যে এমন নারী বিতরণ করেন, যাদের গ্রহণ করার জন্যে অন্য মানুষরা এতটুকুও উৎসাহী হবে না।'

যাই হোক, আমাদের এই ট্যালমুডবিদ পণ্ডিতের ক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁর নিয়মের একটা ব্যতিক্রম করলেন এবং একটি রূপবতী ভেনাসকে তার কাছে পাঠালেন। হয়তো ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং আপাতদৃষ্টিতে সে নিয়ম অল্প কঠোর করার জন্যেই ঈশ্বর এমনটি করেছিলেন। এই দার্শনিকটির স্ত্রী এমন এক মহিলা যে কিনা কোন রাজসিংহাসনে বসলেও সে সিংহাসনের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হতো। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী, অসাধারণ কামোত্তেজক শরীর, মাথায় সুন্দর ঘন কালো চুল—বেণীর আকারে সে চুলগুলো লুটিয়ে থাকতো ওর অহঙ্কারী কাঁধের ওপরে। চোখ দুটি আয়ত, ঘন কালো···সে চোখের ঘুম-ঘুম দৃষ্টি ঝিলমিল করতো দীর্ঘ অক্ষিপক্ষ্মের নিচে। সুন্দর হাত দুটি দেখে মনে হতো যেন হাতির দাঁত কুঁদে তৈরি করা হয়েছে।

এই অসামান্যা রমণী, যাকে দেখে মনে হতো প্রকৃতি বুঝি ওকে শুধুমাত্র শাসন করার জন্যেই সৃষ্টি করেছে···সৃষ্টি করেছে পায়ের কাছে বশংবদ

ক্রীতদাসদের দিকে তাকাবার জন্যে…চিত্রকরের তুলি, ভাস্করের ছেনি এবং কবির কলমকে প্রেরণা যোগাবার জন্যে—সে কিন্তু জীবন কাটাতো একটা উষ্ণ কক্ষে বন্ধ হয়ে থাকা একটা দুষ্প্রাপ্য সুন্দর ফুলের মতো। দামী ফারের পোশাকটা গায়ে জড়িয়ে ও সমস্ত দিন বসে বসে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

ওর কোন সন্তান ছিলো না। দার্শনিক স্বামীটি কাক-ডাকা ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনো আর জপতপ নিয়ে থাকতেন, আর তাঁর স্ত্রী ছিলো একটি 'অবগুন্ঠিতা সৌন্দর্য'। ঘরদোরের দিকে ও কোন মনোযোগ দিতো না, কারণ ও ছিলো ধনী আর সংসারের সবকিছুই খুশিমতো চলতো সপ্তাহে একবার দম দেওয়া ঘড়ির মতো। কেউ ওকে দেখতে আসতো না, ও নিজেও কখনও বাড়ির বাইরে যেতো না। বসে বসে স্বপ্ন দেখতো, আপন মনে ভাবতো আর হাই তুলতো।

একদিন শহরের ওপর দিয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাওয়ার পর মূসার আগমন প্রত্যাশায় যখন সবকটা জানলা খুলে রাখা হয়েছিলো, আমাদের ইহুদি ভেনাসটি তখনও যথারীতি আরাম-কুর্সিতে বসে বসে আপন মনে চিন্তা করছিলো। গায়ে গরম ফার থাকা সত্ত্বেও কেঁপে কেঁপে উঠছিলো ও। সহসা দীপ্ত চোখ দুটো তুলে ও স্বামীর দিকে দৃষ্টি স্থির করলো। তিনি তখন সামনে পেছনে দুলে দুলে অনুশাসন গ্রন্থ ট্যালমুড পাঠ করছিলেন।

আচমকা ও প্রশ্ন করলো, 'বলো না, ডেভিড পুত্র মূসা কখন আসবেন?'

'আসবেন,' জবাব দিলেন দার্শনিক, 'সমস্ত ইহুদিরা যখন সম্পূর্ণ সৎ অথবা সম্পূর্ণ পঙ্কিল হয়ে যায়, তখনই তাঁর আবির্ভাব হয়। আমাদের শাস্ত্র ট্যালমুডে সে কথাই বলা হয়েছে।'

'সমস্ত ইহুদিরা কোনদিনও সৎ হবে বলে কি তুমি বিশ্বাস করো?'

'কি করে করি?'

'তাহলে কি ইহুদিরা যখন পাপে কলুষিত হয়ে উঠবে, তখন মূসা আসবেন?'

দার্শনিকটি দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে আবার ট্যালমুডের জটিল গোলকধাঁধায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন, যে জটিলতার ভেতর থেকে আজ পর্যন্ত নাকি একটি মাত্র মানুষই সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

সুন্দরী মেয়েটি স্বপ্নভরা দৃষ্টিতে তখন আবার জানলা দিয়ে বাইরের

প্রবল বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর সাদা আঙুলগুলো ওর অপূর্ব অঙ্গবাসের ঘনরঙা লোমগুলোকে নিয়ে খেলা করতে লাগলো অন্যমনে।

একদিন সেই ইহুদি দার্শনিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত এক গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যে প্রতিবেশী শহরে গিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাকে ধন্যবাদ, তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন প্রশ্নটা তার চাইতে অনেক আগেই মীমাংসিত হয়ে গেলো এবং পরদিন সকালে ফিরে আসার বদলে সেদিন সন্ধ্যা বেলাতেই তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে ফিরে এলেন—যে বন্ধু নিজেও তাঁর চাইতে কোন অংশে কম পণ্ডিত নন।

বন্ধুর বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে দার্শনিকটি পায়ে হেঁটেই নিজের বাড়িতে ফিরলেন। বাড়ির জানলায় উজ্জ্বল আলো দেখে ভারি অবাক হলেন তিনি। আরও দেখলেন, এক পদস্থ রাজকর্মচারীর ভৃত্য তাঁরই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মনের সুখে তামাকের নল দিয়ে ধূমপান করছে।

'তুমি এখানে কি করছো?' খানিকটা ঔৎসুক্য থাকলেও হৃদ্যতার সুরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'ওই ইহুদি সুন্দরীর স্বামীটি যদি হঠাৎ করে বাড়ি ফিরে আসেন, তাই আমি পাহারা দিচ্ছি।'

'সত্যি নাকি? তা বেশ। ভালো করে নজর রেখো।'

কথাটা বলে পণ্ডিতপ্রবর চলে যাবার ভান করলেন, কিন্তু পেছন দিকে বাগানের পথ দিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। প্রথম ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন, টেবিলে দুজনের মতো খাবার দেওয়া হয়েছিলো এবং একটু আগেই সেগুলো ফেলে রেখে ওঠা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী আগের মতোই যথারীতি গায়ে ফার জড়িয়ে শোবার ঘরের জানলার কাছে বসেছিলো, কিন্তু তার গালদুটি সন্দেহজনকভাবে লাল। ওর কালো চোখ দুটিতে এখন আর সেই ঘুম-ঘুম দৃষ্টি নেই,—তার বদলে যে দৃষ্টি ওর স্বামীর দিকে স্থির হলো তাতে একই সঙ্গে পরিতৃপ্তি আর বিদ্রূপের অভিব্যক্তি। সেই মুহূর্তে দার্শনিকের পায়ের সঙ্গে মেঝের ওপরে রাখা কোন একটা জিনিসের ধাক্কা লেগে এক বিচিত্র শব্দ উঠলো। তিনি সেটা তুলে নিয়ে আলোতে পরীক্ষা করে দেখলেন। বস্তুটা ছিলো একজোড়া জুতোর নাল।

'এখানে তোমার সঙ্গে কে ছিলো?' প্রশ্ন করলেন ট্যালমুডবিদ পণ্ডিত।

ইহুদি ভেনাস অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো, কোন জবাব দিলো না।

'আমি বলবো ? অশ্বারোহী সৈন্যদের দলপতি তোমার সঙ্গে ছিলো।'

'তাহলে সে এখানে নেই কেন ?' শুভ্র হাতে জ্যাকেটের লোমগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে বললো মেয়েটি।

'হায় নারী! তোমার কি মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে ?'

'আমার বোধশক্তি সম্পূর্ণ ঠিক আছে।' ওর কামনাসিক্ত রক্তিম ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, 'মুসা এসে যাতে আমাদের, মানে হতভাগা ইহুদিদের উদ্ধার করতে পারেন—সে জন্যে আমি কি অবশ্যই আমার কর্তব্যটুকু পালন করবো না ?'

ছোট্ট চেহারার মারকুইস দ্য রেনেদোঁ তখনও তার অন্ধকার সুবাসিত শোবার ঘরটিতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলো। নিচু পালঙ্কের নরম বিছানায়, পাতলা চাদরের সোহাগের মাঝখানে, একা একা নিবিড় শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিলো ও—বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া মহিলার সুখময় নিরুদ্বেগ অতলান্ত ঘুম।

ছোট্ট নীল-রঙা বৈঠকখানা থেকে ভেসে আসা চড়া স্বরের কথাবার্তায় জেগে ওঠে ও। বুঝতে পারে, ওর প্রিয় বান্ধবী ব্যারনেস দ্য গ্রাঁজেরি ওর পরিচারিকাটিকে ধমকাচ্ছে—কারণ সে ওকে মারকুইসের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয় মারকুইস, পর্দা সরিয়ে একরাশ মেঘলা চুলের আড়ালে লুকিয়ে রাখা সুন্দর মাথাটিকে বের করে আনে বাইরে।

'কি ব্যাপার, এই সাত-সকালে এসেছিস যে?' জিজ্ঞেস করে ও। 'এখনো তো নটাই বাজেনি!'

যুবতী ব্যারনেসটি ভয়ানক বিবর্ণ, বিচলিত। আর কেমন যেন একটা জ্বরাক্রান্ত ভাব। বললো, 'তোর সঙ্গে কথা আছে। আমার একটা সাংঘাতিক বিপদ হয়েছে রে!'

'আয়, ভেতরে আয়।'

ভেতরে ঢুকে দুজন দুজনকে চুমু দেয়। যুবতী মারকুইস ফের বিছানায় উঠে পড়ে। পরিচারিকাটি ঘরে আলো বাতাস ঢোকার জন্যে জানলাগুলো খুলে দিয়ে চলে যেতেই মাদাম দ্য রেনেদোঁ বলে, 'এবারে বল, কি ব্যাপার।'

মাদাম দ্য গ্রাঁজেরি কাঁদতে শুরু করে। দু চোখ বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল অশ্রুকণা, যা রমণীর রূপকে আরও বেশি করে রমণীয় করে তোলে। পাছে লাল হয়ে যায়, তাই চোখ না মুছেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে! সারা রাতে আমি একটা মিনিটও ঘুমোইনি। হাত দিয়ে ছাখ, বুকটা এখনও কেমন ঢিপঢিপ করছে!'

বান্ধবীর হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের পরিপূর্ণ বুকের ওপরে চেপে ধরে ব্যারনেস। উন্নত, পুরুষ্টু বুক—আসলে হৃদয়ের আবরণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষমানুষের সব কামনার ধন, যা তাদের বুকের গভীরে তলিয়ে দেখতে দেয় না। কিন্তু ব্যারনেসের হৃৎপিণ্ডটা সত্যিই প্রচণ্ড জোরে ওঠা-নামা করছে।

'গতকাল দিনের বেলায়, চারটে সাড়ে-চারটে নাগাদ ঘটনাটা ঘটেছিলো।' ব্যারনেস বলতে থাকে, 'সঠিকভাবে সময়টা ঠিক বলতে পারছি না। তুই তো আমার অ্যাপার্টমেন্টটা দেখেছিস। আমার সেই ছোট্ট বৈঠকখানাটার কথা তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, যেখানে বসে আমি সব সময়ে র্য্য সাঁ লাজারের দিকে তাকিয়ে থাকি। জানলার কাছে বসে লোকজনের যাতায়াত দেখা আমার একটা বিশ্রী স্বভাব। রেল স্টেশনের কাছবরাবর জায়গাটা সব সময়েই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা, ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ। তাই গতকাল জানলাটার কাছে একটা নিচু কুর্সি এনে, আমি তাতে বসে ছিলাম। জানলাটা তখন খোলা ছিলো। আমি কিন্তু কিছুই ভাবছিলাম না, শুধু নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাজা বাতাস টেনে নিচ্ছিলাম শরীরের মধ্যে। মনে করে ভাখ, কি সুন্দর ছিলো কালকের দিনটা!

'হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, উলটো দিকের জানলায় একটা মেয়ে বসে রয়েছে—লাল পোশাক পরা একটা মেয়ে। আমার পরনে তখন সেই সুন্দর বেগুনী রঙের পোশাকটা। মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই—নতুন ভাড়াটে, এক মাস হলো ওখানে এসেছে। আর এই এক মাস ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে বলে, আমিও ওর সঙ্গে আলাপ করতে যাইনি। কিন্তু তক্ষুনি বুঝে ফেললাম, মেয়েটা খারাপ। আমার মতো ও-ও ঠিক একভাবে জানলাতে বসে ছিলো বলে প্রথমটাতে ভীষণ বিরক্ত লাগলো। তারপর ক্রমশ ওকে লক্ষ্য করতে করতে বেশ মজা পেলাম। জানলার তাকে কনুই রেখে ও পুরুষমানুষদের দিকে তাকাচ্ছে, আর তারাও প্রায় সকলেই তাকাচ্ছে ওর দিকে। যে কেউই বলবে, কুকুর যেমন করে শিকারের গন্ধ পায়, লোকগুলোও যেন ঠিক তেমনি করে কি এক অদ্ভুত উপায়ে বাড়িটার কাছে এসেই ওর উপস্থিতির কথা টের পেয়ে যাচ্ছে। কারণ তখনই তারা চকিতে ওপরের দিকে তাকিয়ে মেয়েটার সঙ্গে এক পলক দৃষ্টি বিনিময় করে নিচ্ছে। চোখের ইঙ্গিতে মেয়েটা জিগেস করছে, 'আসবে নাকি?' তাদের চোখ উত্তর দিচ্ছে, 'সময় নেই,' কিংবা 'আর এক দিন', বা 'পয়সা নেই,' অথবা 'সরে যা, হতভাগী মেয়ে'!

'যদিও এটাই ওর নিয়মিত ব্যবসা, তবু ওর ওসব কাণ্ডকারখানা দেখতে যে কি মজা লাগে তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না।

'মাঝে মাঝে হঠাৎ ও জানলাটা বন্ধ করে দেয়। তখন দেখতে পাই, কোন একজন পুরুষমানুষ বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকছে। শিকারী যেমন করে কোন বোকা মাছকে বঁড়শিতে গেঁথে তোলে, তেমনি করে মেয়েটাও ওই পুরুষমানুষটাকে পাকড়াও করে। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করি, ওরা কক্ষনো দশ-বিশ

মিনিটের বেশি ভেতরে থাকে না। শেষটাতে ওই মাকড়সাটা আমাকেও মোহাচ্ছন্ন করে তুললো—ওই কুৎসিত, নোংরা মেয়েটা! নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কি করে ও এত দ্রুত এত সুন্দর আর সম্পূর্ণভাবে নিজের কথা অন্তদের বুঝিয়ে দেয়? তবে কি ও তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত জানায়? হাতছানি দিয়ে ডাক? ছোট্ট দুরবীনটা দিয়ে আমি ওর কায়দাগুলো লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, বাঃ! ব্যাপারটা খুবই সহজ। প্রথমে কটাক্ষ, তারপর মুচকি হাসি, তারপর মাথা দুলিয়ে সামান্ত ইঙ্গিত—যার অর্থ 'ওপরে আসছো?' কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই এত সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট আর সতর্ক ভঙ্গিমায় যে ওতে সফল হতে গেলে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। ভাবলাম, আমিও কি ওর মতো অমন স্পষ্ট অথচ সুন্দরভাবে, সামান্ত ইঙ্গিতে, নিচ থেকে ওপরের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করতে পারবো? ওর ভঙ্গিমাটা কিন্তু সত্যিই ভারি সুন্দর!

'আয়নার কাছে গিয়ে আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। কি বলবো ভাই—দেখলাম ওই মেয়েটার চাইতেও আমি কাজটা বেশি ভালোভাবে করতে পারি, অনেক বেশি ভালোভাবে। আনন্দে উছলে উঠলাম, এক ছুটে ফিরে গেলাম জানলার কাছে আমার জায়গাটাতে।

'বেচারী মেয়েটা তখন আর কাউকেই পাকড়াও করতে পারছিলো না। ওর তখন ভাগ্য বিরূপ। এ পথে রুটির যোগাড় করা সত্যিই ভারি সাংঘাতিক। অবিশ্যি মাঝে-মধ্যে আনন্দদায়কও বটে। কারণ ওই ধরনের স্ফূর্তি-লোটা মানুষ, যাদের রাস্তায় দেখা যায়, তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার সত্যিই ভালো।

'তার পর থেকে লোকগুলো আমার বাড়ির কাছ দিয়েই যাতায়াত শুরু করলো, ওর দিক দিয়ে আর কেউ যায় না। সূর্য তখন দিক পালটেছে। লোকগুলো আসছে একের পরে এক— ছেলে, বুড়ো, ফর্সা, কালো—সবাই। একটা লোককে দেখলাম, ভারি সুন্দর। সত্যি বলছি ভাই, আমার স্বামী বা তোর প্রাক্তন স্বামীর চাইতে অনেক বেশি সুন্দর। এদের মধ্যেই একজনকে বেছে নিয়ে পরীক্ষা চালানো যায়।

'নিজের মনেই ভাবলাম, আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। কিন্তু আমি যদি ওই লোকগুলোকে ইঙ্গিত জানাই, তবে ওরা কি তার অর্থ বুঝতে পারবে? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত জানানোর এক উন্মাদ বাসনা আমাকে সম্পূর্ণ দখল করে ফেললো। বাসনা...কি দুরন্ত বাসনা! এ ধরনের অস্থির বাসনার কাছে কেউই সংযম রাখতে পারে না।

'তুই হয়তো ভাবছিস, কি বোকার মতো কাণ্ড—তাই না? ছাখ ভাই, আমার বিশ্বাস আমাদের, মানে মেয়েদের আত্মাগুলো আসলে বাঁদরের আত্মা। আমি শুনেছি (একজন ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন), বাঁদরের মস্তিষ্ক নাকি অনেকটাই আমাদের মতো। কাউকে না কাউকে আমরা নকল করবোই। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস যখন আমরা স্বামীকে ভালোবাসি, তখন তাঁকে নকল করি। তারপর নকল করি প্রেমিকদের, বান্ধবীদের। আমরা তাদের মতোই চিন্তা করি, তাদের ঢঙে কথাবার্তা বলি, তাদের অঙ্গভঙ্গি নিজেদের করে নি। সত্যি, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই বোকামো!

'কিন্তু যাক সে কথা। আমার ব্যাপার হচ্ছে, যখন আমার কোন কিছু করতে ভীষণ লোভ হয়, তখন আমি সব সময়েই সেটা করে থাকি। তাই মনে মনে বললাম, শুধু একবার—একটি মাত্র মানুষের ওপরে আমি চেষ্টা চালিয়ে দেখবো, প্রতিক্রিয়াটা কেমন হয়। তাতে আমার আর কি হতে পারে? কিচ্ছু না। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসির বিনিময় করবো—ব্যাস। তারপর পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করে বসবো, তাহলেই হলো!

'অতএব লোক বাছাই করতে শুরু করলাম। স্বভাবতই আমি চাইছিলাম কোন সুন্দর সুপুরুষকে। হঠাৎ দেখলাম, একটি দীর্ঘকায়-সুদর্শন নিঃসঙ্গ যুবক রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। তুই তো জানিস, সুন্দর পুরুষমানুষদের আমার বরবরই পছন্দ। তাই কাছাকাছি হতেই আমি তার দিকে তাকালাম, সেও তাকালো আমার দিকে। আমি হাসলাম, সেও হাসলো। চকিতে আমি ইঙ্গিত জানালাম —হ্যাঁ, অতি সূক্ষ্মভাবে। মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ,' বললো সে। তারপরেই কি বলবো ভাই, বাড়ির বিশাল দরজার দিকে এগিয়ে এলো লোকটা।

'আমার মনের ভেতরটায় তখন যে কি হচ্ছিলো, তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না! মনে হলো, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাবো। ওঃ সে কি আতঙ্ক তখন! ভেবে ছাখ, লোকটা চাকরবাকরগুলোর সঙ্গে কথা বলবে। কথা বলবে যোশেফের সঙ্গে, যে কিনা আমার স্বামীর পরম বিশ্বাসভাজন! যোশেফ নিশ্চয়ই ভাববে, ভদ্রলোক আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত।

'এ অবস্থায় আমি কি করতে পারতাম, বল্? আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লোকটা দরজার ঘন্টি বাজাবে। তখন কি করবো? ভাবলাম ছুটে গিয়ে বলবো, সে ভুল করেছে—মিনতি করবো, যাতে সে চলে যায়। সে নিশ্চয়ই একটা অসহায় মেয়েকে করুণা করবে।

'ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই লোকটা ঘন্টি বাজাতে যাচ্ছিলো। বোকার মতো বিড়বিড় করে বললাম, 'আপনি চলে যান মঁ্যসিয়··· আপনি ভুল করেছেন—বড় সাংঘাতিক ভুল। আমি আপনাকে আমার একজন পরিচিত বন্ধু বলে ভেবেছিলাম, আপনি অনেকটা তার মতোই দেখতে। আমাকে দয়া করুন, মঁ্যসিয়' !

'জানিস ভাই, লোকটা তাই শুনে হাসতে শুরু করলো। বললো, 'তুমি কি বলবে, তা সবই আমার জানা। বলবে, তুমি বিবাহিতা—কাজেই তুমি বিশের বদলে চল্লিশ ফ্রাঁ চাও। এই তো ? বেশ, তুমি তাই পাবে। নাও, এবারে ভেতরে যাবার পথটা দেখাও'।

'আমাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় লোকটা। আমি তখন ভয়ে মরছি। সে আমাকে জাপটে ধরে চুমু খেলো, তারপর এক হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বৈঠকখানার দিকে নিয়ে চললো। বৈঠকখানার দরজাটা তখন খোলাই ছিলো। ঘরে ঢুকে নিলামদারের মতো সমস্ত জিনিসপত্রের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো লোকটা। বললো, 'আরে সাবাস ! তোমার ঘরের সবকিছুই তো দেখছি দারুণ সুন্দর ! ইদানীং নিশ্চয়ই তোমার সময় ভালো যাচ্ছে না, তাই জানলার ব্যবসায় নেমেছো' !

'আমি তখন রীতিমতো কাকুতি-মিনতি করতে শুরু করলাম, 'দোহাই মঁ্যসিয়, আপনি দয়া করে চলে যান ; আমার স্বামীর আসার সময় হয়ে গেছে, এক্ষুনি তিনি এসে পড়বেন। আমি দিব্যি করে বলছি, আপনি ভুল করেছেন। আমি দেহ নিয়ে ব্যবসা করি না, দয়া করে আপনি আমাকে রেহাই দিন।' কিন্তু লোকটা নির্বিকার ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'ওসব বাজে কথা ছাড়ো সুন্দরী—এসো। তোমার স্বামী এসে পড়লে আমি তাকে পাঁচটা ফ্রাঁ দিয়ে রাস্তার ওপাশের কাফেতে একটা পানীয় খেতে পাঠিয়ে দেবো।' তারপর তাপচুল্লির ওপরের তাকে রাওলের ছবিটা দেখে জিগেস করলো, 'এটা কি তোমার স্বামীর ছবি নাকি' ?

'হ্যাঁ, ওঁর ছবি'।

'বিলকুল বোকা বোকা চেহারা। আর এটি কে ? তোমার কোন বান্ধবী বুঝি' ?

'বুঝলি, ওই ছবিটা ছিলো তোর—সেই বল নাচের পোশাক পরা ছবিটা। তখন কি বলছি না বলছি, আমি তার কিছুই জানি না। কোন রকমে বললাম, 'হ্যাঁ, আমার এক বান্ধবীর ছবি'।

'ভারি খুবসুরৎ! আমার সঙ্গে কিন্তু অবশ্যই আলাপ করিয়ে দেবে'।

'ঠিক তক্ষুনি ঘড়িতে পাঁচটার ঘণ্টা বাজলো। রাওল্ প্রতিদিন ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়িতে ফেরে। এ লোকটা বিদেয় হবার আগেই যদি সে হঠাৎ এসে হাজির হয়, তাহলে আমার কি হবে—ভেবে ছাখ একবার। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেলো। ভাবলাম···ভাবলাম সব চাইতে ভালো হয়, যদি লোকটার হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পেয়ে যাই—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কাজটা তাড়াতাড়ি মিটে গেলেই তো লোকটা বিদেয় হবে, তাই মরিয়া হয়ে নিজের হাতেই দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর···তারপর বুঝতেই পারছিস, কি হলো!'

মারকুইস দ্য রেনেদোঁ বালিশে মাথা গুঁজে পাগলের মতো হাসতে শুরু করে। হাসির দমকে সমস্ত বিছানাটাই কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে বারবার। তারপর একটু শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা তো সুপুরুষই ছিলো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তা সত্ত্বেও তুই অভিযোগ করছিস?'

'কিন্তু—কিন্তু তুই বুঝতে পারছিস না···সে বলেছে আসছে কাল সে আবার আসবে—ওই একই সময়ে। আমার যে কি ভয় লাগছে! লোকটা যে কি সাংঘাতিক জেদী আর নাছোড়বান্দা, তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। এখন আমি কি করি, বল্ তো?'

বিছানায় উঠে বসে একটু চিন্তা করে নেয় মারকুইস। তারপর দুম করে বলে বসে, 'পুলিসে ধরিয়ে দে।'

ব্যারনেসকে হতবুদ্ধি দেখালো, 'কি বলছিস তুই? কি ভাবছিস বল্ তো? ধরিয়ে দেবো? কিন্তু কোন্ অভিযোগে?'

'খুবই সহজ ব্যাপার। পুলিস কমিশনারের কাছে গিয়ে বল্, প্রায় তিন মাস ধরে একটা লোক তোর পিছু নিয়েছে এবং তার এতদূর আস্পর্ধা যে গতকাল সে তোর ঘরের মধ্যে পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিলো। তা ছাড়া আসছে কাল ফের আসবে বলে শাসিয়ে গেছে। কাজেই তুই আইনের আশ্রয় দাবি করছিস। তাহলেই দেখবি লোকটাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে ওরা তোকে দুজন পুলিস অফিসার দিয়ে দেবে।'

'কিন্তু ধর্, লোকটা যদি সব কিছু বলে দেয়···'

'ধ্যাৎ বোকা! তুই যদি বুদ্ধি করে কমিশনারকে তোর গল্পটা বলতে পারিস, তাহলে ওরা লোকটার কথা মোটেই বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করবে তোর কথা, কারণ তুই উঁচু সমাজের একজন নির্মল-চরিত্র মহিলা।'

'না বাবা! আমার ওসব করার সাহস হবে না।'

'সাহস করতেই হবে সখী, নয়তো পুরো ডুবে যাবি।'

'কিন্তু ভেবে ছাখ, গ্রেপ্তার হলে সে আমাকে বিদ্রূপ করবে—অপমান করবে!'

'খুব ভালো কথা। তাহলে তো তুই সাক্ষী পেয়ে যাবি, লোকটারও শাস্তি হবে।'

'কি শাস্তি?'

'ক্ষতিপূরণ দেবার শাস্তি। এসব ক্ষেত্রে একটু নির্দয় হতেই হবে।'

'ক্ষতিপূরণের কথায় একটা জিনিস মনে পড়ে গেলো। লোকটা যাবার সময় তাপচুল্লির তাকে ছুটো বিশ ফ্রাঁর মুদ্রা রেখে গিয়েছিলো। ওগুলো নিয়ে আমি ভীষণ চিন্তায় পড়েছি।'

'মোটে ছুটো বিশ ফ্রাঁ?'

'হ্যাঁ।'

'তার বেশি কিছুই না?'

'না।'

'খুবই কম! আমি কিন্তু হলে ভীষণ অপমানিত বোধ করতাম। যাক, ভালোই তো।'

'ভালো! ও টাকা দিয়ে আমি কি করবো?'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলো মারকুইস। তারপর গম্ভীর গলায় বললো, 'ওই দিয়ে…ওই দিয়ে তোর স্বামীকে একটা ছোট্ট উপহার এনে দিবি। একমাত্র সেটাই ভালো হবে!'

নিষিদ্ধ ফল

বিয়ের আগে ওদের প্রেম ছিলো নক্ষত্রের আলোর মতো পবিত্র। সাগরতীরে ওদের প্রথম দেখা। সমুদ্রের পটভূমিকায় তার পাশ কাটিয়ে যাওয়া এই গোলাপের মতো মিষ্টি মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো সে। মেয়েটির হাতে রঙিন ছাতা, পরনে ঝলমলে পোশাক। অনন্ত আকাশের নিচে নীলিম তরঙ্গের ভাঙাগড়ার পাশাপাশি মেয়েটির সোনার বরণ চুল আর অপরূপ দেহলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো সে। মনোরম লোনা বাতাস আর রোদে-ঝলমল ঢেউ-দোল সাগর সৈকতে মেয়েটি তার হৃদয়-মনে, শিরায়-উপশিরায় এক অজানা এবং তীব্র বাসনার আবেগ জাগিয়ে তুলে তাকে দুর্বল করে তুলেছিলো।

মেয়েটিও তাকে ভালবেসেছিলো—কারণ সে ওর প্রতি মনোযোগী, বয়সে তরুণ, যথেষ্ট বিত্তশালী, ব্যবহার শান্ত এবং ভদ্রোচিত। ভালবেসেছিলো, কারণ যারা মেয়েদের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলে, মেয়েদের পক্ষে সেই সব তরুণ পুরুষদের ভালবাসাই স্বাভাবিক।

তারপর তিনটি মাস ওরা পাশাপাশি কাটিয়ে দিলো চোখে চোখ আর হাতে হাত রেখে। নতুন দিনের সতেজ প্রভাতে স্নানের আগে ওরা যে ভাষায় শুভেচ্ছা বিনিময় করতো আর প্রশান্ত রাত্রির নিবিড় কবোষ্ণতায় অজস্র তারার নিচে উন্মুক্ত বালুকাবেলায় মৃদু থেকে মৃদুতর গুঞ্জরণে যে বিদায়বাণী শোনাতো পরস্পরকে—তার সবকিছুতেই ছিলো চুম্বনের আস্বাদ, যদিও কখনও তাদের অধরে অধর মিলিত হয়নি। নিদ্রায় ওরা একে অন্যকে স্বপ্ন দেখতো, জাগরণে ভাবতো দুজন দুজনের কথা। মুখে কিছু না বললেও, ওরা দুজন দুজনকে চাইতো সমস্ত দেহ-মন দিয়ে।

বিয়ের পরে ওদের নিরুত্তাপ ভালবাসা ভরে উঠলো বাঁধ ভাঙা কামনার অগাধ জোয়ারে। প্রথমটাতে চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়সুখের এক অক্লান্ত উদ্দামতা এবং ক্রমে তার থেকে জন্ম নিলো এক নিটোল প্রেমের কাব্যিক অনুভূতি। কিন্তু সবার ওপরে রইলো সূক্ষ্ম রসময় স্থূল দেহবিলাস। দৈহিক মিলনের নিত্য নতুন পথ আবিষ্কারে ওদের দুজনেরই অসীম আগ্রহ—সে সমস্ত পথ শোভন এবং অশোভন দুই-ই। ওদের দৃষ্টিতেও ফুটে ওঠে অসংযমের ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গিতে জেগে ওঠে গত রাত্রির আগ্রহী ঘনিষ্ঠতার অন্তরঙ্গ স্মৃতি।

কিন্তু ক্রমশ নিজেদের অজান্তেই ওরা একে অপরের বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠতে থাকে। ওরা পরস্পরকে ভালবাসতো সত্যি, কিন্তু এখন দুজনের আর দুজনের কাছে প্রকাশ করার মতো নতুন কোন রহস্য নেই। যা ওরা বহুবার করেছে তাছাড়া নতুন করে আর কিছু করার নেই। পরস্পরের কাছ থেকে শেখারও নেই আর কিছু। এমন কি নতুন কোন প্রেমের কথাও নেই, নেই কোন ইঙ্গিত ইশারা —যা বহুব্যবহৃত, বহুপরিচিত কথার চাইতে অনেক বেশি অভিব্যক্তিময়।

ক্ষীণ হয়ে আসা প্রেমের প্রদীপকে উস্কে তোলার জন্যে ওরা অন্তহীন প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো। প্রতিদিন আবিষ্কার করতে লাগলো সরল, জটিল, নানা রকমের ছলাকলা। কিন্তু সেই প্রথম দিনগুলোর অশান্ত আবেগ নতুন করে হৃদয়ে জাগিয়ে তোলার, শিরায় শিরায় বিয়ের মাসের সেই উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে দেবার—সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। মাঝেমধ্যে ঘুমিয়ে-পড়া কামনা-বাসনাকে চাবুক মেরে জাগিয়ে তুলে ওরা ঘণ্টাখানেক কৃত্রিম উত্তেজনায় বুঁদ হয়ে থাকতো। কিন্তু পরক্ষণেই আসতো অবসাদ আর বিতৃষ্ণার সীমাহীন গ্লানি। বৈচিত্র্যের সন্ধানে ওরা চাঁদনি রাতে গাছগাছালির নিচে হেঁটে বেড়িয়েছে, দেখেছে কুহেলি স্নাত পাহাড়ের সুরভিত কাব্য-সুষমা, কখনও বা সর্বজনীন উৎসবের সামিল হয়ে সময় কাটিয়েছে খানিকটা হৈ-হট্টগোল করে

তারপর একদিন সকালে আঁরিয়েত পলকে বললো, 'তুমি একদিন রাত্তিরবেলা আমাকে হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে যাবে?'

'বেশ তো, তা যাওয়া যাবে।'

'খুব নামজাদা কোন হোটেলে যাবে?'

'যাব।'

একরাশ প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকায় পল। পরিষ্কার বুঝতে পারে, ওর মনে কোন অভিসন্ধি রয়েছে, যা ও মুখ ফুটে বলেনি।

আঁরিয়েত বলতে থাকে, 'কি রকম হোটেল বুঝলে তো? মানে—ইয়ে—কি করে যে বোঝাই···মানে একটা দারুণ জমকালো হোটেল—যেখানে সবাই দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে—তেমনি কোন হোটেলে যাবে?'

'বুঝেছি,' পল হাসলো। 'কোন বড়সড় কাফের কোন আলাদা ঘরে?'

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু একটা বড়সড় কাফে—যেখানে তুমি পরিচিত, যেখানে তুমি এর আগেও দুপুরে—না, রাত্রে খানাপিনা করেছো···মানে, আমি বলতে চাইছি কি যে···নাঃ, সাহস হচ্ছে না।'

'বলো না, লক্ষ্মীটি! আমাদের দুজনের মধ্যে আবার সঙ্কোচ কিসের? অন্তরের মতো আমাদের মধ্যে তো কোন লুকোচুরি নেই!'

'নাঃ, ভরসা পাচ্ছি না।'

'ওফ্, অত নিরীহ গোবেচারী হয়ে থেকো না তো! বলো—'

'বেশ, তবে বলছি। আমার ইচ্ছে, তুমি আমাকে তোমার···তোমার প্রেমিকা হিসেবে ওখানে নিয়ে যাবে। ওখানকার বেয়ারাগুলো তো জানে না যে তুমি বিবাহিত, তাই ওরা হয়তো আমাকে তোমার প্রেমিকা বলেই ধরে নেবে। আর তুমিও, তোমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এমন একটা জায়গায়, এক ঘণ্টার জন্যে আমাকে তোমার প্রেমিকা বলে মনে করবে। ব্যাস, আর কিছু নয়। আমিও মনে করবো, আমি তোমার প্রেমিকা। আসলে···আসলে আমার একটা ভীষণ অন্যায় করতে ইচ্ছে করছে—ইচ্ছে করছে তোমাকে প্রতারণা করি—মানে তোমার সঙ্গেই···ওখানে! জানি, ইচ্ছেটা খুবই খারাপ। কিন্তু···না না, আমাকে লজ্জা দিও না—বুঝতে পারছি আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছি! আমি যে রাত্তিরবেলা আমাকে নিয়ে বাইরে খাওয়াবার জন্যে তোমাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলেছি, সেজন্যে নয়—কিন্তু ওই সব ছোট ছোট নিরালা ঘরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় কত মানুষ ভালবাসাবাসি করে—সেখানে গিয়ে ওসব···ইস্, ভীষণ খারাপ! এই, আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে না বলছি! দেখছো না, আমি পিয়নি ফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছি!'

ভারি মজা পেয়ে হেসে উঠলো পল, 'বহুত আচ্ছা! আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার চেনা তেমনি একটা মজাদার জায়গায় আমরা দুজনে মিলে যাবো।'

সাতটা নাগাদ ব্যুলেভার ওপরে একটা অভিজাত কাফের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলো ওরা। পলের মুখে বিজয়ী বীরের স্মিত হাসি। আঁরিয়েত খানিকটা সঙ্কুচিত, কিন্তু মুখে খুশির আভা। ছোট্ট একটা ঘরে এসে ঢুকলো ওরা। ঘরে আসবাব বলতে চারটে আরাম-কুর্সি আর লাল মখমলে মোড়া একটা বিশাল সোফা। কালো পোশাক পরা তত্ত্বাবধায়ক ভেতরে এসে খাবারের তালিকাটা এগিয়ে দিলো ওদের দিকে। পল সেটা এগিয়ে দিলো স্ত্রীর দিকে, 'কি খাবে, বলো।'

'আমি কিছু জানি না। এখানে ভালো কি পাওয়া যায়?'

ওভারকোট খুলতে খুলতে তালিকাটায় চোখ বুলিয়ে নেয় পল। তারপর কোটটা পরিচারকের হাতে দিয়ে বলে, 'এগুলো নিয়ে এসো—বিস্ক মুরুয়া, মুরগির

ভেজিস, খরগোশের পাঁজরা, অ্যামেরিকান কেতায় রাঁধা হাঁস, সবজির স্যালাড আর মিষ্টি। আর শোনো, আমরা কিন্তু শ্যাম্পেন খাবো।'

মুচকি হেসে তরুণী আঁরিয়েতকে এক পলক দেখে নিলো তত্ত্বাবধায়কটি। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ধরনের শ্যাম্পেন আনবো, মিঃ পল? কড়া, না মোলায়েম?'

'খুব কড়া।'

লোকটা ওর স্বামীর নাম জানে দেখে খুশি হলো আঁরিয়েত। তারপর সোফার ওপরে পাশাপাশি বসে খেতে শুরু করলো দুজনে।

দশটা মোমবাতির আলোয় ঘরখানা আলোকিত। একধারে বিশাল একখানা আয়নার বুকে হাজারো নামের এক অবিনশ্বর কলঙ্কিত স্মৃতি। তার স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ বুকে মোমের আলোয় যেন একটা বিশাল মাকড়সার জালের সৃষ্টি হয়েছে।

নিজেকে উদ্দীপ্ত করে তোলার বাসনায় গ্লাসের পর গ্লাস সুরা পান করছিলো আঁরিয়েত, যদিও প্রথম থেকেই ওর গা বমি বমি করছিলো। ওদিকে অতীত স্মৃতির পীড়নে পল যখন রীতিমতো উত্তেজিত, বারবার সে তার স্ত্রীর হাতে চুমু দিয়ে চলেছে। আঁরিয়েতের দু চোখে আগুন। রহস্যময় এই পরিবেশে এক বিচিত্র আবেগ অনুভব করছিলো ও। নিজেকে খানিকটা অশুচি বলে মনে হলেও, এক নিদারুণ উত্তেজনায় ভীষণ খুশি খুশি লাগছিলো ওর। এ সব দৃশ্য দেখতে এবং পরমুহূর্তেই তা ভুলে যেতে অভ্যস্ত দুজন পরিচারক ওদের তদারক করছিলো। নেহাত প্রয়োজন হলেই ভেতরে ঢুকেছিলো তারা, বাড়াবাড়ি হলেই বেরিয়ে আসছিলো চট করে। ওদের যাওয়া-আসা—দুই-ই ভারি দ্রুত আর নিঃশব্দ।

খাওয়ার মাঝপথেই আঁরিয়েত একেবারে বেসামাল মাতাল। খুশিতে মাতোয়ারা পল সবটুকু শক্তি দিয়ে বারবার ওর জানু চেপে ধরছিলো। আঁরিয়েতের গাল দুটিতে আবিরের রঙ। ঢুলু ঢুলু চোখ দুটিতে উৎসাহের ছোঁয়া। লাজলজ্জা খুইয়ে এন্তার বকবক করছিলো আঁরিয়েত।

'ওঃ পল, বলোই না আমাকে। আমি সব কিছু জানতে চাই।'

'কি বলতে চাইছো তুমি, সোনা?'

'নাঃ, বলতে সাহস পাচ্ছি না।'

'কিন্তু তুমি সর্বদা অবশ্যই...'

'আচ্ছা, তোমার অনেক প্রেমিকা ছিলো? মানে...আমার আগে?'

পল খানিকটা মুশকিলে পড়ে গেলো। সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। বুঝে উঠতে পারলো না তার সৌভাগ্যের কথা আঁরিয়েতের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা উচিত, না কি গর্ব করে বলা উচিত।

আঁরিয়েত তখনও বলে চলেছে, 'ওঃ, বলো না লক্ষীটি! আমি মিনতি করছি—তোমার কি অনেকেই ছিলো?'

'ছিলো, কয়েকজন।'

'ক'জন?'

'জানি না। কে আর অত মনে রাখে?'

'তার মানে, গুনেও বলতে পারছো না?'

'নাঃ, পারছি না।'

'আচ্ছা! তার মানে অগুন্তি ছিলো?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তবু—আন্দাজ মোটামুটি ক'জন…'

'সত্যি বলছি সোনা, আমি ঠিক জানি না। এক একটা বছরে অনেককেই পেয়েছি, আবার কখনও মোটে কয়েকজন।'

'তাহলেও—বছরে মোটামুটি ক'জন?'

'কখনও বিশ-ত্রিশ জন, কখনও বা মোটে চার-পাঁচজন।'

'আরে ব্বাস! তার মানে মোট একশো মেয়েরও বেশি!'

'হ্যাঁ, প্রায় তার কাছাকাছি।'

'ইস, কি বিচ্ছিরি ব্যাপার!'

'বিচ্ছিরি কেন?'

'ওসব মেয়েদের কথা ভাবলেই বিচ্ছিরি লাগে। যত সমস্ত বেহায়া মেয়েমানুষ…সকলের সঙ্গেই ওই এক জিনিস—মাগো! কি ঘেন্না—একশোরও বেশি মেয়ে!'

ব্যাপারটা আঁরিয়েত ঘৃণার চোখে দেখছে বলে পল খানিকটা আহত হলো। মেয়েরা নেহাতই বোকার মতো কথা বলছে বলে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে পুরুষমানুষ যেমন বিজ্ঞের মতো কথা বলে, ঠিক তেমনি করে বললো, 'ভারি অদ্ভুত তো! একশো মেয়েকে পাওয়া যদি বিশ্রী ব্যাপার হয়, তবে একটা মেয়ের ক্ষেত্রেও তো ঠিক তাই!'

'নাঃ, মোটেই তা নয়।'

'নয়, কেন?'

'কারণ প্রেম শুধু একজনের সঙ্গেই হয়। আর একশোজনের সঙ্গে যা হয় তার নাম নোংরামো, ব্যভিচার। বুঝে পাই না, মানুষ যে কি করে ওই সমস্ত নোংরা মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করে...'

'না না, ওরা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।'

'ও সমস্ত ব্যবসা চালিয়ে কেউই পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না।'

'ঠিক তার উলটো। ওদের ব্যবসার খাতিরেই ওরা পরিচ্ছন্ন থাকে।'

'ছ্যাঃ! নিত্যি নতুন পুরুষ নিয়ে রাত কাটানো...কি ঘেন্না!'

'এই গ্লাসে করে মদ খাওয়ার চাইতে সেটা কিন্তু বেশি ঘেন্নার নয়। কারণ আজ সকালেই কে এই গ্লাসে চুমুক দিয়েছিলো তা আমি জানি না। আর এটা যে খুব একটা ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হয়নি, সে বিষয়েও তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'আরে, শান্ত হও! তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো।'

'তাহলে আমার প্রেমিকা ছিলো কিনা—সে কথা জিগেস করছো কেন?'

'তবে বলো, তোমার ওই শতেক প্রেমিকা—তারা সবাই কি সেই ধরনের মেয়ে?'

'না না, তা কেন—'

'তা হলে?'

'কেউ অভিনেত্রী, কেউ ছোটখাটো চাকুরে, আর কেউ বা গেরস্থ ঘরের মেয়ে।'

'তাদের মধ্যে গেরস্থ ঘরের কটি মেয়ে ছিলো?'

'ছজন।'

'মোটে ছজন?'

'হ্যাঁ।'

'তারা রূপসী ছিলো?'

'অবশ্যই।'

'বাজারের মেয়েদের চাইতেও রূপসী?'

'না।'

'তুমি কাদের পছন্দ করতে? বাজারের মেয়েদের—না সাধারণ মেয়েদের?'

'বাজারের মেয়েদের।'

'ইস্, কি জঘন্য! কেন?'

'কারণ অপেশাদারী ছলাকলায় আমার খুব একটা আগ্রহ নেই।'

'কি সাংঘাতিক! তুমি একটা জঘন্য—বুঝেছো? আচ্ছা, ওই নিত্যি নতুন মেয়েদের সঙ্গ, একজনকে ছেড়ে আর একজন—এতে কি বেশি মজা লাগে?'

'হ্যাঁ, খানিকটা তাই।'

'খু-উ-ব মজা?'

'খুব।'

'কিন্তু অত মজার কি আছে? ওরা একজন দেখতে আর একজনের মতো নয়—তাই কি?'

'না, এক রকম নয়।'

'তার মানে মেয়েদের মধ্যে কোন মিলই নেই?'

'মোটেই না।'

'কোন কিছুতেই না?'

'একেবারেই না।'

'আশ্চর্য! কিসে তাদের পার্থক্য?'

'সব কিছুতেই।'

'দেহে?'

'হ্যাঁ, দেহতেও।'

'সমস্ত শরীরে?'

'হ্যাঁ, সর্বাঙ্গে।'

'আর কিসে?'

'কেন—কথা বলার ঢঙে, জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে, চুমু খাবার পদ্ধতিতে—সমস্ত কিছুতে।'

'এই পরিবর্তনগুলোই বুঝি দারুণ মজার?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আচ্ছা, পুরুষমানুষরাও কি সকলে আলাদা?'

'তা আমি জানি না।'

'জানো না?'

'না।'

'পুরুষের মধ্যেও নিদারুণ পার্থক্য আছে।'

'হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসটা হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে বসে থাকে আঁরিয়েত। তারপর এক চুমুকে পূর্ণ গ্লাসটা শূন্য করে নামিয়ে রাখে টেবিলের ওপরে। পরক্ষণেই দু হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখের কাছে মুখ এনে অস্ফুটে বলে, 'প্রিয় আমার! কি যে ভালবাসি তোমাকে!'

নিবিড় আশ্লেষে ওকে জড়িয়ে ধরে পল।

একটা পরিচারক ঘরে ঢুকতে গিয়েও দরজা বন্ধ করে পেছিয়ে এলো। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তার কাজকর্ম বন্ধ রইলো।

গম্ভীর মুখে, সংযত ভঙ্গিমায় তত্ত্বাবধায়ক যখন ফের মিষ্টির জন্যে ফল নিয়ে এসে হাজির হলো, তখন আঁরিয়েতের আঙুলের ভাঁজে আর একটি পূর্ণ পানপাত্র। যেন কি এক অজানা স্বপ্ন দেখার জন্যে স্বচ্ছ হলদেটে পানীয়ের তলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। আর চিন্তাভরা স্বরে অস্ফুটে বলছে, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা অবশ্যই খুব মজার!'

দুই আসামী, সেজারে ইসিদোর ক্রমে এবং প্রসপার নেপেলিয় কর্ন্যু—দুজনেই সেনের নিম্ন আদালতে হাজির। অভিযোগ, প্রথমোক্ত আসামী ক্রমে'র ধর্মপত্নীকে জলে ডুবিয়ে খুন করার চেষ্টা।

অভিযুক্ত দুজনেই কৃষক। আসামীর কাঠগড়ায় পাশাপাশি বসে ছিলো ওরা। প্রথম জন বেঁটেখাটো, শক্তসমর্থ চেহারা, খাটো মাপের হাত পা, মাথাটা গোল। ব্রণকণ্টকিত লাল মুখখানা একই রকমের গোলগাল খাটো শরীরটার ওপরে যেন সোজা বসানো—আপাতদৃষ্টিতে ঘাড় নেই বলেই মনে হয়। পেশা শূকর প্রজনন ও পালন, নিবাস ক্রিকেতোঁ জেলার কাপেভিল গ্রাম।

কর্ন্যু'র চেহারা পাতলা ছিপছিপে, উচ্চতা মাঝারি, হাতদুটো শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন রকমের লম্বা, মুখ ভাঙাচোরা, চোখ ট্যারা। তার লম্বা ঝুলের কামিজটা হাঁটু অব্দি নেমে এসেছে। মাথায় পাতলা হয়ে আসা হলদে চুলগুলো খুলির সঙ্গে লেপটানো। সব মিলিয়ে যেন একটা শুকনো, নোংরা, ভয়চকিত অস্তিত্ব। লোকে তাকে নাম দিয়েছিলো, 'পুরুতঠাকুর'। কারণ গির্জার স্তোত্রগান-গুলো, এমন কি হারমোনিয়ামের আওয়াজটা পর্যন্ত সে নিখুঁতভাবে নকল করে শোনাতে পারতো। একটা পানশালা চালাতো কর্ন্যু এবং তার ওই বিশেষ প্রতিভা অনেক খদ্দেরকেই সেখানে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতো, যারা গির্জার উপাসনার চাইতে কর্ন্যু'র উপাসনা সভাই পছন্দ করতো বেশি।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় বসে থাকা মাদাম ক্রমে একটি শুকনো চেহারার চাষী বৌ। তার ঘুম-ঘুম দৃষ্টি একেবারে শান্ত, স্থির। হাত দুটি হাঁটুর ওপরে আড়া-আড়িভাবে রাখা। অপলক চোখ দুটিতে নির্বোধের অভিব্যক্তি।

হাকিম তাঁর জেরা চালিয়ে যাচ্ছেন, 'তাহলে মাদাম ক্রমে, ওরা তোমার বাড়িতে ঢুকে তোমাকে একটা জলভর্তি পিপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো—তাই তো? ঘটনাটা আমাদের বিস্তারিতভাবে বলো। উঠে দাঁড়াও।'

মাদাম ক্রমে উঠে দাঁড়ায়। সাদা টুপিতে ঢাকা ওর মাথাটা দেখে মনে হয়, মহিলা একেবারে মাস্তুলের মতো লম্বা। টেনে টেনে সে তার কাহিনী বলতে থাকে, 'আমি তখন সীমের খোসা ছাড়াচ্ছিলুম। ওরা ভেতরে আসতেই ভাবলুম, কি মতলব ওদের? ওরা ঠিক ওদের মধ্যে নেই, মনে নিঘঘাৎ কোন কুমতলব।

চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে ঠিক এমনি করে তাকালো ওরা—বিশেষ করে কর্মু টা, কারণ ওটা ট্যারা। ওদের দুজনকে একস্তরে দেখা আমার মোটে পছন্দ নয়, কারণ একসঙ্গে হলে দুটোর কোনটাই কোন কাজে লাগে না। জিগেস করলুম, 'আমার সঙ্গে তোমাদের কি দরকার' ? ওরা কোন জবাব দিলে না। আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো…'

আসামী ক্রুমেঁ তড়িঘড়ি ওর এজাহারে বাধা দিয়ে বললো, 'আমি তখন বেহেড মাতাল।'

সঙ্গে সঙ্গে কর্মু তার দুষ্কর্মের সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে গলায় অর্গ্যানের মতো ভারি আওয়াজ তুললো, 'বলো, আমরা দুজনেই মদে চুর হয়ে ছিলুম—সেটাই সত্যি কথা বলা হবে।'

হাকিম ধমকে উঠলেন, 'তার মানে বলতে চাও যে তোমরা দুজনেই মাতাল ছিলে ?'

ক্রুমেঁ বললো, 'আমি ছিলুম, সেটা ঠিক।'

'যে কেউই মাতাল হতে পারে,' কর্মু বললো।

হাকিম মাদাম ক্রুমেঁর দিকে তাকালেন, 'তুমি বলতে থাকো।'

'হ্যাঁ, তখন ক্রুমেঁ আমাকে বললো, 'পাঁচটা ফ্রাঁ রোজগার করতে চাও' ? আমি দেখলুম পাঁচটা ফ্রাঁ তো আর সব সময় নালা-নর্দমা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না—তাই বললুম, 'হ্যাঁ'। ও তখন বললো, 'তাহলে চোখ দুটো খোলা রাখো, আর আমি যা বলি তাই করো'। তারপর ও এক কোণ থেকে জল নিকাশের নলের নিচে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা বিরাট খালি পিপে টেনে এনে রান্নাঘরের মধ্যিখানে রাখলো। রেখে বললো, 'যাও, জল নিয়ে এসে এটা ভর্তি করো'।

'তাই দুটো বালতিতে করে আমি পুকুর থেকে জল টেনে আনতে লাগলুম। কিন্তু, মাফ করবেন হুজুর, ঘণ্টাখানেক ধরে জল টেনেও দেখি, পিপেটা যেন একটা মস্ত বড় জালা। আমি যতক্ষণ ধরে পিপেতে জল ভরছিলুম ওরা দুটোতে ততক্ষণ একের পরে আর এক পাত্র, তারপরে আর এক পাত্র—শুধু মদই গিলছিলো। ওরা নিজেরাই নিজেদের ভর্তি করে তুলছিলো। তাই বললুম, 'তোমরা পিপেটার চাইতেও বেশি বোঝাই হয়েছো'। তাতে ক্রুমেঁ জবাব দিলো, 'ঘাবড়াও মাৎ, তুমি নিজের কাজ করে যাও। তোমার পালাও আসছে—যার কপালে যা হবার, তা হবেই'। আমি দেখলুম ও মদে একেবারে চুর, তাই ওর কথায় কান দিলুম না।

'পিপেটা যখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে তখন বললুম, 'ব্যাস, আমার কাজ শেষ'। তখন কম্বুর্ আমায় পাঁচটা ক্রাঁ দিলো। ক্রমেঁ নয়, কম্বুর্—কম্বুই দিলো। ক্রমেঁ বললো, 'আরও পাঁচ ক্রাঁ রোজগার করতে চাও'? এ সব উপহার-টুপহার পেতে আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই। তাই বললুম, 'হ্যাঁ'—

'ও আমায় বললো, 'তাহলে পোশাক-টোশাক খোলো'।

'অ্যাঁ! পোশাক খুলতে বলছো'?

'হ্যাঁ'।

'কদ্দূর অব্দি খুলবো'?

'নেহাত খুলতে ইচ্ছে না করলে সেমিজটা পরে থাকো—তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই', ক্রমেঁ বললো।

'পাঁচ ক্রাঁ বলে কথা, নইলে ওই হতভাগা ছুটোর সামনে আমার পোশাক খোলার একটুও ইচ্ছে ছিলো না। যাই হোক প্রথমে টুপিটা খুললুম, তারপর কাঁচুলি আর সায়া। আর তারপর কাঠের তলি লাগানো জুতোজোড়াও খুলে ফেললুম। তখন ক্রমেঁ বললো, 'মোজাজোড়া পরেই থাকো—আমরা লোক ভালো'।

'কম্বুর্ও বললো, 'হ্যাঁ, লোক আমরা ভালোই'।

'আমার তখন, বলতে পারেন, আদিম জননী ইভের মতো অবস্থা। ওরা উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু, হুজুরের সম্মান রেখেই বলছি—ওরা তখন নেশায় এমন বুঁদ, যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারলো না।

'বললুম, 'তোমাদের মতলবটা কি'?

'ক্রমেঁ বললো, 'আমরা কি তাহলে তৈরি'?

'কম্বুর্ বললো, 'হ্যাঁ, তৈরি'।

'তারপর ক্রমেঁ ধরলো আমার মাথা, আর কম্বুর্ ধরলো আমার পা দুটো। নোংরা জামা-কাপড়ের বাণ্ডিল তোলার মতো ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরলো। আমি প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলুম। তাতে ক্রমেঁ আমাকে ধমকে উঠলো, 'খবরদার—একদম চুপ'!

'ওই ভাবেই ওরা আমাকে নিয়ে গিয়ে জলভর্তি পিপেটার মধ্যে চুবিয়ে দিলে। ঠাণ্ডায় আমার সমস্ত রক্ত একেবারে জমে গেলো, নাড়িভুঁড়িগুলো পর্যন্ত শিরশির করে উঠলো।

'ক্রমেঁ বললো, 'আর কিছু'?

'কর্ন্ন' বললো, 'নাঃ, ঠিক আছে'।

'কিন্তু ওর মাথাটা ডোবেনি, ওতে হেরফের হবে'।

'তাহলে মাথাটা চুবিয়ে দাও,' বললো কর্ন্ন।

'তখন ক্রমে একেবারে ডুবিয়ে খুন করার মতো করে আমার মাথাটা জলের মধ্যে ঠেসে ধরলো। আমার নাকের মধ্যে জল ঢুকতে লাগলো, মনে হলো আমি যেন চোখের সামনে স্বর্গ দেখতে পাচ্ছি। তারপর ও একটা জোর ঠুঁসো মারলো, আর আমি জলের নিচে তলিয়ে গেলাম।

'ওরা তখন নির্ঘাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ক্রমে আমাকে টেনে তুলে বললো, 'শীগগিরি যাও, জল মুছে শুকনো হও গে—হাড়গিলে শুঁটকি কোথাকার'!

'আমি তখন এক ছুটে ম্যঁসিয় লা কিউরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। আমার গায়ে বিনি সুতোর পোশাক দেখে তিনি আমাকে তার ঝিয়ের একটা সায়া পরতে দিয়ে, গাঁয়ের চৌকিদার শিকভ্‌কে ডেকে আনতে গেলেন। সে আবার ক্রিকেতোঁ থেকে পুলিস এনে, আমাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে গেলো।

'বাড়িতে গিয়ে দেখি, ক্রমে আর কর্ন্ন দুটো মদ্দা ভেড়ার মতো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে গলাবাজি করে বলছে, 'আমি বলছি ওটা ঠিক নয়, ওটা অন্তত এক ঘনমিটার। আসলে মাপটাই ভুল নেওয়া হয়েছে'।

'কর্ন্নও সমানে চেঁচাচ্ছে, 'চার বালতি—তাতে আধ ঘনমিটারও হয় বলে তুমি বলতে পারো না। ওই নিয়ে আর তর্ক করার কোন মানেই হয় না'!

'তখন সার্জেন্ট গিয়ে ওদের দুজনকে পাকড়াও করে ফেললেন'।

'আমার আর কিছু বলার নেই।'

'মাদাম ক্রমে বসে পড়লো। হাসির রোল উঠলো সমস্ত এজলাসে। বিস্মিত জুরিরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালেন। হাকিম গম্ভীর গলায় বললেন, 'আসামী কর্ন্ন, মনে হচ্ছে তুমিই এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের প্ররোচক। এ বিষয়ে তোমার কিছু বলার আছে?'

এবারে কর্ন্নর পালা। সে উঠে দাঁড়ালো, 'ধর্মাবতার, আমি তখন মাতাল ছিলুম।'

'জানি, তুমি মাতাল ছিলে।' হাকিম ফের গম্ভীর গলায় বললেন, 'তারপরে বলো'।

'হ্যাঁ, বলছি। হয়ে হয়েছে, মানে সেটা নাগাদ ক্রমে আমার বাড়িতে

এসেছিলো। এসেই ছুটো ব্রাণ্ডির ফরমাশ করে বললো, 'আমার সঙ্গে তুমিও এক পাত্তর খাও, বন্ধু'। তাই ওর সঙ্গে বসে খেলুম আর ভদ্রতা করে ওকেও আর এক পাওর খেতে বললুম। তারপর ও আমার খাতিরের ফেরতে ফের দু পাত্তর আনালো, আমিও আবার ঠিক তাই করলুম। বারোটা অব্দি দুজনে চুর হওয়াতক একের পর এক এমনি চললো। তারপর ক্রমেঁ কাঁদতে শুরু করলো। ওর জন্তে আমার ভীষণ দুঃখু হলো। জানতে চাইলুম, ব্যাপারটা কি। ও বললো, 'বেস্পতিবারের মধ্যে আমার এক হাজার ফ্রাঁ চাই-ই চাই'। কথাটা শুনে বুঝতেই পারছেন, আমি একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলুম। তারপরেই ও দুম করে প্রস্তাব করে বসলো, 'তোমার কাছে আমার বৌটাকে বিক্কিরি করে দেবো'।

'আমি তখন বেহেড্ মাতাল। তাছাড়া আমার নিজের বৌও মরে গেছে। তাই বুঝতেই পারছেন, কথাটা আমাকে ভালোমতোই পেয়ে বসলো। আমি ওর বৌকে চিনতুম না, কিন্তু বৌ মানে একটা মেয়েছেলে তো বটে—তাই নয় কি ? জিগেস করলুম, 'তা, কততে বেচবে' ?

'কথাটা ও ভেবে দেখলো, কিংবা ভেবে দেখার মতো ভান করলো। মানুষ মাতাল হলে বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক থাকে না। ক্রমেঁ বলে বসলো, 'আমি ওকে ঘনমিটারের হিসেবে বেচবো'।

'ওর জবাবে আমি অবাক হইনি, কারণ ওর মতো আমিও তখন মাতাল। তা ছাড়া আমার ব্যবসায়ে আমি ঘনমিটারের হিসেবেই অভ্যস্ত। তার মানে এক হাজার লিটার, আমি তাতেই রাজী। শুধু দরটা তখনও ঠিক করা বাকি। সব কিছুই নির্ভর করছে জিনিসের গুণাগুণের ওপরে।

'জিগেস করলুম, 'ঘনমিটার কত করে' ?

'ও জবাব দিলো, 'দু হাজার ফ্রাঁ'।

'তাই শুনে আমি তো একেবারে খরগোশের মতো লাফিয়ে উঠলুম। তারপরে নিজের মনেই ভাবলুম, একটা মেয়েমানুষের ওজন তিনশো লিটারের বেশি হতে পারে না। যাই হোক তবু বললুম, 'দরটা বড্ড বেশি'।

'ও বললো, 'ওর চাইতে কমে পারবো না, লোকসান হয়ে যাবে'।

'বুঝতেই পারছেন হুজুর, মানুষ অযথা শুয়োরের ব্যবসা করে না। নিজের কাজটা ক্রমেঁ ভালোমতোই বোঝে। কিন্তু আমিও কম সেয়ানা নই। চোর ধরতে চোরকেই লাগানো ভালো—হাঃ হাঃ হাঃ। বললুম, 'মেয়েটা যদি তরুতাজা

জিনিস হতো, অহরে বরটা চড়া বলতুম না। কিন্তু তুমি তো ওকে' ইয়ে করেছো, তাই নয় কি ? ও হচ্ছে হাত বদলী মাল। কাজেই আমি তোমাকে প্রতি ঘনমিটারের জন্তে পনেরেশো ক্রাঁ দেবো, তার একটি আধলাও বেশি নয়। রাজী আছো' ?

'ও বললো, 'রাজী—তবে তাই ঠিক'।

'হাতে হাত ধরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। কারণ জীবনের চলার পথে প্রত্যেকেরই অন্তকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু হঠাৎ আমার একটা ভয় হলো। বললুম, 'ওকে না ডুবিয়ে তুমি লিটারের হিসেবে মাপবে কি করে' ?

'ক্রমেঁ তখন নেশায় বুঁদ। তাই খুব সহজে না হলেও মতলবটা বুঝিয়েই বললো, 'একটা পিপে নিয়ে সেটাকে কানায় কানায় জল ভর্তি করবো। তারপর ওকে তার মধ্যে নামিয়ে দেবো। তখন যে জলটা উপছে পড়বে, সেটাকে মেপে ফেলবো—সেটাই হবে আসল মাপ'।

'বললুম, 'ঠিক আছে, রাজী। কিন্তু যে জলটা উপচে পড়বে, সেটা তুমি ফের জড়ো করবে কি করে' ?

'ও ভাবলো, আমি একটি হাঁদারাম। তারপর বুঝিয়ে বললো, ওর বউ পিপে থেকে বেরিয়ে এলে পিপেটা যতখানি খালি হবে, ততটা জল ফের ওতে ঢাললেই আমরা মোট মাপটা পেয়ে যাবো। মানে, ফের যতোটা জল ঢাললে পিপেটা ভর্তি হবে, ততটাই হবে ওর বৌয়ের ওজন। আমার ধারণা হলো, দশ বালতি হবে—তার মানে এক ঘনমিটার। হতভাগা ক্রমেঁ মাতাল হলেও বুদ্ধিতে বেশ টনটনে।

'ওর বাড়িতে গিয়ে নির্দিষ্ট জিনিসটা একটু দেখে নিলুম। মোটেই সুন্দরী মেয়েমানুষ নয়—ওই তো ওখানে বসে রয়েছে—যে কেউই দেখে তা বুঝবে। নিজের মনেই বললুম, ঠকে গেলাম! যাকগে, সুন্দরী হোক আর কুৎসিত হোক— মেয়েমানুষ সবই এক। তাই নয় কি, হুজুর ? তারপরেই দেখলুম, ওর চেহারাটা একেবারে তালপাতার সেপাই। হিসেব কষে দেখলুম, চারশো লিটারও হবে না। অনুমানটা আমি ঠিকই করেছি, কারণ তরল জিনিস নিয়েই আমার কাজ-কারবার।

'বন্দোবস্তটা আমরা কিভাবে করেছিলুম, তা মহিলাটি আপনাদের আগেই বলেছে। তবে কিনা আমার ক্ষতি হবে জেনেও, আমি ওকে সেমিজ আর মোজাজোড়া পরে থাকতে দিয়েছিলুম।

'কাজটা চুকে যাবার পরে কি হলো, ভাবতে পারেন ? মহিলা ছুটে পালালো। আমি বললুম, 'এই ক্রমে', ও পালিয়ে যাচ্ছে' !

'ক্রমে' বললো, 'সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি ওকে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। শোবার জন্যে ওকে বাড়িতে ফিরতেই হবে। আমি বরং দেখছি কতটা জল গড়ালো'।

'আমরা মেপে দেখলুম। চার বালতিও নয়—হাঃ হাঃ হাঃ!'

বন্দী আসামী হাসতে শুরু করলো। একজন পুলিস তার পিঠে একটা গোঁত্তা দিয়ে তাকে তুষ্ট না করা অব্দি সে হেসেই চললো। তারপর শান্ত হয়ে বললো, 'ঘটনাটা সংক্ষেপ করে দিতে ক্রমে' বলে বসলো, 'ও মাপটা ঠিক হয়নি। এতে কিচ্ছু করার নেই।' আমি চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগলুম, ক্রমে'ও তাই। আমি যতই জোরে চিৎকার করি, ক্রমে' ততই হাত-পা ছোঁড়ে। হয়তো রোজ-কেয়ামতের দিন অব্দি ওমনি চলতো, কারণ আমিও তখন পুরো মাতাল। কিন্তু তখনই পুলিশ এসে গেলো। এসে আমাদের গালাগালি করলো। তারপর বাদমাইশি করে আমাদের কয়েদখানায় পুরে দিলো। এ জন্যে আমি ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।'

কম্র্' বসে পড়লো। ক্রমে' দিব্যি কেটে বললো, তার সাকরেদের প্রতিটি কথাই সত্যি। জুরিরা হতবুদ্ধি হয়ে ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে বিবেচনা করে দেখার জন্যে এজলাশ ছেড়ে চলে গেলেন। এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এসে তাঁরা বিবাহের পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে কঠিন মন্তব্য করে এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের নির্দিষ্ট সীমারেখার কথা সংক্ষেপে জানিয়ে, আসামীদের বেকসুর খালাস করে দিলেন।

বৌকে নিয়ে ক্রমে' তখন ফের ঘর-সংসারের দিকে রওনা দিলো। আর কম্র্' ফিরে গেলো নিজের ব্যবসায়।

ভেজারস-ল্য-রেখেলের সমস্ত অধিবাসীই সমাধিভূমি পর্যন্ত ম্যসির বার্দো লেরেমিঁসের শবানুগমন করেছিলেন। সকলের স্মৃতিতেই অনুক্ষণ জেগে রয়েছিলো ওই পারলৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সরকারী মুখপাত্রের দেওয়া ভাষণটির শেষ কটি কথা : 'একজন সম্মানিত মানুষ আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেলেন।'

সত্যিই—জীবনের প্রতিটি প্রত্যক্ষ কাজকর্মে, ভাষণে, উদাহরণ নির্বাচনে, আচার-আচরণে, চলন-ভঙ্গিমায়, দাড়ির বাহারে আর টুপির গড়নে—তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ও মহান। কোন দিনও তিনি এমন কোন কথা বলেননি যার মধ্যে নীতির কোন অস্তিত্ব নেই, উপদেশ না দিয়ে তিনি ভিক্ষে দেননি কাউকে, আশীর্বাদ করা ছাড়া হাত তোলেননি কখনো।

দুটি সন্তান তিনি রেখে গিয়েছেন, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে ম্যঁসিয় পোয়েল দ্য ভলতে নামে একজন আইনজীবীর সঙ্গে, অভিজাত মহলে তার নিত্য যাতায়াত। বাবার মৃত্যুতে তাদের শোক ছিলো সান্ত্বনার অতীত, কারণ বাবাকে তারা সত্যিই আন্তরিকভাবে ভালবাসতো। অনুষ্ঠানটা শেষ হতেই তারা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে ফিরে এলো। তারপর ছেলে, মেয়ে এবং জামাই তিনজনে মিলে একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে মৃতের ইচ্ছাপত্রটা খুললো—যেটার সীলমোহর শুধুমাত্র তাদেরই খোলার কথা, তবে মৃতের শবাধার যথাস্থানে শায়িত হবার পর। খামের ওপরে তাদের উদ্দেশ্যে এই অনুরোধটুকুই ছোট্ট করে লেখা ছিলো। এ সমস্ত কাজে অভ্যস্ত ম্যঁসিয় পোয়েল দ্য ভলতেই খামটা খুললেন। তারপর চশমাটা ঠিকমতো এঁটে নিয়ে আইনের খুঁটিনাটি আবৃত্তি করে শোনাবার পক্ষে উপযোগী শুকনো নীরস গলায় পুরোটা পড়তে শুরু করলেন।

'আমার সোনার বাছারা, তোমাদের কাছে আমার এই স্বীকারোক্তি ব্যক্ত না করলে আমি কবরের নিচে শেষ বিশ্রামে শুয়েও শান্তি পাবো না। এ আমার এক জঘন্য পাপের স্বীকারোক্তি, যে পাপের তিক্ত অনুতাপ আমার সারাটা জীবন বিষময় করে তুলেছিলো। হ্যাঁ, আমি অপরাধী—এক ঘৃণ্য, ভয়ংকর পাপে পাপী।

'প্যারীতে এসে আমি যখন সবেমাত্র ওকালতিতে যোগ দিয়েছি, তখন আমার

বয়েস ছাব্বিশ বছর। ভিন-প্রদেশ থেকে আসা আরও পাঁচটা যুবকের মতো সেখানে কুলগোত্রহীন, আত্মীয়-বন্ধুবিহীন অবস্থায় দিন কাটছিলো আমার। অবশেষে একটি মেয়েমানুষ যোগাড় করে ফেললাম। 'মেয়েমানুষ' কথাটা শুনেই ক্ষেপে ওঠে এমন মানুষ তো কতই আছে! কিন্তু এমন অনেক মানুষও আছে যারা একা একা বেঁচে থাকতে পারে না। আমি তাদের মধ্যেই একজন। নির্জনতা আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে, রাত্রিবেলা তাপচুল্লির পাশে বসে অনুভব করি একাকীত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা। তখন মনে হয় পৃথিবীতে আমি যেন একা, নিদারুণ একা—অথচ অসংখ্য অজানিত ভয়ঙ্কর বিপদ ঘিরে রেখেছে আমাকে। ঘরের পাতলা দেওয়ালগুলো প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আমাকে যেন নক্ষত্রলোকের মতো সুদূরে সরিয়ে রেখেছে—তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু জানলা দিয়ে দেখতে পাই তাদের। বোবা দেওয়ালগুলো আমাকে ভয় দেখায়, আমি জ্বরগ্রস্ত হয়ে পড়ি—ভয় আর অস্থিরতার জ্বর। নির্জন ঘরের নীরবতা কত গভীর আর কত বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে! এ নীরবতা শুধুমাত্র শরীরকে ঘিরে নয়, এ নির্জনতা আত্মাকেও ঘিরে। আসবাবপত্রে সামান্য শব্দ হলেও হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে শিহরণ বয়ে যায়, কারণ এই বিষণ্ণ জায়গায় যে কোন শব্দই চমক বয়ে আনে।

'প্রায়শই ওই ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্যে বিচলিত আর বিভ্রান্ত হয়ে আমি কথা বলতে শুরু করি—অর্থহীন, সঙ্গতিহীন কিছু কথা—আসলে শুধুমাত্র কিছুটা শব্দ সৃষ্টির প্রয়াস, যাতে নৈঃশব্দ্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ওই সমস্ত সময়ে আমার কণ্ঠস্বর এত অদ্ভুত শোনাতো যে তাতেও আমার ভয় লাগতো। শূন্য ঘরে একা একা কথা বলার চাইতে ভয়ংকর জিনিস আর কি থাকতে পারে? নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অপরিচিত বলে মনে হয়, মনে হয় বুঝি অন্য কারুর গলা। কথাগুলোও উদ্দেশ্যহীন, শূন্য বাতাসে ঘুরে বেড়ায় তারা—শোনার মতো নেই কেউ কোথাও। মুখ থেকে কথা খসাবার আগেই বোঝা যায়, ঘরের নিটোল নৈঃশব্দ্যে কথাগুলো শুধু এক বিচিত্র প্রতিধ্বনির অনুরণন তুলবে—মস্তিষ্ক থেকে ঝংকার তোলা কিছু অস্ফুট কথার অলৌকিক প্রতিধ্বনি।

'তাই অবশেষে আমি একটি অল্পবয়সী মেয়েমানুষ ঠিক করলাম। মেয়েটি প্যারীর সেই সব কমবয়সী পেশাদার মেয়েদের মধ্যেই একজন, যারা রক্ষিতা হিসেবে থাকে—কিন্তু পয়সা পায় নিতান্তই কম। মেয়েটির দিব্যি ছোটখাটো মিষ্টি চেহারা, বাপ-মা পোয়েজিতে থাকে, মাঝেমধ্যে ও-ও সেখানে গিয়ে কয়েকটা

দিন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসে।

'বিয়ে করার মতো কোন সুন্দরী মেয়ে পেলে আমি ওকে ছেড়ে দেবো—সম্পূর্ণ এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি মেয়েটির সঙ্গে একটানা একটা বছর কাটিয়ে দিলাম। ওকে আমি সামান্য কিছু পারিশ্রমিকও দেবো বলে প্রস্তাব করেছিলাম। কারণ আমাদের সমাজে সাধারণ রেওয়াজই হচ্ছে, মেয়েমানুষকে তার প্রেমের বিনিময়ে সর্বদা কিছু মূল্য ধরে দিতে হবে—মেয়েটি গরীব হলে দিতে হবে অর্থ, আর ধনী হলে উপহার।

'কিন্তু একদিন ও আমাকে জানালো যে, ও মা হতে চলেছে। আমি আতঙ্কে হতবিহ্বল হয়ে উঠলাম। এক পলকের মধ্যে দেখতে পেলাম, আমার সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে গেলো। দেখলাম, এক নিদারুণ শৃঙ্খল মৃত্যু পর্যন্ত সারাটা জীবন আমাকে টেনে নিয়ে যাবে—আমার পারিবারিক জীবন, আমার বৃদ্ধ বয়স কোথাও এ শৃঙ্খলের হাত থেকে আমার রেহাই নেই। ওই মেয়েমানুষটা তার জঠরে বহন করা ওই শিশুটার শৃঙ্খলে জড়িয়ে ফেলেছে আমাকে—যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে আমার লালন-পালন করতে হবে, রক্ষা করতে হবে, নজর রাখতে হবে—অথচ সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে রহস্যটাও আমাকে গোপন করে রাখতে হবে সব সময়। খবরটা আমাকে সত্যি সত্যি মুষড়ে ফেললো। একটা আবছা বাসনা লাফিয়ে উঠলো মনের মধ্যে, যে বাসনা আমি কোনদিনও প্রকাশ করিনি। কিন্তু কপাটের আড়ালে আদেশের অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকা শয়তানের মতো সেই পাপ বাসনা আমার মনের সঙ্গে মিশে রইলো। মনে হলো, যদি কোন দুর্ঘটনা হয়! কত শিশুই তো জন্মানোর আগে শেষ হয়ে যায়!

'না, আমি আমার রক্ষিতাটির মৃত্যু কামনা করিনি। হতভাগী মেয়েটাকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম। কিন্তু হয়তো অন্যজনের মৃত্যুই আমি চেয়েছিলাম—তাকে নিজের চোখে দেখার আগেই।

'কিন্তু তবু সে জন্মালো। অবিবাহিত যুবকের ঘরটা হয়ে উঠলো শিশুসহ একটা নকল সংসার। এ এক অস্বাভাবিক ঘটনা! বাচ্চাটা দেখতে অন্য আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই। আমি ওকে ভালবাসতাম না। জানোই তো, বাবারা অনেক দিন পর্যন্ত বাচ্চাদের ভালবাসে না—মায়েদের মতো তাদের অন্তটা কোমল স্নেহানুভূতি নেই। তাদের স্নেহ জাগে ধীরে ধীরে, বাৎসল্যের প্রকাশ হয় একটু একটু করে।

'আরও একটা বছর কেটে গেলো। এখন আমি আমার ঘরটাকে সযত্নে

এড়িয়ে চলি। এখন সে ঘরের টেবিলে, কুর্সির হাতলে, এখানে-সেখানে সর্বত্র ছড়ানো থাকে বাচ্চাটার পোশাক-আশাক, মোজা-দস্তানা এবং আরও হাজারো রকমের হরেক জিনিস। তাছাড়াও আমি পারতপক্ষে বাড়িতে থাকতাম না, যাতে বাচ্চাটার কান্না আমাকে শুনতে না হয়। পোশাক ছাড়ানো, স্নান করানো, বিছানায় শোয়ানো—বলতে গেলে সব সময়েই সেটা কেঁদে গলা ফাটায়।

'ইতিমধ্যে আমার কিছু বন্ধুবান্ধব হয়েছিলো। একদিন এক বৈঠকখানায় তোমাদের মার সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমি ওকে ভালবেসে ফেললাম, আমার মনে ওকে বিয়ে করার বাসনা জেগে উঠলো। ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানালাম এবং আমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর হলো।

'কিন্তু আমি তখন ফাঁদে পড়েছি। আমার মনে দ্বিধা—এই তরুণী, যাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—নিজের একটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও তাকে কি আমি বিয়ে করবো? নাকি সমস্ত সত্যি ঘটনা বলে আমি ওকে, আমার সুখ, আমার ভবিষ্যৎ—সব কিছুকে হারাবো? আমি জানতাম, ওর বাবা-মা বড় কঠোর। সবকিছু জেনে তাঁরা কিছুতেই এ বিয়েতে মত দেবেন না।

'নৈতিকতার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আরও একটা ভয়ঙ্কর মাস কাটিয়ে দিলাম। এই একটা মাস হাজারটা সাংঘাতিক চিন্তা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ালো আমাকে। নিজের সন্তানের প্রতি এক তীব্র বিজাতীয় ঘৃণাবোধ জেগে উঠলো আমার মধ্যে। ওই কাঁদুনে মাংসপিণ্ডটা আমার পথ আটকে রেখেছে, আমার জীবনটাকে ছুটো টুকরো করে দিয়েছে, যৌবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে এক আশা-আনন্দহীন রিক্ত অস্তিত্ব করে তুলেছে আমাকে।

'তারপর আমার রক্ষিতাটির মা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি একা রইলাম বাড়িতে।

'সেটা ডিসেম্বর মাস, প্রচণ্ড শীত। ওঃ, সে কি রাত একখানা! মেয়েমানুষটা সবেমাত্র চলে গেছে। পার্লারে বসে আমি একা একাই রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর ধীর সন্তর্পণে যে ঘরে বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিলো, সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বাইরের শুকনো হিমেল বাতাস তখন জানলার শার্শিগুলোতে আছড়ে পড়ছে। তাপচুল্লির কাছে একটা আরামকুর্সিতে গিয়ে বসলাম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশের অজস্র তারা জ্বলজ্বল করে তীক্ষ্ণ আলো ছড়াচ্ছে—তুষারঝরা রাতে ঠিক যেমনটি হয়।

'গত এক মাস ধরে যে চিন্তাটা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, তখন সেই

চিন্তাটাই আবার নতুন করে জেগে উঠলো সহসা। যে মুহূর্তে আমি ক্লান্তিতে নিশ্চল হয়ে বসেছিলাম, সেই মুহূর্তেই চিন্তাটা নেমে এসে কুরে কুরে খেতে লাগলো আমার মস্তিষ্কটাকে—কর্কট রোগ যেমন করে মাংস কুরে কুরে খায়। আমার মাথায়, হৃৎপিণ্ডে, সমস্ত শরীরে আমি সে যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। যন্ত্রণাটা যেন পশুর মতো গোগ্রাসে গিলছে আমাকে। প্রাণপণে আমি ওই বিষাক্ত চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছিলাম, ভাবতে চাইছিলাম অন্য কিছু…অন্য কোন নতুন আশার কথা—যেমন করে সকালবেলা জানলা খুলে মানুষ রাতের দূষিত বাতাস ঘর থেকে বের করে দিতে চায়। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও আমি তার হাত থেকে রেহাই পেলাম না। জানি না, কি করে আমি সেই দুঃসহ যন্ত্রণার কথা বোঝাবো! দেহ ও মনে সে এক নিদারুণ দাহ।

'আমার জীবনের সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে! কি করে এই প্রখর দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবো আমি? কি করে পেছিয়ে এসে স্বীকার করবো আমার গোপন পাপের কথা?

'এবং তোমাদের মাকে আমি পাগলের মতো ভালবাসতাম। সেই প্রেম এই অলঙ্ঘ্য বাধাটাকে আরও আতঙ্কজনক করে তুললো।

'এক প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে উঠলো আমার মধ্যে, যে ক্রোধ পাগলামোরই নামান্তর। হ্যাঁ, সে রাতে আমি পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম!

'বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিলো। উঠে গিয়ে দেখতে থাকি ওকে। এই সেই অবাঞ্ছিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব, যা আমাকে আশাহীন বেদনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। মুখটা একটুখানি ফাঁক করে কম্বলের নিচে একটা দোলনায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে ও। কাছেই আরো একটা বিছানা, যেখানে আমি শুই কিন্তু ঘুমোতে পারি না।

'ওঃ, কি করেছিলাম আমি! কি করেই বা করেছি? আমি নিজেই কি তা জানি? কোন শয়তানী শক্তি ভর করেছিলো আমাকে? জানি না। কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়েই প্রলোভন আমাকে বশ করে ফেলেছিলো। শুধু মনে আছে, হৃৎপিণ্ডটা এমন প্রচণ্ড বেগে ঘা মারছিলো যে মনে হচ্ছিলো দেওয়ালের ওধার থেকে কেউ বুঝি হিংস্রভাবে হাতুড়ি পিটছে। শুধু ওইটুকুই মনে আছে—আমার হৃৎস্পন্দনের কথা—আর কিছু না। মাথার মধ্যে এক বিচিত্র বিভ্রান্তি, আর বিক্ষোভ। সাধারণ বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণ লুপ্ত। আমার তখন সেই অবস্থা, যখন নিজের ইচ্ছের ওপরে মানুষের আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

'সন্তর্পণে বাচ্চাটার গায়ের ঢাকনা তুলে সেটা দোলনার পায়ের দিকে ছুঁড়ে

দিলাম। দেখলাম, সম্পূর্ণ নগ্ন ওর শরীর। তবু ও জাগলো না। ধীরে, অতি ধীরে জানলার কাছে এগিয়ে কপাট খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একঝলক হিমেল বাতাস হত্যাকারীর মতো ঘরের ভেতর ছুটে এলো—এত ঠাণ্ডা যে আমি নিজেও কুঁকড়ে উঠলাম, থিরথিরিয়ে কেঁপে উঠলো মোমবাতি দুটোর শিখা। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, পেছনে ফিরে তাকাবার সাহস নেই—যেন পেছনে কি হচ্ছে তা দেখার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। অনুভব করছিলাম, আমার কপাল গাল আর হাতে আলতো স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে সেই মৃত্যুতুহিন বাতাস। এইভাবে কেটে গেলো বহুক্ষণ।

'আমি কিন্তু কিছুই চিন্তা করছিলাম না তখন। হঠাৎ ছোট্ট একটুকরো কাশির আওয়াজে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক নিদারুণ আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গেলো। চকিত তৎপরতায় সজোরে জানলার কপাট বন্ধ করে ছুটে গেলাম দোলনাটার কাছে।

'তখনও ঘুমোচ্ছিলো ছেলেটা। মুখটা সামান্য একটুখানি ফাঁক করা, সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর। কাঁপা হাতে আমি ওর পা দুখানি ছুঁয়ে দেখলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা। চাদরটা টেনে দিলাম ভালো করে।

'সহসা আমার মন নরম হয়ে আসে। বেচারা এই অপাপবিদ্ধ শিশু যাকে আমি খুন করতে চেয়েছিলাম, তার প্রতি এক নিবিড় মমতা আর অগাধ করুণায় ভরে ওঠে সারা মন। ওর পাতলা চুলগুলোতে গভীর চুম্বন এঁকে দিয়ে ফের গিয়ে বসে পড়ি আগুনের ধার ঘেঁষে। ভয় আর বিহ্বলতা নিয়ে ভাবতে থাকি—কি করেছি আমি! কোত্থেকে আসে হৃদয়ের এই প্রলয় ঝড় যা মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করে তোলে, যার আবেগে উন্মাদ মত্ততায় কাজ করে মানুষ, হারিয়ে ফেলে আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতা, এগিয়ে চলে সামুদ্রিক ঝড়ে বিপর্যস্ত জাহাজের মতো!

'আরও একবার কেশে উঠলো বাচ্চাটা। তাই শুনে আমার বুক যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। যদি মরে যায় ছেলেটা! হে ঈশ্বর, প্রভু আমার! তাহলে আমার কি হবে?

'একটা মোমবাতি নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। এক হাতে দোলনাটা ধরে ঝুঁকে দাঁড়ালাম ওর দিকে। শান্ত ভাবেই ও নিঃশ্বাস নিচ্ছে দেখে আশ্বস্ত হলাম খানিকটা। কিন্তু তারপরেই তৃতীয়বার ও কেশে ওঠাতে চমকে উঠলাম ভীষণভাবে। কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে বিহ্বল হয়ে ওঠা মানুষের মতো এত

দ্রুত পেছিয়ে এলাম যে মোমবাতিটা খসে পড়লো হাত থেকে।

'ওটা কুড়িয়ে নিয়ে ফের সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বুঝতে পারি, আমার কপাল উদ্বেগের ঘামে ভরে উঠেছে। সে ঘাম একই সঙ্গে গরম ও ঠাণ্ডা দুই-ই। ওরা যেন এক অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা আর নৈতিক অনুশোচনার চিহ্ন, যা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে আর বরফের মতো জমে যায়—এখন সেগুলোই ফুটে উঠছে আমার শরীরের চামড়া আর খুলির হাড়ের ভেতর থেকে।

'ভোর অব্দি আমি ওর দোলনার কাছেই রইলাম। একটানা যতক্ষণ ও শান্ত-ভাবে ঘুমোচ্ছিলো, ততক্ষণ শান্ত করে রাখছিলাম মনের যত আতঙ্ক। আর ওর মুখের ফাঁক দিয়ে যখন ক্ষীণ কাশির আওয়াজ বেরুচ্ছিলো, তখন চেপে থাকছিলাম উদ্বেগময় সমস্ত ব্যাকুলতা।

'লাল চোখ, আর ভাঙা গলা নিয়ে ঘুম ভাঙলো ওর। স্পষ্টই ও অসুস্থ।

'বাড়ির ঠিকা ঝি আসতেই তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠালাম। ঘণ্টাখানেক বাদে এসে তিনি বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করে জিগেস করলেন, 'ওকে কি ঠাণ্ডা লাগানো হয়েছিলো' ?

'না, তেমন তো মনে হয় না'। প্রাচীন বৃদ্ধের মতো কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম। তারপরেই প্রশ্ন করলাম, 'কি হয়েছে ওর ? গুরুতর কিছু কি' ?

'এখনও ঠিক বলতে পারছি না'। উনি বললেন, 'সন্ধ্যেবেলায় আমি ফের আসবো'।

'সন্ধ্যার সময় তিনি আবার এলেন। ছেলেটা প্রায় সমস্তদিনই গভীর তন্দ্রায় লীন হয়ে থেকেছে, মাঝে মাঝে কেশেছে।...সেদিন রাত্রেই শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ শুরু হলো ওর'।

'দশদিন এমনিভাবে চললো। এই দশটা দিনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি যে কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা তোমাদের বোঝাতে পারবো না।

'সে মারা গেলো...

'সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে আমি একটা ঘণ্টাও ওই বিষাক্ত স্মৃতিটাকে ভুলে থাকতে পারিনি। স্মৃতিটা প্রতিমুহূর্তে আমার ভেতরটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যেন হৃদয়ের অতলে বন্দী হয়ে থাকা একটা লোলুপ পশুর মতো আমার আত্মাটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে নিষ্ঠুর হিংস্রতায়।

'ওঃ, আমি যদি পাগল হয়ে যেতে পারতাম!'

মঁ্যসিয় পোয়েরো তৎক্ষণাৎ তাঁর চশমাটা ওপরের দিকে ঠেলে দিলেন। কোনো দলিল পড়া শেষ হবার পর, এটাই তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিমা। তিনজন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিবর্ণ, নির্বাক আর নিস্পন্দ হয়ে।

এক মুহূর্ত পরে উকিল ভদ্রলোক বললেন, 'এটা কিন্তু অবশ্যই নষ্ট করে ফেলতে হবে।'

অন্য দুজন ঘাড় নেড়ে সায় জানালো।

উকিল ভদ্রলোক একটা মোমবাতি জ্বাললেন। তারপর অর্থনৈতিক বিলি-বন্দোজের পৃষ্ঠাগুলো থেকে ওই মারাত্মক স্বীকারোক্তির পৃষ্ঠাগুলো সাবধানে আলাদা করে নিয়ে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে তাপচুল্লির খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলেন।

ওরা দেখলো, সাদা পৃষ্ঠাগুলো পুড়ে যাচ্ছে। শীগগিরি ছোট্ট একটা ছাইয়ের ঢিপি জমে উঠলো। কতকগুলো অক্ষর তখনও বোঝা যাচ্ছিলো। মেয়েটি পায়ের আঙুল দিয়ে বিচলিতভাবে সেগুলোকে মাড়িয়ে ঠাণ্ডা ছাইগাদার নিচে চেপে দিলো।

তারপর আরও কিছুক্ষণ ওরা তিনজনে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। যেন ওদের আশঙ্কা, ওই দগ্ধ হয়ে যাওয়া গোপন রহস্য হয়তো চিমনির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার আত্মপ্রকাশ করবে।

ক্লাবের প্রধান সিঁড়ি দিয়ে নামবার পথে ব্যারন মেঁারদিয়ান তাঁর ওভারকোটটা খুলে ফেললেন। সমস্ত ঘরটা একেবারে যেন তেতে পুড়ে ছিলো। কিন্তু সদর দরজাটা তাঁর পেছনে বন্ধ হয়ে যেতেই রাশ রাশ দুরন্ত ঠাণ্ডা একেবারে আচমকা তাঁর মজ্জার ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো। নিজেকে সম্পূর্ণ করুণ আর অসহায় বলে মনে হলো তাঁর। কারণ এ ব্যাপারটা ছাড়াও কিছুদিন ধরে তাঁর লোকসান যাচ্ছিলো, বদহজম হচ্ছিলো এবং ফলে পছন্দমতো খাবারদাবার খেতে পারছিলেন না।

তিনি বাড়িতেই ফিরে আসছিলেন প্রায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর বিশাল নির্জন ঘর, ঘরের লাগোয়া ছোট্ট ঘরে ঘুমন্ত চাকর, গ্যাসের উনুনে ফুটন্ত জলের কলকল গান এবং মৃত্যুশয্যার মতো বিষণ্ন বিশাল বিছানাটার স্মৃতি আচমকা হিমেল হাওয়ার চাইতেও তাঁকে বেশি করে শিউরে তুললো।

গত কয়েক বছর ধরেই তিনি অনুভব করছেন, নিঃসঙ্গতার বোঝা তার ওপরে ভারি হয়ে চেপে বসেছে—যে বোঝা কখনো কখনো অবিবাহিত বৃদ্ধদের একেবারে হতবুদ্ধি করে দেয়। চিরটা কালই তিনি শক্তসমর্থ, কর্মঠ এবং আমুদে স্বভাবের মানুষ—দিনের বেলা খেলাধুলো আর রাত্রিবেলায় আনন্দ-স্ফূর্তি করে সময় কাটাতেন। কিন্তু এখন সবকিছুই যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে, কোন কিছুতেই আর উৎসাহ জাগে না। একটু-আধটু ব্যায়াম বা শারীরিক কসরতেই তিনি ক্লান্ত হয়ে ওঠেন। বিকেল এমন কি রাত্রের খাওয়াদাওয়াও তাঁকে অসুস্থ করে তোলে। মেয়েরা একদিন তাঁকে যতটা আনন্দ দিতো, আজকাল ঠিক ততটাই ক্লান্ত আর বিরক্ত করে তোলে।

একই ধরনের সন্ধ্যাগুলোতে একই রকমের একঘেয়েমি, একই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সেই একই জায়গা—অর্থাৎ ক্লাবে—দেখাসাক্ষাৎ, একই সঙ্গীদের নিয়ে তাস খেলায় হারজিত, একই প্রসঙ্গের আলোচনা, একই জনের মুখ থেকে একই বিষয়ে ঠাট্টা-পরিহাস, একই মহিলাদের সম্পর্কে একই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি—এ সবকিছুই তাঁকে এত অসুস্থ করে তুলেছিলো যে অনেক সময়েই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতেন। এই বাঁধা নিয়মের উদ্দেশ্যহীন অতি সাধারণ জীবন, যা একাধারে অসার ও অর্থহীন, তা তিনি আর সহ্য করতে

পারছিলেন না এবং কেন তা না জেনেই শান্তি, বিশ্রাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

অবশ্য বিয়ে করার কথা তিনি আদপেই চিন্তা করেননি। কারণ বিষাদময় জীবন বা দাম্পত্যজীবনের দাসত্বের মোকাবিলা করার মতো সাহস তাঁর আদৌ ছিলো না। বিয়ে তাঁর কাছে দুটি নরনারীর এক ঘৃণ্য সহাবস্থান—যারা পরস্পরকে এত নিবিড় করে চেনে যে একজনের প্রতিটি কথাই অন্যজন আগে থেকে ঠিকমতো অনুমান করে নিতে পারে...একজনের কোন চিন্তা, বাসনা বা অভিমতই অন্যজনের কাছে গোপন থাকে না। তিনি মনে করেন, যতক্ষণ কোন মেয়ের সম্পর্কে অতি সামান্য কিছু জানা যায়, যতক্ষণ মেয়েটি রহস্যময়ী থাকে—শুধু ততক্ষণই তার প্রতি আকর্ষণ বজায় রাখা চলে। কাজেই তিনি চাইতেন পীড়ন ও বন্ধনহীন পারিবারিক জীবন, যেখানে তিনি তাঁর কিছুটা মাত্র সময় ইচ্ছেমতো ব্যয় করতে পারবেন। অবশ্য এ ছাড়া তাঁর ছেলের স্মৃতিও তাঁকে রীতিমতো পীড়ন করতো।

গত একটা বছর ধরে তিনি ক্রমাগত তাঁর ছেলের কথা চিন্তা করেছেন এবং অনুভব করেছেন তাকে দেখার, তার কাছে নিজের পরিচয় দেবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ তাঁর মনে সাগ্রহে বেড়ে উঠেছে। ঘটনাটা ঘটেছিলো তাঁর যুবক বয়সে, স্নেহ আর প্রেমের পারিপার্শ্বিকতায়। বাচ্চাটাকে দক্ষিণ ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এবং মার্সেইয়ের কাছে সে বড় হয়ে উঠেছিলো পিতৃপরিচয়টুকু না জেনেই। অথচ তার লালন-পালন, পড়াশুনো এমন কি সবশেষে তার বিয়ের খরচটাও তিনিই বহন করেছেন। আসল রহস্য ফাঁস না করে একজন বিশ্বাসী উকিলই এ বিষয়ে মধ্যস্থতার কাজ করেছিলেন।

ব্যারন মোঁরদিয়ান শুধু জানতেন, তাঁর সন্তান মার্সেইয়ের কাছে-পিঠে কোথাও থাকে, সুশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান বলে তার খ্যাতি আছে। একজন স্থপতির মেয়েকে সে বিয়ে করেছে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে স্থপতির ব্যবসাটাও সে পেয়েছে। শোনা যায়, তার পয়সাকড়িও নাকি হয়েছে যথেষ্ট। কেন তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে নিজের অপরিচিত ছেলেকে দেখতে যাবেন না? কেন তাকে বাজিয়ে দেখবেন না যে প্রয়োজনের সময় তিনি তার বাড়িতে সমাদরের আশ্রয় পাবেন কি না? চিরদিনই ছেলের সম্পর্কে তিনি সংস্কার-মুক্ত মনোভাব পোষণ করেছেন, তাকে বদান্যতা দেখিয়েছেন এবং তাঁর সে বদান্যতা কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীতও হয়েছে। কাজেই অযৌক্তিক গর্ব দেখিয়ে ছেলের

সঙ্গে তিনি নিশ্চয়ই কোনরকমের বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়বেন না। দক্ষিণ দেশে যাবার বাসনা এখন বারবার তাঁর মনে ঘুরে ফিরে আসছে, কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। সমুদ্রতীরের সেই আনন্দঘন শান্তির নীড়ে ছেলে, ছেলে-বৌ, আর নাতি-নাতনীদের কথা ভেবে তিনি এক বিচিত্র আত্মকরুণা অনুভব করতেন। এ সবকিছুই তাঁকে তাঁর বহুদিন আগেকার সংক্ষিপ্ত এবং সুরক্ষিত প্রেমের কথা মনে করিয়ে দিতো। শুধু নিজের অতীত বদান্যতার কথা ভেবে তাঁর দুঃখ হতো, যে বদান্যতা আজকের ওই যুবা পুরুষটিকে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, যা না করলে তিনি 'দাতা' হয়ে বসতেন না।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে ফারের কলারে মাথা গুঁজে হাঁটছিলেন ব্যারন। তারপর অতি দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন—একটা গাড়ি থামিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে। চাকর ঘুম থেকে উঠে এসে দরজাটা খুলে দিতেই বললেন, 'লুই, আসছে কাল সন্ধ্যাবেলায় আমরা মার্সেইতে রওনা হবো। হয়তো দিন পনেরো থাকবো। যাত্রার সব বন্দোবস্ত তৈরি করে রাখো।'

রোন নদীর বালুময় তীর ধরে, হলদে রঙের সমভূমি আর দূরের পাহাড়ে ঘেরা রোদঝলমলে গ্রামের ভেতর দিকে ছুটে চললো রেলগাড়ি।

একটা রাত ঘুম-গাড়িতে কাটিয়ে জেগে উঠলেন ব্যারন। আর তারপরেই পোশাকের বাক্সে রাখা ছোট্ট আয়নাটাতে নিজের মুখ দেখে বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন। দক্ষিণ দেশের কর্কশ আলোয় সারা মুখে অসংখ্য আঁকিজুকি ফুটে উঠেছে, যা তিনি আগে কখনো দেখেননি। ত[illegible]াড়া কেমন যেন জড়ত্বের চিহ্ন, প্যারীর মেঘলা আলোয় যা এতদিন অগোচরেই ছিলো। চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে চোখের পাতায় বলিরেখার কলঙ্ক আর ফাঁকা হয়ে আসা কপালের দু ধার দেখে তিনি নিজের মনেই বললেন, 'হায় ভগবান, এ আমার কি দশা! আমাকে যে একেবারে বুড়ো দেখাচ্ছে!'

আচমকা ব্যারনের মনে শান্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে বেড়ে উঠলো এবং জীবনে এই প্রথম তিনি নাতি-নাতনীদের কোলে নেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

মার্সেইতে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করলেন ব্যারন। তারপর বেলা প্রায় একটা নাগাদ দক্ষিণ ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্যময় একটা ঝকঝকে সাদা কুটিরের সামনে এসে থামলেন। সারি বাঁধা প্লেনগাছের মাঝখান দিয়ে মনের আনন্দে এগুতে এগুতে তিনি ভাবলেন, 'সত্যিই ভারি চমৎকার!'

হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে পাঁচ-ছ বছরের একটা বাচ্চা একছুটে বেরিয়ে এসে তাঁকে দেখে চোখ বড় বড় করে থমকে দাঁড়ালো।

মোঁরদিয়ান এগিয়ে এসে বললেন, 'কি গো বাছা, ভালো?'

বাচ্চাটা কোন জবাব দেয় না।

চুমু দেবার জন্তে একটু ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিলেন মোঁরদিয়ান। কিন্তু ওর গা থেকে এত তীব্র রসুনের গন্ধ বেরুচ্ছিলো যে তক্ষুনি ফের ওকে নামিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই মালীর ছেলে।' তারপর এগিয়ে গেলেন বাড়িটার দিকে।

দরজার সামনে একটা দড়ির ওপরে শুকোতে দেওয়া ধোয়া জামা-কাপড়—শার্ট, রুমাল, তোয়ালে, বিছানার চাদর, ঢিলে বহির্বাস একটা জানলার মাঝখানের শূন্ত অংশটাতে পর পর সারিবাঁধা দড়িতে অসংখ্য মোজা ঝোলানো, ঠিক কসাইয়ের দোকানে ঝোলানো মাংসের টুকরোর মতো।

ব্যারন ডাকতেই একটা ঝি এসে হাজির হলো। তার চেহারাটা পাক্কা দখনে-মার্কা, নোংরা আলুথালু বেশবাস, চুলগুলো মুখের ওপরে এসে পড়েছে।

'ম্যঁসিয় ডাচো বাড়িতে আছেন?' ব্যারন জানতে চাইলেন।

বহু বছর আগে অবাঞ্ছিত সন্তানকে এই নামটা দেওয়ার সময় ব্যারন নিজের পরিহাসপ্রিয়তার নজির রেখেছিলেন, সন্দেহ নেই।

'আপনি ম্যঁসিয় ডাচোকে চান?' উলটে প্রশ্ন করলো ঝি।

'হ্যাঁ।'

'উনি এখন বৈঠকখানায় বসে আঁকজোক করছেন।'

'তাকে বলো, ম্যঁসিয় মার্লিন তার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'ওমা! তাহলে ভেতরে আসুন!' একটু যেন অবাক হয়ে বললো ঝিটা। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'ম্যঁসিয় ডাচো, একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

একটা বিশাল ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ব্যারন। খড়খড়িগুলো অর্ধেক নামানো বলে ঘরটা অন্ধকার। চতুর্দিক নোংরা আর অগোছালো। বেঁটেখাটো টেকো-মাথা একটা লোক ভিড়াক্রান্ত একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা এক টুকরো কাগজে দাগ টানছিলো। কাজ থামিয়ে এগিয়ে এলো লোকটা।

লোকটার খোলা কোট, ঢিলে পাতলুন আর হাতা গোটানো জামা দেখেই বোঝা যায়, কি ভীষণ গরম পড়েছে। কাদামাখানো জুতোজোড়া দাক্ষী দিচ্ছে

সাম্প্রতিক বৃষ্টির।

'আমি...মানে কার সঙ্গে আমার কথা বলার সৌভাগ্য হচ্ছে...' সুস্পষ্ট দক্ষিণী উচ্চারণে প্রশ্ন করে লোকটা।

'আমি মঁ্যসিয় মার্লিন। একটা জমি-বাড়ির ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' অন্ধকারে বসে সেলাই করতে থাকা স্ত্রীর দিকে ফিরে ভাচো বললো, 'জোসেফিন, একটা কুর্সি একটু সাফ করে দাও তো।'

মেঁারদিয়ান একটি যুবতীকে দেখতে পেলেন, ইতিমধ্যেই ওর শরীরে বয়সের ছাপ ফুটে উঠেছে। আসলে নিয়মিত যত্ন আর পরিচ্ছন্নতার অভাবে গাঁয়ের মেয়েদের পঁচিশ বছর বয়সেই এমন দশা হয়। অথচ ঠিকমতো ধরে রাখতে জানলে পঞ্চাশ বছর বয়সেও যুবতীসুলভ আকর্ষণ আর সৌন্দর্য বজায় রাখা যায়। মেয়েটির কাঁধের ওপরে একটা ঝাড়ন, ঘন কালো চুলগুলো কোনরকমে ঘাড়ের কাছে জড়ো করে রাখা—দেখে মনে হয় তাতে চিরুনির আঁচড় পড়ে খুবই কম। কর্কশ হাতে একটা কুর্সি থেকে বাচ্চার পোশাক, ছুরি, একটুকরো দড়ি, একটা খালি ফুলদানী আর একটা তেলতেলে পিরিচ সরিয়ে মেয়েটি সেটা আগন্তুকের দিকে এগিয়ে দিলো।

কুর্সিতে বসে ব্যারন লক্ষ্য করলেন, ভাচো যে টেবিলটাতে কাজ করছিলো সেটাতে তার বই আর কাগজপত্র ছাড়াও সবে কেটে আনা দু-টুকরো লেটুশ, একটা হাত ধোবার গামলা, একটা বুরুশ, একটা তোয়ালে, একটা রিভলভার আর বেশ কয়েকটা নোংরা পেয়ালা রয়েছে।

ব্যারনকে ওসব লক্ষ্য করতে দেখে ভাচো মৃদু হাসলো, 'দুঃখিত, ঘরটা খানিকটা নোংরাই বটে। তবে দোষটা কিন্তু বাচ্চাদের।' একটা কুর্সি টেনে সে তার মক্কেলের সঙ্গে কথা বলতে বসলো।

'আপনি মার্সেইয়ের আশেপাশে জমি খুঁজছেন?'

খানিকটা দূরে থাকলেও মেঁারদিয়ান তীব্র রসুনের গন্ধ পেলেন, যা দক্ষিণের লোকেরা ফুলের সুরভির মতোই নিজেদের শরীর থেকে ছড়ায়।

'প্লেন গাছগুলোর নিচে আপনার ছেলের সঙ্গেই আমার দেখা হলো নাকি?' প্রশ্ন করলেন মেঁারদিয়ান।

'হ্যাঁ, দ্বিতীয় পুত্র।'

'তাহলে আপনার দুই ছেলে?'

'তিনটি, ফি বছরে একটি করে।' স্পষ্টতই ডাচো খুব গর্বিত।

ব্যারন চিন্তা করলেন, ওদের প্রত্যেকের শরীরেই যদি ওই এক গন্ধ থাকে তবে ওদের ঘরটা রীতিমতো সুরক্ষিতই বলা চলে। যাই হোক, ফের পুরনো প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সমুদ্রের ধারে কোন নির্জন জায়গায় যদি একখণ্ড সুন্দর জমি পাওয়া যায়...'

ডাচো তখন বিশদভাবে বোঝাতে শুরু করলো। তার হাতে ওই ধরনের দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশো, কি তারও বেশি জমি আছে—সব রকমের দামের মধ্যেই হবে, সব রকম রুচির সঙ্গেই মিলবে। কথাগুলো হুড়বুড়িয়ে বেরিয়ে আসছিলো তার মুখ থেকে, হাসি মুখে গভীর পরিতৃপ্তিতে ঘনঘন নিজের টেকো মাথাটা দোলাচ্ছিলো সে।

ঠিক তখনই সেই ছোটখাটো ফর্সা চেহারার খানিকটা বিষাদ-মলিন মেয়েটির কথা মনে পড়লো ব্যারনের, যে আকুল আকাঙ্ক্ষায় তাকে 'প্রিয়তম' বলে ডাকতো, যার স্মৃতিটুকুই তার ধমনীতে রক্তের গতিকে তপ্ত আর উদ্দাম করে তুলতো। তিনটি মাস তাকে পাগলের মতো ভালবেসেছিলো মেয়েটি। তারপর স্বামীর অনুপস্থিতিতে গর্ভবতী হয়ে পড়ে বেচারী। স্বামী ছিলেন একটি উপনিবেশের শাসনকর্তা। ভয় আর হতাশায় সন্তানের জন্ম পর্যন্ত পালিয়ে পালিয়ে ছিলো মেয়েটি। শেষে এক গ্রীষ্মদিনের সন্ধ্যায় মোঁরদিয়ান বাচ্চাটাকে পাচার করে দিয়ে আসেন, যাকে তিনিও আর কোনদিন দেখেননি।

তিন বছর বাদে যক্ষায় মারা যায় মেয়েটি। তখন সে তার স্বামীর সঙ্গেই থাকার জন্যে স্বামীর কর্মস্থলে চলে গিয়েছিলো। আর এই হচ্ছে তাদের সেই সন্তান, যে এখন তার পাশে বসে ধাতব কণ্ঠে বলে চলেছে, 'এই জমিটা স্যার, বলতে গেলে একটা অপূর্ব সুযোগ...'

মোঁরদিয়ানের মনে পড়লো ফুরফুরে পশ্চিমা বাতাসের মতো হালকা আর একটি কণ্ঠস্বরের মৃদু গুঞ্জন, 'প্রিয় আমার, আমরা কোনদিনও আলাদা হবো না।'...এই বেঁটেখাটো বিদঘুটে লোকটার গোলগাল, নীল নৈর্ব্যক্তিক চোখের দিকে তাকিয়ে আর একটি স্নিগ্ধ, সুনীল, নিবেদিত দৃষ্টির কথা মনে পড়লো তাঁর। এ লোকটা যদিও অনেকটাই তাঁর মায়ের মতো, কিন্তু তবু...

হ্যাঁ, প্রতি মুহূর্তেই ওকে আরও বেশি করে ওর মায়ের মতো লাগছে। স্বরভঙ্গি, আচার-আচরণ, হাবভাব সব কিছুই এক রকমের। মানুষের সঙ্গে বাঁদরের যেমন সাদৃশ্য, এ সাদৃশ্যও ঠিক তেমনি। কিন্তু কিছুটা বিকৃতি থাকলেও বা

বিরক্তিকর বলে মনে হলেও, তার অনেক ছোট ছোট অভ্যেসই ওর মধ্যে রয়েছে—তার রক্তেই ওর সৃষ্টি। ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠা ওই সাংঘাতিক সাদৃশ্য আচমকা ব্যারনকে যেন উন্মাদ করে তুললো…দুঃস্বপ্ন অথবা তিক্ত মনস্তাপের মতো যন্ত্রণা দিতে লাগলো তাঁকে।

'তাহলে কবে আমরা একসঙ্গে জমিটা দেখবো?' কোনমতে প্রশ্ন করলেন ব্যারন।

'কেন—আপনার ইচ্ছে হলে আসছে কালই যাওয়া যাবে।'

'বেশ, তাহলে আসছে কাল। কখন?'

'একটার সময়।'

'ঠিক আছে।'

গাছ-গাছালিতে ছাওয়া রাস্তায় যে বাচ্চাটার সঙ্গে ব্যারনের আগেই দেখা হয়েছিলো, সে আচমকা দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকলো, 'বাবা!'

কেউই তার ডাকে সাড়া দিলো না।

পালিয়ে যাওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন মোঁরদিয়ান। 'বাবা' শব্দটা গুলির মতো আঘাত করেছিলো তাঁকে। রসুনের গন্ধে মেশা দক্ষিণী উচ্চারণে ওই 'বাবা' সম্বোধনের আসল লক্ষ্য যেন তিনি নিজেই, তাঁকে উদ্দেশ করেই ডাকা হয়েছে ওই নামে। ওঃ, ফেলে আসা দিনগুলোতে তাঁর প্রিয়তমার সৌরভ কত মনোরমই না ছিলো!

ডাচো তাকে এগিয়ে দিচ্ছিলো, ব্যারন শুধালেন, 'এ বাড়িটা কি আপনার?'

'হ্যাঁ স্যার, সবেমাত্র কিছুদিন হলো কিনেছি। এর জন্যে আমি গর্বিত। আমি স্যার ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্তান, এতে আমার কোন ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। কারুর কাছেই আমি ঋণী নই। আমি নিজের প্রচেষ্টায় বড় হয়েছি, কাজেই আমার ঋণ শুধু নিজের কাছে।'

দরজার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাটা ফের চিৎকার করে ওঠে, 'বাবা!' কণ্ঠস্বরটা এবার আরও দূর থেকে ভেসে আসে।

আতঙ্কে শিউরে উঠে প্রচণ্ড বিপদে পড়া মানুষের মতো পালিয়ে এলেন মোঁরদিয়ান। নিজের মনেই বললেন, 'হয়তো ও বুঝতে পারবে, আমি কে। আর তাহলেই আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে 'বাবা' বলে ডাকবে, রসুনের বোঁটকা গন্ধসুদ্ধ চুমু দেবে'।

'তাহলে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবো, স্যার।'

'হ্যাঁ, আসছে কাল। একটার সময়।'

সাদা রাস্তা ধরে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে গড়িয়ে যাচ্ছিলো গাড়িটা।

'কোচোয়ান, আমাকে স্টেশনে নিয়ে চলো,' চিৎকার করে বললেন ব্যারন। অথচ তখন একই সঙ্গে দুটো ভিন্ন ভিন্ন স্বর তাঁর কানে এসে বাজছিলো। একটা ক্ষীণ মিষ্টি স্বর ভেসে আসছিলো অনেক দূরের পথ পেরিয়ে—বলছিলো, 'প্রিয় আমার!' আর একটা কর্কশ ধাতব স্বর চিৎকার করছিলো, 'বাবা!' বলছিলো ঠিক যেমন করে চোর পালালে মানুষ 'ধর ধর' বলে চিৎকার করে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি ক্লাবে আসতেই কাউণ্ট গু এত্রেলী বললেন, 'তিন তিনটে দিন আপনাকে আমরা দেখিনি। অসুস্থ ছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, খুব একটা সুস্থ ছিলাম না। মাঝেমধ্যেই মাথা ধরায় ভুগি কিনা!'

সেদিন সমুদ্র সৈকতের এক কেতাদুরস্ত স্নানের জায়গায় পারীর সুপরিচিতা সুন্দরী এক মোহময়ী তরুণী—সর্বজনীন প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্রীকে লক্ষ্য করতে করতে এই ভয়ঙ্কর কাহিনী এবং এই সাংঘাতিক মহিলার কথা আমার মনে পড়ে গেলো।

গল্পটার বয়েস এখন অনেক, কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা ভোলা যায় না।

আমার এক বন্ধু ছোট্ট একটা মফস্বল শহরে তার সঙ্গে আমাকে থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। জেলার গৌরব বোঝানোর জন্যে বন্ধুটি আমাকে নিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দেখালো সমস্ত সেরা সেরা জিনিস—মস্ত মস্ত জমিদার বাড়ি আর প্রাসাদ দুর্গ, স্থানীয় কলকারখানা আর ধ্বংসস্তূপগুলো। দেখালো স্মৃতিস্তম্ভগুলি, প্রাচীন কারুকাজ করা সমস্ত দরওয়াজা, অসাধারণ দীর্ঘ মাপের যত বনস্পতি, সেন্ট অ্যাণ্ড্রুর ওক আর রোকবোইজের ইউ গাছ।

উৎসাহ আর উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তি সহ জেলার সমস্ত দর্শনীয় বস্তুগুলোই যখন আমি দেখে শেষ করে ফেললাম, তখন বন্ধুটি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলো যে আর কিছুই দেখার নেই। শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম, তাহলে এবারে অন্তত গাছের ছায়ায় দুদণ্ড বিশ্রাম নিতে পারবো। কিন্তু হঠাৎ বন্ধুটি ফের উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, 'আরে, আরও একটা জিনিস রয়েছে! দানবদের মাকে তো দেখানো হয়নি!'

'কাকে?' প্রশ্ন করলাম, 'দানবদের মা?'

'হ্যাঁ, সে এক ভয়ঙ্কর মহিলা!' বন্ধুটি জবাব দিলো, 'একেবারে সাক্ষাৎ ডাইনী! প্রতি বছর সে সচেষ্টভাবে বীভৎস সমস্ত বিকৃতদেহ সন্তানের জন্ম দেয়—তারপর প্রদর্শনীর লোকদের কাছে তাদের বিক্রী করে। যে সব লোকেরা ওই সাংঘাতিক ব্যবসা করে তারা প্রায়ই ঘুরে-ফিরে দেখতে আসে, মহিলা নতুন কারোর জন্ম দিলো কিনা। দেখে তাঁদের যদি পছন্দ হয়, তবে তারা মাকে দাম মিটিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে যায়। মহিলা আজ অব্দি এগারোটা ওমনি জীবের জন্ম দিয়েছে। এখন সে বড়োলোক।

'তুমি হয়তো ভাবছো আমি ঠাট্টা করছি বা বানিয়ে বলছি কিংবা বেশি রঙ চড়িয়ে বলছি। না বন্ধু, আমি সত্যি কথাটাই বলছি—একেবারে নির্ভেজাল সত্যি।

'এসো, মহিলাটিকে দেখবে এসো। তারপর তোমাকে বলবো, কি করে সে অমন একটা দানব তৈরীর কারখানা হয়ে উঠলো।'

বন্ধুটি আমাকে শহরের উপান্তে নিয়ে গেলো।

রাস্তার ধারে সুন্দর একটা ছোট্ট বাড়িতে মহিলাটির বাস। ভারি ছিমছাম সাজানো-গোছানো বাড়ি। বাগানটা ফুলে ভরা, বাতাসে তার সুগন্ধ। যে কেউ এটাকে একজন অবসরপ্রাপ্ত উকিলের বাড়ি বলে ধরে নেবে।

একটি চাকর আমাদের ছোট্ট বৈঠকখানা ঘরটাতে নিয়ে এলো এবং তারপরেই সেই হতচ্ছাড়ি জীবটির আবির্ভাব হলো। মহিলাটির বয়েস প্রায় চল্লিশ, দীর্ঘাঙ্গী, শক্তসমর্থ পেশীবহুল শরীর, সত্যিকারের হৃষ্টপুষ্ট চাষী মেয়েদের মতো চেহারা— অর্ধেক পশু অর্ধেক মানবী।

মহিলা তার প্রতি আমাদের মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই যেন নিতান্ত অবমানিতভাবেই আমাদের আপ্যায়ন করলো।

'ভদ্রমহোদয়গণের কি প্রয়োজন?' জানতে চাইলো সে।

আমার বন্ধুটি জবাব দিলো, 'শুনলাম আপনার শেষ সন্তানটি নাকি আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মতোই দেখতে হয়েছে, অন্তত তার ভাইদের মতো হয়নি। আমি সেটা যাচাই করতে চাইছিলাম। কথাটা কি সত্যি?'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একঝলক তাকিয়ে মহিলা জবাব দিলো, 'না মশাই, তা নয়! অন্যদের চাইতে এ ছেলেটা আরও কুৎসিত, আরও ভয়ানক। সবই আমার কপাল, তাই বারবারই এমন হচ্ছে। আমার মতো একটা হতভাগী, যে সমস্ত পৃথিবীতে একেবারে একা, তার ওপরে ঈশ্বর যে কেমন করে এত নিষ্ঠুর হন!'

দ্রুত কথাগুলো বললো মহিলা। চোখ দুটি নিচের দিকে নামানো। কিন্তু ভণ্ডামি সত্ত্বেও ওকে লাগছিলো ঠিক ভয়-পাওয়া জন্তুর মতো। গলার কর্কশ স্বর নরম করেই ও কথাগুলো বলেছিলো। কিন্তু ওই বিশাল শক্ত হাড়ের চেহারায় যেন হিংস্র অঙ্গভঙ্গি আর নেকড়েসুলভ গর্জনই ভালো মানায়। তাই ওর অশ্রুমুখী করুণ আর্তি শুনতে কেমন যেন অবাক লাগছিলো।

'আপনার বাচ্চাটাকে আমরা দেখতে চাই,' বন্ধুটি বললো।

মহিলা যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। নাকি সে আমার ভুল? কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর চড়া গলায় সে জিজ্ঞেস করলো, 'দেখে আপনাদের কি লাভ হবে?' তারপর মাথা তুলে একঝলক জলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো আমাদের দিকে।

'কিন্তু আমাদেরই বা দেখাতে চাইছেন না কেন?' বন্ধুটি বললো, 'অনেককেই তো দেখান। বুঝতেই পারছেন, আমি কাদের কথা বলছি।'

এবারে উঠে দাঁড়িয়ে ভারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করে মহিলা, 'তাহলে এই জন্যেই আপনারা এসেছেন, তাই না? আমাকে অপমান করার মতলবে? কারণ আমার বাচ্চারা জন্তুদের মতো দেখতে? না, কিছুতেই আপনারা ওদের দেখতে পাবেন না···না, না, না—কক্ষনো না। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে। আপনাদের সকলকে আমি চিনি—সব কটা লোককে···শুধু আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কষ্ট দেওয়া!'

দুই নিতম্বে দু হাত রেখে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে সে। আর তখনই তার পাশবিক চিৎকারকে ছাপিয়ে পাশের ঘর থেকে কেমন যেন একটা বিজাতীয় গোঙানির শব্দ অথবা বেড়ালের ডাক কিংবা পাগলের চিৎকারের মতো আওয়াজ ভেসে আসে। আমার মজ্জা অব্দি শিউরে ওঠে। ওর কাছ থেকে পেছিয়ে আসি আমরা।

বন্ধুটি কঠিন গলায় ওকে সতর্ক করে দিলো, 'সাবধান, রাক্ষসী ডাইনী—' সবাই ওকে ডাইনীই বলতো—'একদিন এতে তোর সর্বনাশ হবে।'

মেয়েমানুষটা রাগে কাঁপতে কাঁপতে হাত নেড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'কিসে আমার সর্বনাশ হবে, শুনি? বেরিয়ে যা এখান থেকে, হতচ্ছাড়া ইতর পশুর দল!'

আমাদের ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়ছিলো সে। আমরাও পালিয়ে এলাম, ভয়ে আমাদের হৃৎপিণ্ড দুটো কুঁকড়ে উঠেছে তখন।

দরজার বাইরে এসে বন্ধুবর বললো, 'তাহলে ওকে তো তুমি দেখলে। এবারে ওকে কি বলবে, বলো।'

বললাম, 'পশুটার সমস্ত ঘটনা আমাকে বলো।'

উঁচু রাস্তার দুধারে পাকা শস্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেতের ওপর দিয়ে তখন শান্ত সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের মতো হালকা হাওয়ার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। সেই রাস্তা দিয়ে ফিরে আসার সময় বন্ধুটি আমাকে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলো।

একসময় মেয়েটি একটা খামারে কাজ করতো। কাজকর্মে মেয়েটি ছিলো চমৎকার, আচার-ব্যবহারে সংযত আর ভারি সাবধানী। ওর কোন প্রেমিক ছিলো বলে জানা যায়নি, আর সে ধরনের কোন দুর্বলতা ওর ছিলো বলেও কেউ

কখনো সন্দেহ করতো না।

কিন্তু একদিন ফসল কাটার রাতে বাতাসে যখন ছুরির মতো উষ্ণতা, ছেলে-মেয়েদের বাদামী শরীরগুলো যখন ঘামে ভিজে টসটসে হয়ে উঠেছে—তখন অন্ত সকলের মতো মেঘলা আকাশের নিচে শস্তের গাদার ওপরে ওরও পদস্খলন হলো। সামান্য কিছুদিন পরেই ও বুঝতে পারলো, ওর পেটে সন্তান এসেছে। লজ্জা আর আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে উঠলো মেয়েটি। তারপর কলঙ্ক লুকিয়ে রাখার জন্তে এক মারাত্মক উপায় বের করলো—কাঠ আর দড়ি দিয়ে জোর করে ঠেসে বেঁধে রাখলো পেটটাকে। বাচ্চাটা যতই বড় হতে থাকে, বাঁধনটা ও ততই শক্ত করে এঁটে দেয়। যন্ত্রণায় অধীর হলেও পাছে কেউ লক্ষ্য করে অথবা সন্দেহ করে কিছু, সে জন্তে সব সময়েই ও কাজকর্ম করতো আর হাসি মুখে থাকতো।

ক্রমশ মারাত্মক যন্ত্রটার সর্বনাশা চাপে নিজের ভেতরকার প্রাণসত্তাটাকে ও বিকৃত আর পঙ্গু করে তোলে। খুলিটা প্রায় চ্যাপটা হয়ে একটা বিন্দুতে এসে ঠেকে, বিশাল দুটো চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে ঠিক কপাল থেকে। হাত-পাগুলো ভেঙে দুমড়ে আঙুর-লতার মতো মিশে থাকে দেহকাণ্ডের সঙ্গে, হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক লম্বা। হাত আর পায়ের আঙুলগুলো যেন মাকড়সার পা। ওদিকে ধড়টা একে-বারে ছোট্ট আর বাদামের মতো গোল।

বসন্তের এক প্রভাতে খোলা মাঠের মধ্যে শিশুটার জন্ম দিলো মেয়েটি।

মাঠে আগাছা সাফ করার কাজে ব্যস্ত যে সব মেয়েরা ওকে সাহায্য করার জন্তে ছুটে এসেছিলো, তারা জন্তুর মতো বীভৎস ওই নবজাতকের আগমন দেখে চিৎকার তুলে পালিয়ে গেলো। দেখতে দেখতে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে মেয়েটা একটা দানবের জন্ম দিয়েছে। সেই থেকে ওর নাম হলো, ডাইনী।

মেয়েটির চাকরি গেলো। অন্তের দয়ার ওপরেই বেঁচে রইলো ও—কিংবা হয়তো বেঁচে রইলো গোপন প্রেমিকদের ওপরে নির্ভর করে। কারণ ও ছিলো সুন্দরী, আর সব পুরুষমানুষই তো নরককে ভয় পায় না!

আন্তরিক ঘৃণা করা সত্ত্বেও ওই দানবটাকে লালনপালন করতো মেয়েটি। তবে আইনের চোখে অপরাধী হবার ভয় না থাকলে হয়তো সেটাকে ও গলা টিপেই খুন করে ফেলতো।

অবশেষে এক যাযাবরের দল এই আজব শিশুর খবর শুনে, তাকে পছন্দ হলে নিয়ে যাবার মতলবে, দেখতে এলো। শিশুটাকে দেখে পছন্দ হলো তাদের এবং

তার বিনিময়ে শিশুর মাকে পাঁচশো ফ্রাঁ দাম ধরে দিলো তারা। এমন একটা বিকৃত শিশুকে দেখাতে হবে বলে প্রথমটাতে লজ্জা পেয়েছিলো মেয়েটি। কিন্তু যখন সে বুঝলো যে বাচ্চাটাকে ওরা চায়, বাচ্চাটার দাম আছে—তখন ওই নিয়ে সে দরাদরি শুরু করলো, প্রতিটি আধলার জন্যে তর্ক তুললো, বাচ্চাটার বিকৃতির কথা বলে ওদের উত্তেজিত করে চাষী সুলভ গোঁতোমির সাহায্যে দর বাড়িয়ে তুললো। পাছে নিজে প্রতারিত হয়, সেজন্যে ওদের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নিলো মেয়েটি। ওরা যেন জন্তুটাকে চাকরিতে নিয়েছে, এই হিসেবে মেয়েটিকে ওরা বার্ষিক চারশো ফ্রাঁ বাড়তি দিতেও রাজী হয়ে গেলো।

অভাবিত এই সৌভাগ্যই মেয়েটিকে খেপিয়ে তোলে এবং সেই থেকে এ ধরনের জীবের জন্ম দিতে সে কখনো বিগতস্পৃহ হয়নি, কারণ এর মাধ্যমে সমাজের উঁচু তলার বাসীন্দাদের মতো ওরও একটা স্থায়ী আয়ের বন্দোবস্ত হবে। অঢেল উর্বরতা থাকার দরুন ওর সে আশা সফল হলো এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পেটের চাপে রকম-ফের ঘটিয়ে দানবগুলোর দৈহিক আকৃতির তারতম্য ঘটাতেও বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলো। কেউ হলো লম্বা, কেউ বা বেঁটে। কতকগুলো হলো কাঁকড়ার মতো, অন্যগুলো গিরগিটির মতো। দেশের আইন এতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হলো না। পরম শান্তিতে সে তার আজব জীব সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো।

এখন ওর এগারোটি সন্তান জীবিত, প্রতি বছর তারা ওকে পাঁচ থেকে ছ হাজার ফ্রাঁ এনে দেয়। শুধুমাত্র একটা বাচ্চারই এখন পর্যন্ত কোন হিল্লে হয়নি, যেটাকে ও আমাদের দেখাতে চায়নি। কিন্তু বেশিদিন ও সেটাকে নিজের কাছে রাখবে না। কারণ যত রাজ্যের সার্কাস দলের মালিক—সবাই ওকে চেনে। মাঝে-মাঝেই তারা এসে খোঁজ নিয়ে যায়, ওর আবার নতুন কিছু হলো কি না। এমন কি প্রয়োজন বুঝলে তাদের মধ্যে ও নিলাম করার বন্দোবস্তও করে।

গল্প শেষ করে বন্ধুটি চুপ করলো। প্রচণ্ড বিরক্তি আর হিংস্র ক্রোধে সমস্ত মন ভরে উঠলো আমার। আপসোস হলো কেন ওই বর্বর মেয়েমানুষটাকে আমি আমার নিজের হাতে গলা টিপে খুন করিনি।

'তাহলে ওদের বাবা কে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তা কেউ জানে না,' জবাব দিলো বন্ধুটি। 'সে বা তারা আড়ালেই থাকে। কে জানে, হয়তো তারাও ওই দুষ্কর্মের অংশীদার!'

সেদিন এক কেতাদুরস্ত পানের জায়গায় এক সুন্দরী মোহময়ী তরুণীকে না দেখা পর্যন্ত ওই ঘটনাটা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি। মহিলাটিকে ঘিরে গাদাগুচ্ছের স্তাবক, সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

স্থানীয় এক ডাক্তার বন্ধুর হাতে হাত মিলিয়ে আমি ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম। দশ মিনিট পরে লক্ষ্য করলাম, একটি ধাই-মেয়ে বালিতে গড়াগড়ি করা তিনটে শিশুকে আগলাচ্ছে আর একজোড়া ছোট্ট করুণ ক্রাচ পড়ে রয়েছে একধারে। তখন অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, তিনটে শিশুই বিকলাঙ্গ, ভাঙাচোরা দেহ—কুঁজো আর খোঁড়া। একেবারে ভয়ঙ্কর তিনটি জীব!

ডাক্তারটি বললো, 'এইমাত্র যে সুন্দরী মহিলাটিকে দেখলে, ওরা তারই সন্তান।'

মহিলা এবং বাচ্চাগুলোর জন্যে নিবিড় করুণায় মন ভরে উঠলো আমার। বললাম, 'হায় রে, বেচারী মা! কি করে এখনও উনি হাসেন?'

'মহিলাটির জন্যে দরদ দেখিয়ো না, বন্ধু,' ডাক্তার বললো। 'দরদ দেখানো উচিত হতভাগা বাচ্চাগুলোকে। মহিলা জীবনের শেষদিন অব্দি শরীরের জেল্লা বজায় রাখার জন্যে যা করেন, তার ফলেই ওদের ওই দশা হয়েছে। গর্ভবতী অবস্থায় পেটে শক্ত পোশাকের বাঁধন পরার জন্যেই ওই দানবদের সৃষ্টি। মহিলাটি ভালোমতোই জানেন যে এ খেলায় উনি জীবনের ওপরে ঝুঁকি নিচ্ছেন। কিন্তু যতদিন সুন্দরী আর আকর্ষণীয়া থাকা যায়, ততদিন ওর পরোয়া কিসের?'

এবং তখনই সেই চাষী মহিলার কথা মনে পড়লো আমার—সেই ডাইনী, যে তার সন্তানদের বিক্রি করে দিতো।

একেবারে রাজধানীতেই বিরাট এক দুঃসাহসী চুরির ঘটনা ঘটে গেলো। মণি-মাণিক্য, হীরে বসানো একটা ঘড়ি, নগদ টাকা—সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ এক লক্ষ পনেরো হাজার ফ্লোরিন। মহাজন ভদ্রলোক নিজেই পুলিসের বড় কর্তার কাছে গিয়ে চুরির সংবাদটা জানালেন এবং সেই সঙ্গে এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বললেন, তদন্তের কাজ যেন যথাসম্ভব গোপনেই করা হয়। কারণ এ ব্যাপারে বিশেষ করে কাউকেই তার সন্দেহ করার সামান্যতম কোন হেতু নেই এবং কোন নির্দোষ ব্যক্তি এতে অভিযুক্ত হয়, তা তিনি চান না।

'যারা নিয়মিতভাবে আপনার শোবার ঘরে গিয়ে থাকেন, প্রথমে আপনি তাদের নামগুলো আমাকে দিন,' পুলিসের বড় সাহেব বললেন।

'আমার স্ত্রী, ছেলেপুলে আর আমার চাকর জোসেফ ছাড়া আর কেউই যায় না। আমি নিজেকে যেমন বিশ্বাস করি, জোসেফকেও ঠিক ততখানিই বিশ্বাস করি।'

'তাহলে আপনার ধারণা, জোসেফের পক্ষে এ ধরনের কাজ করা কখনই সম্ভব নয়?'

'অবশ্যই আমি তাই মনে করি,' জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

'বেশ। তাহলে মনে করে দেখুন, যেদিন জিনিসগুলো খোয়া গেছে বলে আপনি প্রথম দেখলেন সেদিন কিংবা তার ঠিক আগের দিন, আপনার পরিবার-ভুক্ত কেউ নন এমন কেউ কোন কারণে আপনার শোবার ঘরে গিয়েছিলেন কি?'

এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললেন, 'নাঃ, কেউই যায়নি।'

ভদ্রলোকের ক্ষণিক-বিব্রত অবস্থা আর লজ্জার জন্যে লাল হয়ে ওঠা মুখ অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারের নজর এড়ালো না। তাই তিনি ভদ্রলোকের একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সরাসরি তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, 'আপনি আমার সঙ্গে ঠিক খোলা মনে কথা বলছেন না, কিছু লুকোতে চাইছেন। কিন্তু আমার কাছে সব কিছুই আপনাকে বলতে হবে।'

'না না, সত্যিই কেউ যায়নি।'

'তাহলে বর্তমানে একটি মাত্র মানুষই রয়েছে, যাকে সন্দেহ করা চলতে পারে। সে আপনার চাকর—জোসেফ।'

'আমি তার সততা সম্পর্কে জামিন রইলাম,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মহাজন ভদ্রলোক।

'কিন্তু হয়তো আপনি তাকে ভুল বুঝেছিলেন। কাজেই ওই ব্যক্তিটিকে আমি জেরা করতে চাই।'

'তাহলে যথাসম্ভব সহানুভূতি নিয়েই আপনি সে কাজ করবেন বলে আমি প্রার্থনা জানাতে পারি কি?'

'সে ব্যাপারে আপনি আমার ওপরে ভরসা রাখতে পারেন।'

এক ঘণ্টা পরে মহাজনের চাকরটি পুলিস-কর্তার খাসকামরায় গিয়ে ঢুকলো। পুলিসকর্তা তাকে খুঁটিয়ে দেখে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, এমন নিষ্কলুষ অবিব্রত মুখ আর এমন শান্ত স্থির চোখ সম্ভবত কোন অপরাধীর হতে পারে না।

'আমি কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, জানো?'

'না, হুজুর।'

'তোমার মনিবের বাড়িতে একটা বিরাট চুরি হয়ে গেছে।' কর্তাসাহেব বলে চললেন, 'চুরিটা হয়েছে তাঁর শোবার ঘর থেকে। তুমি কি সে ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করো? গত কয়েক দিন কে কে ওই ঘরে গিয়েছিলো?'

'আমি আর আমার কর্তার বাড়ির লোকজন ছাড়া আর কেউই যায়নি।'

'ভাখো বাছা, তুমি কি বুঝতে পারছো না যে ও কথা বলে তুমি সন্দেহটা নিজের ওপরেই ফেলছো?'

'আমি ঠিকই বলেছি হুজুর,' চাকরটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'আপনি বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু...'

'আমি কিছুই বিশ্বাস করবো না। আমার কাজই হচ্ছে, যদি আমি কোন সূত্র খুঁজে বের করতে পারি তবে সেটাকে শুধু তাড়া করে বেড়াবো আর তদন্ত করে দেখবো। গত কয়েক দিনে একমাত্র তুমিই যদি ওই ঘরে গিয়ে থাকো, তবে চুরির জন্যে আমি তোমাকেই দায়ী করবো।'

'আমার মনিব আমাকে চেনেন...'

পুলিস কর্তা দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন, 'তোমার মনিব তোমার সততা সম্পর্কে জামিন হয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে সেটাই যথেষ্ট নয়। আপাতত তুমিই এক-মাত্র মানুষ যাকে খানিকটা সন্দেহ করা চলে। কাজেই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে

তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।'

'তাই যদি হয়,' খানিকটা ইতস্তত করে লোকটা বললো, 'তাহলে আমি বরং সত্যি কথাটাই বলবো—কারণ চাকরির চাইতে আমার সুনাম বড়।...হ্যাঁ, গতকাল একজন আমার মনিবের ঘরে ঢুকেছিলো বটে।'

'এবং সেই একজন হচ্ছে...?'

'একটি মহিলা।'

'তোমার মনিবের পরিচিতা মহিলা?'

চাকরটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বললো, 'ঘটনাটা জানাতেই হচ্ছে।...আসলে আমার মনিবের একটি মেয়েমানুষ আছে—সোনার মতো চুল, সুন্দর মতো দেখতে...মানে বুঝতেই পারছেন, হুজুর। আমার কর্তা মেয়েমানুষটিকে একটা আলাদা বাড়ি সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছেন, সেখানেই উনি তার সঙ্গে দেখা করতে যান—কিন্তু গোপনে। কারণ আমার কর্তা-মা জানতে পারলে এক সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। এই মেয়েমানুষটিই গতকাল আমার কর্তার সঙ্গে ছিলেন।'

'শুধু ওঁরা দুজনেই ছিলেন?'

'মেয়েমানুষটিকে আমি পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম, কর্তার সঙ্গে উনি তাঁর শোবার ঘরেই ছিলেন। কিন্তু একটু পরেই কর্তাকে আমার ডাকতে হয়েছিলো, কারণ কর্তার একজন বিশ্বাসী লোক তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলো। কাজেই মেয়েমানুষটি প্রায় সিকি ঘণ্টা ও ঘরে একাই ছিলেন।'

'কি নাম, মহিলাটির?'

'সিসিলিয়া কে—, হাঙ্গেরির মেয়ে।' চাকরটা মেয়েটির ঠিকানাও জানিয়ে দিলো সেই সঙ্গে।

পুলিসের বড়সাহেব তখন মহাজন ব্যক্তিটিকে এত্তেলা পাঠালেন। চাকরের মুখোমুখি হয়ে তিনি তার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলেন, যা কিনা অভিযোগকারীর পক্ষেও বেদনাদায়ক হয়ে উঠলো। অতঃপর সিসিলিয়া কে—নাম্নী মহিলাকে হাজতে পোরার আদেশ দেওয়া হলো।

যে অফিসারটিকে ওই কাজের ভার দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো, সে আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ফিরে এসে জানালো, মহিলাটি আগের দিন সন্ধ্যাবেলাতেই তার ফ্ল্যাট এবং খুব সম্ভব রাজধানীও ছেড়ে চলে গেছে। হতভাগ্য মহাজন ব্যক্তিটির তখন প্রায় হতাশ হয়ে ওঠার মতো অবস্থা। তার যে অনুমান এক লাখ পনেরো

হাজার ক্রোরিনই চুরি গেছে, তা-ই নয়—সেই সঙ্গে ওই সুন্দরীটিকেও তিনি হারিয়েছেন, যাকে তিনি ভালবেসেছিলেন যথাসাধ্য আবেগ আর আসক্তি দিয়ে। যে রমণীকে তিনি প্রাচ্যদেশের বিলাস-বৈভবে ঘিরে রেখেছিলেন, যার প্রতিটি বিচিত্র খেয়াল তিনি পূরণ করেছেন অকৃপণভাবে, যার সমস্ত দৌরাত্ম্য তিনি সহ্য করেছেন পরম ধৈর্যে—সে যে কি করে এমন লজ্জাহীনার মতো তাঁকে প্রতারণা করতে পারে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। এখন এই ঘটনার ফলে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একচোট ঝগড়া হয়ে গেলো, শেষ হলো পারিবারিক সমস্ত সুখ-শান্তি।

পুলিস একমাত্র যে কাজটি করতে সক্ষম হলো, তা হচ্ছে মহিলাটির সম্পর্কে কিছুটা সোরগোল তোলা—কারণ মহিলা পালিয়ে গিয়ে নিজেই নিজেকে দোষী বলে জাহির করে ফেলেছে। কিন্তু সে সোরগোলে কোন লাভই হলো না। মহাজন ব্যক্তির মনে এখন প্রেমের বদলে ঘৃণা আর প্রতিশোধের তীব্র তৃষ্ণা। এই সুন্দরী অপরাধীটিকে বিচারের মুখোমুখি তুলে ধরতে সমস্ত রকম ভাবে চেষ্টা করার জন্যে বৃথাই তিনি পুলিসের বড়সাহেবকে প্ররোচনা জোগালেন। বড়-সাহেবও বৃথাই সমস্ত দায়িত্বের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, যাতে মেয়েটিকে শাস্তি দেবার বন্দোবস্ত করা যায়—তা সে শাস্তি যত কঠিনই হোক না কেন। বিশেষ পুলিস অফিসারদের বলা হলো, তারা যেন মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সিসিলিয়া কে—এতই নিষ্ঠুরা যে কারুর কাছেই সে নিজেকে ধরা দিলো না।

তিনটে বছর কেটে গেলো, সকলে যেন ভুলেই গেলো ওই অপ্রিয় কাহিনীটা। মহাজন ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে ক্ষমা আদায় করে ফেলেছেন, আর সেইসঙ্গে খুঁজে পেয়েছেন আরও একটি মনোহরা নাগরীকে। পুলিসও যেন ওই হাঙ্গেরীয় সুন্দরীর ব্যাপারে আর মাথা ঘামায় না বড় একটা।

এবারে কাহিনীর দৃশ্যান্তর হচ্ছে লণ্ডন শহরে। এক ধনবতী রমণী, যে সমাজে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তুলেছে, রূপ এবং অবাধ-স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে যে অনেক হৃদয়ই জয় করেছে—তার একটি সচিবের প্রয়োজন। আবেদনকারীদের মধ্যে একটি যুবাপুরুষ ছিলো যার সুন্দর চেহারা এবং ভদ্র আচরণ দেখে সকলেরই মনে হবে, লোকটা নিশ্চয়ই খুব শিক্ষিত। অন্তত মহিলার খাস-ঝিয়ের চোখে ব্যাপারটা সে রকমই ঠেকলো। তাই সে তক্ষুণি লোকটাকে তার কর্ত্রীঠাকরুনের খাস কামরায় নিয়ে গেলো।

ঘরে ঢুকে যুবকটি দেখলো, উত্তেজক শরীরের এক সুন্দরী নারী সোফার ওপরে শুয়ে রয়েছে। বয়েস বড়জোর পঁচিশ বছর, চোখ দুটি আয়ত-উজ্জ্বল, মাথার চুলগুলো ঘনশ্যাম-রঙা—যা তার সুগৌর দেহসুষমাকে যেন আরও প্রখর করে তুলেছে। যুবকটির দিকে তাকালো মেয়েটি। যুবকের মাথাতেও ঘন কালো চুলের রাশি। মেয়েটির সন্ধানী দৃষ্টির নিচে, মেঝের ওপরে নিজের দীপ্ত দুটি কালো চোখ নামিয়ে আনলো সে—স্পষ্টই তাতে পরিতৃপ্তির নিটোল চিহ্ন। মেয়েটি যেন বিশেষ করে তার খেলোয়াড়সুলভ ছিপছিপে অথচ সুগঠিত চেহারাটাতেই আকৃষ্ট হলো। তারপর আধো আলস্য-ভরে, আধো অহঙ্কারী সুরে শুধালো, 'কি নাম তোমার ?'

'লাজো মারিয়াসী।'

'হাঙ্গেরীর লোক ?' মেয়েটির দু চোখে এক বিচিত্র দৃষ্টি।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'এখানে এলে কি করে ?'

'আমি দেশ ছেড়ে আসা অসংখ্য বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে একজন। সৎ বংশের সন্তান—হনভেদের একজন অফিসার ছিলাম। এখন আমাকে যে কোন একটা চাকরি করতেই হবে। আপনার মতো সুন্দরী আর অভিজাত কোন মহিলাকে মনিব হিসেবে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবো।'

মিস জোই, অর্থাৎ সুন্দরী মেয়েটি, নিজের দুপাটি মুক্তোর মতো দাঁত দেখিয়ে মুচকি হাসলো।

'তোমাকে দেখেশুনে আমার পছন্দ হয়েছে,' বললো মেয়েটি। 'আমি তোমাকে কাজে নিতে চাই, অবশ্য তুমি যদি আমার শর্তে রাজী থাকো।'

'বড়লোক মেয়েমানুষের খেয়াল,' পুরুষভৃত্যের দিকে কর্ত্রীঠাকরুনকে আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঝিটা নিজের মনেই বললো, 'তবে কিনা ওসব শীগগিরই কেটে যাবে।'

কিন্তু অভিজ্ঞা হলেও ঝি কিন্তু এক্ষেত্রে ভুল করেছিলো। জোই সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো এবং লাজো যেরকম শ্রদ্ধাভরে ওর সঙ্গে ব্যবহার করতো তাতে ওর রীতিমতো মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ও ইতালীয় অপেরায় যাবে বলে ঠিক করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাড়ি ফিরিয়ে দিলো, ফিরিয়ে দিলো ওর এক ভক্ত প্রণয়ীকে—যে কিনা ওর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলো। তারপর সহিসকে ডেকে পাঠালো নিজের

খাস কামরায়।

বললো, 'লাজো, আমি তোমার ওপরে একটুও সন্তুষ্ট নই।'

'কেন, মাদাম?'

'আমি তোমাকে আর আমার কাজে রাখতে চাই না। এই রইলো তোমার তিন মাসের মাইনে, এক্ষুণি তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।' কথা শেষ করে ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে শুরু করলো জোই।

'আমি আপনার আদেশ পালন করবো মাদাম,' লাজো বললো, 'কিন্তু মাইনেটা আমি কিছুতেই নেবো না।'

'কেন নেবে না?' দ্রুত প্রশ্ন করলো জোই।

'কারণ তাহলে আরও তিনটে মাস আমি আপনার অধীনে থাকবো। কিন্তু আমি এই মুহূর্তেই মুক্ত হতে চাই—যাতে আমি আপনাকে বলতে পারি যে আপনার টাকার জন্যে আমি এ কাজে ঢুকিনি, ঢুকেছি একজন সুন্দরী মহিলা হিসেবে আপনাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি বলে।'

'তুমি আমাকে ভালবাসো!' উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে ওঠে জোই, 'এ কথা তুমি আরও আগে বলোনি কেন? আমিও যে তোমাকেই ভালবাসি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে ভালবাসো না—শুধু সেজন্যেই আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তুমি খুব চালাক, নিজেকে লুকিয়ে রেখে খুব জ্বালিয়েছো আমাকে। এসো, এক্ষুণি আমার পায়ের কাছে এসো!'

সহিস হাঁটু মুড়ে সুন্দরীর কাছে গিয়ে বসলো—ওর ভিজে ভিজে ঠোঁট দুখানি সেই মুহূর্তে ব্যাকুল হয়ে উঠলো লাজোর ঠোঁট দুটির প্রত্যাশায়।

তখন থেকে লাজোই হয়ে উঠলো ওর প্রিয়পাত্র। কিন্তু তাকে বলা হয়েছিলো, সে যেন ঈর্ষাতুর হয়ে না ওঠে। কারণ তখন পর্যন্ত একজন তরুণ লর্ডকেই সকলে জোইর প্রকৃত প্রেমিক বলে জানে—যে সানন্দে ওর সমস্ত খরচাই মিটিয়ে থাকে। তাছাড়া আরও ছিলো তথাকথিত খাঁটি বন্ধুর একটা পুরো দল—যারা মাঝেমধ্যে এক টুকরো হাসি কিংবা কখনো কখনো তার চাইতে একটু বেশি কিছু পেয়েই ধন্য হয়ে যায় এবং তার প্রতিদানে পেয়ে থাকে জোইকে দুর্লভ ফুল অথবা হীরের উপহার দেবার উদার অনুমতি।

ওরা যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে, ততই ওর দিকে লাজোর তাকানোর ভঙ্গিমা লক্ষ্য করে আরও বেশি করে অস্বস্তি অনুভব করে জোই। প্রায়ই অবিমিশ্র

ঘৃণার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে লাজো। জোই এখন সম্পূর্ণ লাজোর প্রভাবিত, তাকে ভয় করে ও।

একদিন ওর কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে লাজো ঠাট্টা করে বললো, 'লোকে বলে, সাধারণত উলটো জিনিসই একজনকে আর একজনের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তোমার চুলগুলো আমার চুলের মতোই কালো।'

মুচকি হেসে পরচুলাটা খুলে নেয় জোই, দেখা যায় ঝলমলে সাদা চুলের একটি মেয়ে বসে রয়েছে লাজোর পাশে। লাজো একমনে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে বিস্ময়ের কোন আভাস নেই।

মাঝরাত নাগাদ প্রেমিকার কাছ থেকে বিদায় নেয় লাজো, বলে যায় ঘোড়াগুলোকে একটি বার দেখেশুনে আসবে। সুন্দর একটা রাত্রিবাস পরে বিছানায় শুয়ে পড়ে জোই। প্রেমিকের প্রত্যাশায় পুরো একটি ঘণ্টা জেগে থাকে ও, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে। কিন্তু দু ঘণ্টার মধ্যে তন্দ্রা ভেঙে জেগে ওঠে ও, দেখতে পায় একজন পুলিস ইনসপেকটার আর দুটি সেপাই ওর রাজসিক বিছানাটার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কাকে চান আপনারা?' চিৎকার করে ওঠে জোই।

'সিসিলিয়া কে—'

'কিন্তু আমি মিস জোই।'

'জানি,' ইনসপেকটার মুচকি হেসে বললেন। 'দয়া করে আপনার কালো পরচুলাটা খুলে ফেলুন, তাহলেই আপনি সিসিলিয়া কে—হয়ে যাবেন। আইনের নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

'হে ভগবান! লাজো আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে!'

'আপনি ভুল করছেন, মাদাম।' ইনসপেকটার বললেন, 'সে শুধু নিজের কর্তব্যটুকুই করেছে।'

'কি? লাজো…আমার প্রেমিক?'

'না, লাজো—গোয়েন্দা।'

বিছানা থেকে উঠে এলো সিসিলিয়া, পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপরে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বড়বাবু ম্ঁ্যসিয় ল্যাঁতিন অফিসের ছোট বাবুর বাড়িতে এক সান্ধ্য চায়ের আসরে মেয়েটিকে প্রথম বার দেখেই প্রেমে মজেছিলেন। মেয়েটির বাবা ছিলেন গাঁয়ের একজন কর-আদায়কারি। কয়েক বছর আগে তিনি মারা যাবার পর, মার সঙ্গে পারীতে চলে এসেছে মেয়েটি। ওর জন্যে একটি সুপাত্রের সন্ধান পাবার আশায় ওর মা প্রতিবেশী কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করে-ছেন ইতিমধ্যে। ওরা গরীব কিন্তু ভারি সৎ, ভদ্র আর বিনয়ী।

মেয়েটি ছিলো সত্যিকারের নিষ্পাপ। প্রতিটি রুচিবান পুরুষই এমন মেয়ের কাছে একদিন নিজের জীবন সঁপে দেবার স্বপ্ন দেখে। ওর সহজ সৌন্দর্যের মাঝে যেন দেবোপম লাবণ্যের অপরূপ আভাস। দুখানি ঠোঁটের আঙিনায় সতত ছুঁয়ে যাওয়া দুর্বোধ্য হাসির ঝিলিকে ফুটে ওঠে ওর হৃদয়ের সার্থক ছবি। সকলেই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অক্লান্তভাবে সকলেই বলাবলি করে, 'এ মেয়েকে যে জয় করে নেবে, সে সত্যিকারের ভাগ্যবান পুরুষ। স্ত্রী হিসেবে এর চাইতে ভালো মেয়ে কেউ কোনদিনও খুঁজে পাবে না।'

ম্ঁ্যসিয় ল্যাঁতিনের বার্ষিক বেতন তিন হাজার পাঁচশো ফ্রাঁ। এ অবস্থায় তার পক্ষে বিয়ে করার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব মনে করে তিনি এই আদর্শ তরুণীটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন এবং তা মঞ্জুরও হলো। ওকে পেয়ে তার জীবনে সুখের সীমা পরিসীমা রইলো না। মেয়েটি এমন হিসেবী ভাবে সংসার চালাতে লাগলো যে দিব্যি বিলাসেই জীবন কাটতে লাগলো তাদের। স্বামীর দিকে মেয়েটির সর্বদা সজাগ দৃষ্টি, আদর যত্নের কোন বিরাম নেই এবং ওর ব্যক্তিত্ব এত সুমধুর যে বিয়ের ছ বছর পরেও ম্ঁ্যসিয় ল্যাঁতিন আবিষ্কার করলেন, এমন কি মধুচন্দ্রিমার প্রথম দিনগুলোর চাইতেও এখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে যেন আরও বেশি করে ভালবাসেন।

স্ত্রীর স্বভাবে শুধু দুটি মাত্র খুঁত দেখতে পান ম্ঁ্যসিয় ল্যাঁতিন: ওর থিয়েটার প্রীতি এবং নকল মণি-মুক্তোর প্রতি আসক্তি। ওর বান্ধবীরা (কয়েকজন ছোট-খাটো অফিসারের গিন্নীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো ওর) প্রায়ই ওর জন্যে কোন জনপ্রিয় নাটকের দামী টিকিট সংগ্রহ করে আনতো—এমন কি প্রথম অভিনয় রজনীর টিকিটও। স্বামী বেচারা এ সমস্ত আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করুক

বা না করুন, তাকে ও টেনে হিঁচড়ে ঠিক সঙ্গে করে নিয়ে যেতো—যদিও সমস্ত দিন খাটুনির পর এসব তাঁকে শুধুমাত্র অতিরিক্ত ক্লান্তই করে তুলতো। কিছু দিন পরে কোন পরিচিতা মহিলাকে নিয়ে থিয়েটারে যাবার জন্তে স্ত্রীকে মিনতি করতেন মঁ্যাসিয় লাঁতিন, যারা অভিনয়ের পর ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েটির ধারণা, স্বামী থাকতে অন্ত মহিলাদের সঙ্গে থিয়েটারে যাবার ব্যাপারটা ঠিক সম্মানজনক নয়। তবু স্বামীকে খুশী করার জন্তে শেষ পর্যন্ত ও তাতেই রাজী হতো, পতিদেবতাটিও কৃতজ্ঞ চিত্তে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন।

এই থিয়েটার-প্রীতি শীঘ্রিই মেয়েটির মনে নিজেকে দৈহিক দিক দিয়ে সাজিয়ে তোলার বাসনা জাগিয়ে তুললো। অবশ্য ওর পোশাক-আশাক সেই আগের মতো সহজ সাধারণ আর অকৃত্রিম রুচিসম্মতই রইলো এবং ওই সাদাসিধে পোশাক ওর অপরূপ রূপলাবণ্য আর দুর্নিবার হাস্তময় আকর্ষণকে যেন আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতো। কিন্তু শীঘ্রিই ওর কানে উঠলো নকল হীরের মস্ত দুল, যা সত্যিকারের হীরের মতোই ঝিলমিলিয়ে ওঠে। আর এলো ঝুটা মুক্তোর বালা, নকল সোনার ব্রেসলেট আর সত্যিকারের পাথরের মতো হালকা কাচ বসানো চিরুনি।

ওর এই নিজেকে জাহির করার প্রবৃত্তি দেখে আহত পতিদেবতাটি প্রায়ই বাধা দিয়ে বলতেন, 'প্রিয়ে, সত্যিকারের মণিমুক্তো কেনার সামর্থ্য যখন তোমার নেই, তখন একমাত্র রূপলাবণ্য আর নম্রতার গয়নাতেই তোমার নিজেকে হাজির করা উচিত। মেয়েদের পক্ষে সত্যিকারের অলঙ্কার কিন্তু তাই।'

মেয়েটি তাতে মিষ্টি হেসে বলতো, 'আমি কি করতে পারি? ওসব আমার ভালো লাগে যে। ওখানেই আমার একমাত্র দুর্বলতা। আমি জানি, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু স্বভাব যে পালটানো যায় না। আমার যদি গয়নাগাঁটি থাকতো, তা হলে কি ভালোই যে হতো!' তারপর মুক্তোর হারছড়া আঙুলে জড়াতো মেয়েটি, ঝিলমিলিয়ে উঠতো কাচের টুকরোগুলো। বলতো, 'ছাখো, কি সুন্দর বলো? যে কেউ দিব্যি কেটে বলবে, এগুলো আসল জিনিস।'

স্বামী হাসি মুখে বলতেন, 'যাই বলো সোনা, তোমার রুচি কিন্তু ঠিক জিপসীদের মতো।'

মাঝে-মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় আগুনের পাশে বসে গল্প-গুজব করার সময় মেয়েটি ওর চামড়ার বাক্সটা এনে সামনের ছোট্ট টেবিলটার ওপরে রাখতো, যার মধ্যে মঁ্যাসিয়র ভাষায় ওর 'ছাইভস্ম'গুলো পোরা থাকে। গভীর আগ্রহে ওগুলোকে পরখ

করে দেখতো ও, যেন ওগুলোর সঙ্গে ওর কোন গভীর-গোপন আনন্দ জড়ানো আছে। কখনও বা স্বামীর গলায় জোর করে একছড়া হার পরিয়ে দিয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠে বলতো, 'কি অদ্ভুত সঙের মতো লাগছে তোমাকে!' তার-পর ম্যঁসিয় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চুমু দিতো নিবিড় আশ্লেষে।

একদিন এক শীতের সন্ধ্যায় অপেরা দেখতে গিয়েছিলো ও, ফেরার সময় ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেললো ভীষণভাবে। পরদিন সকালে ও কাশতে শুরু করলো, আট দিনের মধ্যেই মারা গেলো ফুসফুসের প্রদাহে। ম্যঁসিয় লাঁতিন এতে এতই হতাশ হয়ে পড়লেন যে এক মাসের মধ্যেই তাঁর মাথার সব কটা চুল সাদা হয়ে গেলো। নিদারুণ বেদনায় তাঁর হৃদয় তখন বিদীর্ণ, কান্নারও কোন বিরাম নেই। পরলোকগতা স্ত্রীর স্মৃতি—তার হাসি, কণ্ঠস্বর, সৌন্দর্যের সুরভি—ম্যঁসিয়কে তাড়া করে বেড়াতে লাগলো অনুক্ষণ।

সর্বদুঃখহর সময়ও ম্যঁসিয় লাঁতিনের বেদনা দূর করতে পারলো না। প্রায়ই অফিসে সহকর্মীরা যখন সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতো তখন আচমকা তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠতো, মুখে বিষাদের কুঞ্চন রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতো, বেদনা ভাষা পেতো উদ্গত কান্নায়। মৃত্যুর আগে স্ত্রীর ঘরখানা যেমনটি ছিলো, এখনও সব কিছু ঠিক তেমনটিই রয়েছে। প্রতিদিন ওই ঘরটিতে একা একা বসে তিনি তাঁর স্ত্রীর কথা চিন্তা করেন—যে ছিলো তাঁর হৃদয়ের ঐশ্বর্য, বেঁচে থাকার আনন্দ।

কিন্তু শীঘ্রিই জীবনযাত্রা একেবারে জীবনসংগ্রাম হয়ে উঠলো। স্ত্রীর হাতে তাঁর যে আয়ে সংসারের সমস্ত খরচাই চলতো, এখন তাতে আর জীবনের সামান্যতম প্রয়োজনটুকুও মেটে না। ওই সামান্য রোজগার দিয়েই তাঁর স্ত্রী যে কি করে অমন চমৎকার মদ, অত সুন্দর টুকিটাকি জিনিস কিনতো—তা ম্যঁসিয় কিছুতেই ভেবে কোন কূলকিনারা পান না। দেখতে দেখতে কিছু ধার দেনা জমে উঠলো, দারিদ্র্যে একেবারে ডুবে গেলেন ম্যঁসিয় লাঁতিন। একদিন সকালে উঠে দেখলেন, পকেটে আর একটি আধলাও নেই—ভাবলেন, কিছু জিনিসপত্তর বিক্রি করে দেবেন। এবং ঠিক তক্ষুণি স্ত্রীর গিলটি করা গয়নাগুলো বিক্রি করার কথা মনে হলো তাঁর। ওগুলোর প্রতি তাঁর বরাবরের বিরক্তি, ওগুলো দেখলেই তাঁর হারানো প্রিয়ার স্মৃতি কেমন যেন বিষিয়ে ওঠে।

বাক্সমধ্যে গয়নাগুলোর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ম্যঁসিয় লাঁতিন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী ওগুলো কেনাকাটা করেছে, প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই

নিয়ে এসেছে একটা করে নতুন মাণিক। স্ত্রীর বড় সাধের ভারি নেকলেশটাই তিনি বিক্রি করবেন বলে ঠিক করলেন, যেটার দাম তাঁর মতে প্রায় ছ-সাত ফ্রাঁ তো হবেই—কারণ নকল জিনিস হলেও ওটার কারুকাজ ভারি সূক্ষ্ম আর সুন্দর।

হারটা পকেটে ফেলে একটা জহুরির দোকানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন ম্যঁসিয় লাঁতিন। প্রথমে যে দোকানটা চোখে পড়লো, সেটাতেই ঢুকে পড়লেন তিনি। নিজের দারিদ্র্য এভাবে প্রকাশ করার জন্যে এবং সব চাইতে বড় কথা, এ ধরনের একটা বাজে নকল জিনিস বিক্রি করতে আসার জন্যে খানিকটা সংকোচ লাগছিলো তাঁর। তবু দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এটার দাম কত হতে পারে একটু বলবেন?'

লোকটা হারটা নিয়ে আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো, একজন কর্মচারীকে ডেকে কি যেন বললো ফিসফিসিয়ে। তারপর ফের সেটাকে কাউণ্টারের ওপরে রেখে দিয়ে দূর থেকে দেখলে কেমন লাগে তা লক্ষ্য করতে লাগলো।

লোকটাকে জিনিসটা এমন বিশদভাবে পরীক্ষা করতে দেখে ম্যঁসিয় লাঁতিন ভীষণ বিব্রত বোধ করছিলেন। প্রায় বলেই ফেলছিলেন, 'আরে মশাই, আমি ভালো করেই জানি ওটার দাম তেমন একটা কিছু নয়!' কিন্তু লোকটা ঠিক তখনই বললো, 'এ হারটার দাম বারো থেকে পনেরো হাজার ফ্রাঁ। কিন্তু এটা আপনি কোত্থেকে পেলেন তা না জানলে তো আমি এটা কিনতে পারছি-না।'

ম্যঁসিয় লাঁতিনের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। দোকানদারের কথাগুলোর কোন অর্থই তিনি ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তবু অবশেষে হোঁচট খেতে খেতে বললেন, 'আপনি ...আপনি ঠিক বলছেন?'

'অন্য কেউ বেশি দিতে চায় কিনা আপনি যাচাই করে দেখতে পারেন,' লোকটা শুকনো গলায় বললো। 'তবে আমার ধারণা, এটার দাম বড় জোর পনেরো হাজার। আপনি তার চাইতে বেশি দর না পেলে, দয়া করে ফের এখানে আসবেন।'

বিস্ময়ে হতবাক ম্যঁসিয় লাঁতিন হারটা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্যে তিনি একটু সময় চাইছিলেন। কিন্তু বাইরে এসেই প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করলো তাঁর। নিজের মনেই বললেন, 'ব্যাটা বুদ্ধু! ওর কথা মেনে নিয়ে হারটা বিক্রিরি করে দিলে কেমন হতো! হতভাগা জহুরিটা

আসল আর নকল হীরের প্রভেদই জানে না।'

কয়েক মিনিট পরে র‍্যু দ্য লা পাইতে অন্ত একটা দোকানে ঢুকলেন লাঁতিন। দোকানের মালিক হারটা দেখেই চিৎকার করে উঠলো, 'কি কাণ্ড! এটা তো আমি ভালো করেই চিনি! এটা এখান থেকেই কেনা হয়েছিলো।'

বিব্রত লাঁতিন প্রশ্ন করলেন, 'এর দাম কত?'

'এটা আমি বিশ হাজার ফ্রাঁতে বিক্কিরি করেছিলুম। তবে আইনের রীতি-মাফিক আপনি কি করে এটা পেলেন তা জানালে, আমি আঠারো হাজারে ফের এটাকে কিনে নিতে রাজী আছি।'

এবারে ম্যঁসিয় লাঁতিনের স্রেফ কথা বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। কোন রকমে বললেন, 'কিন্তু...কিন্তু আপনি ওটা একটু ভালো করে যাচাই করে দেখুন। একটু আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো, ওটা নকল—রদ্দি জিনিস।'

'কি নাম আপনার, মশাই?' জহুরি জিজ্ঞেস করলো।

'লাঁতিন—আমি স্বরাষ্ট্র দফতরে কাজ করি। থাকি, ষোল নম্বর র‍্যু দে মারতাসে।'

দোকানী তার খাতাপত্র উলটে বললো, 'আঠারোশো ছিয়াত্তর সনের বিশে জুলাই তারিখে ওই হারটা মাদাম লাঁতিনের ঠিকানা, ষোল নম্বর র‍্যু দে মারতাসে পাঠানো হয়েছিলো।'

দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বিপত্নীক ভদ্রলোক বিস্ময়ে হতবাক, জহুরির চোখে সন্দেহের ছায়া। অবশেষে দ্বিতীয়জনই নীরবতা ভেঙে বললো, 'হারটা আপনি চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে এখানে রেখে যাবেন? আমি অবিশ্যি সে জন্যে আপনাকে একটা রসিদ দেবো।'

'নিশ্চয়ই,' দ্রুত জবাব দিলেন ম্যঁসিয় লাঁতিন। তারপর রসিদটা পকেটস্থ করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অনর্থক, মনে নিদারুণ বিভ্রান্তি। তাঁর নিজের এত দামী গয়না কেনার ক্ষমতা নেই। নিশ্চয়ই নেই। তাহলে?...তাহলে নিশ্চয়ই ওটা উপহার! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কে দিয়েছে ওই উপহার? তাঁর স্ত্রীকেই বা কেন দিয়েছে?

রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়ালেন লাঁতিন। এক নিদারুণ সন্দেহ তাঁর মনে জেগে উঠলো। তবে কি তাঁর স্ত্রী...? তাহলে অন্য গয়নাগুলোও নিশ্চয়ই প্রেমের উপহার! লাঁতিনের পায়ের নিচে পৃথিবী কেঁপে উঠলো, সামনের গাছটা যেন ভেঙে পড়তে লাগলো—শূন্যে দু হাত ছুঁড়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

জ্ঞান হলো একটা ডাক্তারখানায়, পথচারীরা সেখানে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলো। তারাই তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিলো। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে, মুখে রুমাল পুরে, অনেকক্ষণ অঝোরে কাঁদলেন তিনি। তারপর সন্ধ্যা ঘনাতে শ্রান্তক্লান্ত শরীরটাকে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে একটা স্বস্তিহীন দীর্ঘ রাত ছটফট করে কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি অফিসের জন্যে তৈরী হয়ে নিলেন। কিন্তু এমন একটা আঘাতের পর কাজকর্ম করা রীতিমতো কঠিন। তাই তাঁর বড়সাহেবের কাছে ছুটির জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তারপরেই মনে পড়লো, তাঁকে জহুরির কাছে যেতে হবে। কাজটা তাঁর আদপেই পছন্দ নয়, কিন্তু তাই বলে হারছড়া ওই লোকটার কাছেও ফেলে রাখা চলে না। তাই পোশাক পরে বেরিয়েই পড়লেন।

দিনটা চমৎকার। সুনির্মল, হাসি-ঝলমলে আকাশের নিচে কর্মচঞ্চল শহর। পকেটে হাত পুরে নিরুদ্বেগ মানুষেরা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে ইচ্ছেমতো। ওদের দেখে ম্যঁসিয় লাঁতিন নিজের মনেই বললেন, 'বড়লোকেরা সত্যিই সুখী। টাকা থাকলে সব চাইতে গভীর দুঃখকেও ভুলে যাওয়া যায়। টাকা থাকলে ঘুরে বেড়ানো যায় ইচ্ছেমতো, যা দুঃখ ভুলিয়ে দেবার পক্ষে একেবারে অব্যর্থ মহৌষধ। ইস্, যদি বড়লোক হতাম!'

ম্যঁসিয় লাঁতিন খিদে অনুভব করতে শুরু করলেন, কিন্তু পকেট শূন্য। ফের হারছড়ার কথা মনে পড়লো তাঁর। আঠারো হাজার ফ্রাঁ! আ-ঠা-রো হাজার! কত্তো টাকা!

শীগ্রিই রু দ্য লা পাই-তে একটা জহুরির দোকানের উলটো দিকে এসে হাজির হলেন তিনি। অন্তত বার কুড়ি ভেতরে ঢুকবেন বলে মনস্থিরও করে ফেললেন, কিন্তু প্রচণ্ড লজ্জায় কিছুতেই ঢুকতে পারলেন না। পেটে খিদে—ভীষণ খিদে, অথচ পকেটে একটা আধলাও নেই। অবশেষে মনকে আর কিছু ভাববার অবকাশ না দিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে দোকানে ঢুকে পড়লেন লাঁতিন।

দোকানের মালিক তক্ষুনি ব্যস্তসমস্তভাবে এগিয়ে এসে বিনীত ভঙ্গিমায় তাঁকে একখানা কুর্সি এগিয়ে দিলো। অন্যান্য কর্মচারীদের চোখেও আপ্যায়নের ছোঁয়া।

'ম্যঁসিয় লাঁতিন, আমি সমস্ত কিছু খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি,' দোকানদার বললো। 'আপনি যদি এখনও ওটা বিক্রি করবেন বলে মনে করে থাকেন,

তবে আমি আপনাকে যে দাম বলেছিলাম সে দামেই ওটা কিনে নিতে রাজী আছি। আপনি রাজী ?'

'অবশ্যই,' স্খলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন ম্যঁসিয় লাঁতিন।

দোকানের মালিক একটা দেরাজ থেকে আঠারোখানা বড় বড় নোট বের করে গুনে গুনে ম্যঁসিয় লাঁতিনের হাতে তুলে দিলো। লাঁতিন একখানা রসিদে সই করে কাঁপা কাঁপা হাতে নোটগুলো পকেটস্থ করলেন। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ফের ঘুরে তাকালেন দোকানীর দিকে। লোকটার মুখে তখনও সেই পরিচিত হাসির ছোঁয়া। লাঁতিন বললেন, 'দেখুন, ওই একইভাবে আমি আরও কিছু মণিমুক্তো পেয়েছি। আপনি কি সেগুলোও কিনবেন ?'

'নিশ্চয়ই কিনবো, স্যার,' অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথা নিচু করে বললো দোকানী।

কর্মচারীদের মধ্যে একজন হাসি সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি অন্য জায়গায় চলে গেলো। আর একজন নাক ঝাড়লো শব্দ করে।

লজ্জায় লাল হয়ে লাঁতিন গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে সেগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসবো।'

গয়নাগুলো নিয়ে আসার জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করলেন লাঁতিন। ঘণ্টাখানেক বাদে যখন তিনি দোকানে ফিরে এলেন, তখনও তাঁর সকালবেলাকার জলখাবার খাওয়া হয়নি। দোকানের প্রায় সমস্ত কর্মচারীরাই এক জায়গায় এসে জমায়েত হলো, প্রতিটা অলঙ্কার যাচাই করে আলাদা আলাদাভাবে দাম ঠিক করতে লাগলো তারা। লাঁতিন এবার রীতিমতো দরাদরি শুরু করে দিলেন, মেজাজ উঠলো চড়ে, ওদের বিক্রির নথিপত্র দেখাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তিনি। দর যতই বাড়ে, তাঁর মেজাজও বাড়ে ততটা।

হীরের বড় দুলজোড়ার দাম ঠিক হলো কুড়ি হাজার ফ্রাঁ। ব্রেসলেট পঁয়ত্রিশ হাজার। আংটি, ব্রোচ, নক্সাদার লকেটগুলো ষোলো হাজার। পান্না ও নীলার একটা অলঙ্কার চোদ্দ হাজার। পাথর-বসানো লকেটসুদ্ধ একটা সোনার হার চল্লিশ হাজার। এ ছাড়া সব কিছু মিলিয়ে দাম দাঁড়ালো মোট একশো ছিয়ানব্বই হাজার ফ্রাঁ।

জহুরি ঠাট্টা করে বললো, 'মহিলা তাঁর সমস্ত সঞ্চয়ই এই দামী পাথরগুলোর পেছনে ঢেলেছিলেন।'

'সম্পত্তি খাটাবার এটাও একটা পথ,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন লাঁতিন।

পরদিন আরও একজন বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া হবে—দোকানীর সঙ্গে সেই রকম বন্দোবস্ত করে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

রাস্তায় বেরিয়ে কর্নেল ভাঁদোমের মূর্তিটার দিকে তাকালেন লাঁতিন। বাচ্চাদের মতো তাঁরও ইচ্ছে হলো ওই মূর্তিটা বেয়ে উঠে যেতে—যেন ওটা একটা তেলতেলে থাম। মনে এতই খুশি যে ভাবলেন, আকাশের দিকে উঠে যাওয়া সম্রাটের মূর্তিটাকেও তিনি ব্যাঙের মতো লাফিয়ে পেরোতে পারেন। ভোয়াসিঁতে খাওয়া সেরে বোতল প্রতি বিশ ক্রাঁ দামের মদ খেলেন প্রাণ ভরে। তারপর একটা গাড়ি ভাড়া করে চক্কর কাটতে লাগলেন বয়ার চারদিকে। প্রতিটি পথচারীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তাঁর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিলো, 'দেখে নাও হে তোমরা, আমি একজন বিরাট ধনী মানুষ। আমার দাম দুশো হাজার ক্রাঁ।'

হঠাৎ মন্ত্রণালয়ের কথা মনে পড়লো তাঁর। গাড়ি হাঁকিয়ে অফিসে পৌঁছে সোজা তিনি বড়সাহেবের ঘরে ঢুকে বললেন, 'স্যার, এইমাত্র আমি উত্তরাধীকার-সূত্রে তিনশো হাজার ক্রাঁ পেয়েছি। তাই চাকরিটা ছেড়ে দিতে এলাম।'

পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের কাছে শুধু নিজের নতুন জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু পরিকল্পনার কথাই বললেন ম্যঁসিয় লাঁতিন। তারপর ডিনার খেতে গেলেন কাফে আঁগলেতে। সেখানে তাঁর পাশে একটি অভিজাত ভদ্র-লোককে তিনি খানিকটা গর্বের সঙ্গে না জানিয়ে পারলেন না যে, এইমাত্র তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে চারশো হাজার ক্রাঁর এক সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন।

জীবনে এই প্রথম থিয়েটার দেখতে লাঁতিনের বিরক্ত লাগলো না। তারপর বাকি রাতটুকু তিনি কয়েকজন মেয়েমানুষের সঙ্গে আনন্দ ফূর্তিতে কাটিয়ে দিলেন।

ছ মাস পরেই ফের বিয়ে করলেন ম্যঁসিয় লাঁতিন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি চরিত্রে সতীসাধ্বী, কিন্তু ভীষণ মুখরা। তার জন্যে অনেক যন্ত্রণা পোয়াতে হয়েছে ম্যঁসিয় লাঁতিনকে।

মাদাম চাসেলের কৌঁসুলী তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন : 'ধর্মাবতার এবং মাননীয় জুরিবৃন্দ, আপনাদের সামনে যে মামলার পক্ষ সমর্থনের জন্যে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে তাকে ন্যায়বিচারের চাইতে বরঞ্চ ভেষজ প্রয়োগেই অধিক সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা চলে। সাধারণ আইনগত মামলার চাইতে এটা বরং অনেকটাই রোগবিদ্যাগত ঘটনা। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে বিষয়টা সহজ ও সরল বলেই মনে হয়।

'যথেষ্ট বিত্তবান, উচ্চমনা, উদার হৃদয় এবং উৎসাহী চরিত্রের এক তরুণ অপরূপ সুন্দরী, প্রশংসাযোগ্যা, মোহময়ী এবং কোমল হৃদয়ের এক তরুণীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে। কিছুদিন পর্যন্ত মেয়েটির সঙ্গে সে ব্যগ্র এবং প্রেমময় স্বামীর মতোই ব্যবহার করতো। তারপর শুরু হয় অবহেলা ও পীড়ন—যেন মেয়েটির প্রতি প্রচণ্ড পরিমাণে বিরূপ ও বিগতস্পৃহ হয়ে ওঠে সে। এমন কি একদিন শুধুমাত্র বিনা অধিকারেই নয়, বিনা কারণেও—সে ওকে প্রহার করে।

'ভদ্রমহোদয়গণ, তার বিচিত্র এবং দুর্বোধ্য আচার-আচরণ আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরার কোন প্রচেষ্টা করবো না। এই দুটি নরনারীর অবর্ণনীয় জীবন এবং এই তরুণীর দুর্বিষহ বেদনার ছবিও আমি আঁকবো না। তবে বিষয়টা আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে এই হতভাগ্য উন্মাদ ব্যক্তিটির প্রতিদিনকার লেখা দিনলিপি থেকে কিছু কিছু অংশ শুধু আপনাদের কাছে আমাকে পড়ে শোনাতে হবে। কারণ ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের মামলা আসলে এক উন্মাদকে নিয়ে এবং এ মামলা এতই অদ্ভুত ও আগ্রহজনক যে তা অনেক বিষয়েই সম্প্রতি পরলোকগত সেই হতভাগ্য রাজকুমারের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে খেয়ালী রাজা ব্যাভেরিয়াতে নিষ্কাম সন্ন্যাসীর মতো রাজত্ব করতেন। তাই 'কল্পনাবিলাসীর পাগলামি' শীর্ষক মামলাটি আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

'সেই খেয়ালী রাজকুমারের সম্পর্কে কথিত সমস্ত গল্পগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের স্মরণে আছে। তিনি তাঁর রাজত্বের সব চাইতে সুন্দর নিসর্গ শোভার মাঝখানে সত্যিসত্যিই একেবারে খাঁটি পরীর দেশের দুর্গ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বস্তু ও স্থানের যথার্থ সৌন্দর্যও তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিলো না। তাই কল্পনার সাহায্যে

নাট্যমঞ্চের দৃশ্য পরিবর্তনের কৌশলে ওই বিচিত্র বাসস্থানে তিনি কৃত্রিম দিগন্ত-রেখার সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন চিত্রিত বন জঙ্গল আর মনোরম উদ্যানের—যার গাছের পাতাগুলো দামী পাথর দিয়ে তৈরি। আল্পস এবং হিমবাহ, তৃণময় প্রান্তর এবং সূর্যতাপে পীড়িত বালুময় মরু অঞ্চল—সবই তাতে ছিলো। রাত্রিবেলায় সত্যিকারের চন্দ্রালোকের নিচে হ্রদগুলো বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতো। সেই সব হ্রদের জলে রাজহাঁসের দল ঘুরে বেড়াতো, ভেসে যেতো ছোট ছোট নৌকো। আর পৃথিবীর সেরা বাদকদের নিয়ে গঠিত ঐকতান-বাদকদল পাগলারাজার সমস্ত চেতনাকে কল্পনার আবেশে মাতাল করে তুলতো।

এই রাজপুত্র ছিলেন চরিত্রবান, চিরকুমার। স্বপ্ন ছাড়া তিনি কোনদিনই কিছু ভালবাসেননি—ভালবেসেছেন শুধু তাঁর স্বপ্ন, স্বর্গীয় স্বপ্নকে।

একদা সন্ধ্যায় এক বিখ্যাত তরুণী গায়িকাকে নিয়ে নৌকো বিহারে বেরিয়ে তিনি তাকে গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করেন। গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য, উষ্ণ-মধুর বাতাস, ফুলের সুগন্ধ আর এই সুদর্শন তরুণ যুবরাজের উচ্ছ্বাসে বিহ্বলা মেয়েটিও তখন তাকে গান গেয়ে শোনায়। গান গায় এমন রমণীর মতো, যাকে প্রেম স্পর্শ করেছে। তারপর আচমকা উন্মাদের মতো কেঁপে উঠে মেয়েটি রাজকুমারের বুকে ঢলে পড়ে, তার ঠোঁটের স্পর্শ পেতে চায় ব্যাকুল আবেশে।

অথচ রাজকুমার কিন্তু মেয়েটিকে হ্রদের জলে ফেলে দিয়ে দাঁড় তুলে নিলেন এবং মেয়েটি উদ্ধার পেলো কি না, সে বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে তীরে এসে নামলেন।

জুরি মহোদয়গণ, আমাদের মামলাটি সর্বতোভাবে এই একই রকমের। আপনাদের কাছে একটা দিনলিপি থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ পড়ে শোনানো ছাড়া আমি আর কিছুই করবো না। দিনলিপিটা একটা লিখবার টেবিলের দেরাজ থেকে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম।

সমস্ত কিছুই কি ভীষণ একঘেয়ে আর কুৎসিত···কি বৈচিত্র্যহীন আর বীভৎস! অথচ আমি স্বপ্ন দেখি আরও সুন্দর, আরও মহান, আরও বৈচিত্র্যময় এক পৃথিবীর! যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকতো অথবা তিনি যদি কোথাও কিছু সৃষ্টি না করতেন, তবে তাঁর অস্তিত্বের কল্পনা কতই না তুচ্ছ হয়ে উঠতো!

সমস্ত বনজঙ্গল, নদী, সমভূমি—সবই এক রকমের, সবই একঘেয়ে। আর মানুষ!···মানুষ?···ওঃ, কি সাংঘাতিক জীব—দুর্নীতিপরায়ণ, অহঙ্কারী আর নিদারুণ বিরক্তিকর প্রাণী!

প্রত্যেকের ভালবাসা উচিত—প্রেমের পাত্রীকে না দেখেই তাকে পাগলের মতো ভালবাসা উচিত। কারণ দেখার অর্থ—বোঝা, আর বুঝতে পারার অর্থ —ঘৃণা করা। মানুষ যেমন করে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ওঠে, কি পান করছে না করছে সে খেয়াল পর্যন্ত থাকে না—তেমনি প্রেমের পাত্রীটিকে নিয়েও ভালবাসায় প্রত্যেকের মাতোয়ালা-মশগুল হয়ে থাকা উচিত। তারপর করো পান, আরও পান—দিনরাত্রি নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত না নিয়ে আকণ্ঠ শুধু প্রেমসুধা করো পান।

মনে হচ্ছে, আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি। ওর দেহকান্তিতে এমন কিছু আছে যা এ পৃথিবীর বলে মনে হয় না, যা আমার স্বপ্নকে ডানা এনে দেয়। ওহ্, বাস্তব পৃথিবীর মানুষগুলোকে স্বপ্নে কত্তো আলাদা বলে মনে হয়!···মেয়েটি সুন্দরী, খুব সুন্দরী—চুলগুলো তার বর্ণনার অতীত কোমল ছায়ায় ভরা। চোখ দুটি নীল। একমাত্র নীল চোখই আমার মনটাকে আবেশে দুলিয়ে দেয়। একটি নারীর সমস্ত অস্তিত্ব, যে আমার হৃদয়ের গভীরে আসন পেতে রেখেছে—আমার কাছে তার প্রকাশ তার চোখের মাঝে, শুধুমাত্র দুটি চোখের মাধুরীতে।

আহা, কি রহস্য! কি রহস্য? চোখ?···চোখেই তো সমস্ত বিশ্বচরাচর—কারণ চোখ তা দেখতে পায়, চোখ তা প্রতিফলিত করে। চোখের মধ্যেই বিশ্বজগৎ, বস্তু ও প্রাণী, অরণ্য ও মহাসাগর, মানুষ আর পশু, সূর্যাস্ত, নক্ষত্র, শিল্পকলা—সব··· সব কিছু। চোখ সব কিছুই ভাখে, আলাদা করে ধরে রাখে। তা ছাড়া ধরে রাখে আরও অনেক কিছুকে—ধরে রাখে মন, চিন্তাশীল মানুষ, আর সেই সব মানুষদের—যারা ভালবাসে, হাসে, দুঃখ পায়। মেয়েদের নীল চোখের দিকে তাকাও। ওরা সাগরের মতো নিতল, আকাশের মতো পরিবর্তনশীল আর কতই না মধুর! মধুর মৃদুমন্দ বাতাসের মতো, সঙ্গীতের সুষমার মতো। কতই না স্বচ্ছ —এত স্বচ্ছ যে পেছনটা পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় ওদের নীলিম আত্মা—যা চোখগুলোকে রঙীন করে, ঝলমলে করে, স্বর্গীয় সুন্দর করে তোলে।

হ্যাঁ, আত্মা অংশ নেয় দৃষ্টির রঙগুলোয়। সমুদ্র আর মহাকাশ থেকে চুরি করা রঙ নিয়ে নীল আত্মাটা শুধু স্বপ্নটাকে ধরে রাখে নিজের গভীরে।

চোখ! চোখের কথাটা ভেবে ভাখো! চিন্তার রসদ যোগাতে সে দৃশ্যমান সৃষ্টিটাকে নিঃশেষে পান করে। পান করে পৃথিবী, বর্ণ, গতি-চাঞ্চল্য, পুঁথিপত্র, ছবি, সমস্ত সৌন্দর্য, আর সব কিছু কুশ্রীতাকে—তারপর সৃষ্টি করে নতুন চিন্তাধারায়।

যখন সে চোখ আমার দিকে তাকায়, আমার সারা মন অপার্থিব সুখে ভরে ওঠে। যে সমস্ত বিষয়ে আমরা এ পর্যন্ত অজ্ঞ, চোখ তা আগে থেকেই আমাদের জানিয়ে দেয়—বুঝিয়ে দেয় আমাদের চিন্তাধারার বাস্তবতাগুলি আসলে ঘৃণ্য, নোংরা জিনিস।

ওর চলার ধরনের জন্যেও ওকে আমি ভালবাসি। যখন ও হেঁটে যায় তখন মনে হয়, ও সাধারণ নারীজাতির কেউ নয়—আরও সুন্দর, আরও দেবোপম অন্য কোন জাতি থেকেই ওর উদ্ভব।...

আসছে কাল ওকে আমি বিয়ে করবো।...

আমার ভয় করছে...ভয় করছে অনেক কিছুকেই।...

*

দুটো পশু—দুটো কুকুর, দুটো নেকড়ে, দুটো শেয়াল—জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে তাদের একের সঙ্গে অন্যের দেখা হয়। একটা পুরুষ, অন্যটা মাদী। দুজনে জোড় বাঁধে। জোড় বাঁধে এক পাশব প্রবৃত্তির তাড়নায়—যার ফলে তারা বংশ বৃদ্ধি করে...জন্ম দেয় তাদের মতো একই আকার, গড়ন, ত্বক, চাল-চলন এবং অভ্যাসবিশিষ্ট প্রাণীদের।

সমস্ত পশুই তা-ই করে। কেন করছে, তা না জেনেই করে!

আমরাও তাই...

*

ওকে বিয়ে করে আমি শুধু সেই অর্থহীন তাড়নাকেই মেনে নিয়েছি, যে তাড়না আমাদের মেয়েদের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

ও আমার স্ত্রী। যতদিন কল্পনায় আমি ওকে কামনা করতাম ততদিন আমার কাছে ও ছিলো প্রায় সফল হয়ে আসা এক অধরা স্বপ্ন। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি দুই বাহুর ব্যাকুল বাঁধনে ওকে নিবিড় করে তুললাম সেই থেকে ও হয়ে উঠলো এক সাধারণ নারী—আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দিতে প্রকৃতি যাকে ব্যবহার করেছে নিষ্করুণভাবে।

কিন্তু ব্যর্থতা কি ও-ই বয়ে এনেছে? না। তবু ওর প্রতি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি আমি। এত ক্লান্ত যে সমস্ত হৃদয়জোড়া অবর্ণনীয় বিরক্তিকে বাদ দিয়ে আমি ওকে ছুঁতে পারি না, হাত বা ঠোঁটের আলতো স্পর্শে সোহাগ পর্যন্ত করতে পারি না। হয়তো এ ঘৃণা এ বিরক্তি ওর প্রতি নয়—এ ঘৃণার ব্যাপ্তি আরও উঁচু, আরও

বিরাট। হয়তো এ ঘৃণা প্রেমের আলিঙ্গনের প্রতি—সভ্য মানুষের পক্ষে যা এতই জঘন্য-নীচ লজ্জাজনক কাজ যে তা গোপন করে লুকিয়ে রাখা উচিত, বলা উচিত শুধুমাত্র নিচু গলায়, লজ্জায় রেঙে উঠে…

*

আমার স্ত্রী চোখেমুখে হাসি নিয়ে আমাকে ডাকছে, দু হাত তুলে এগিয়ে আসছে আমার দিকে—এ দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারি না। কিছুতেই পারি না। এক সময় কল্পনা করেছিলাম, ওর চুম্বন আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। একদিন ও যখন সামান্য একটু জ্বরে ভুগছিলো তখন আমি ওর ক্ষীণ, দুর্বল, মানুষের অধঃপতনের প্রায় অস্পষ্ট গন্ধ মেশানো নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়েছিলাম। তাতে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে উঠেছিলাম আমি!

ওঃ! শরীরের মাংস যেন সম্মোহনী জীবন্ত বিষ্ঠা, যেন জীবন্ত ক্ষয়—যা হাঁটে, চিন্তা করে, কথা বলে, তাকায়, হাসে—যা গেঁজে ওঠা খাদ্য সামগ্রীতে ভরা—যা গোলাপের মতো রঙিন, সুন্দর, প্রলোভনাময়—যা হৃদয়ের মতো প্রতারক…

কেন শুধু ফুলের গন্ধই এত মধুর? বিবর্ণ-বিধুর অথবা রঙে-রূপে-উজ্জ্বল ফুল যা আমার হৃদয়ে স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, বিক্ষুব্ধ করে আমার চোখ দুটিকে? ওরা কত সুন্দর, কত কোমল ওদের গড়ন, কত বৈচিত্র্য ওদের আকৃতিতে! আধেকখানি খোলা—ঠিক মুখের মতো, কিন্তু মুখের চাইতেও লোভনীয়। দেহখানি ফাঁপা, ঠোঁট পেছন দিকে বাঁকানো, ভেতরটা দাঁতের মতো খাঁজকাটা—মাংসল। ওদের গর্ভে রেণুময় জীবনবীজ, যা থেকে প্রতিটি ফুলে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সৌরভ।

ওরাও বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু ওরা, সারা পৃথিবীতে একমাত্র ওরাই নিজেদের কলুষিত না করে প্রেমের স্বর্গীয় সুরভী ছড়ায়। ছড়ায় ওদের সোহাগের সুগন্ধি স্বেদ, অতুলনীয় দেহের অপরূপ সৌরভ—যে দেহ রূপ-লাবণ্য মাখা, রুচিময় বর্ণালীর রঙে রঙিন আর সুগন্ধের মাতাল আকর্ষণে ভরা।…

*

নির্বাচিত অংশ/ছ মাস পরে।

…আমি ফুল ভালবাসি, ফুল হিসেবে নয়—কোমল দৈহিক সত্তা হিসেবে। আমার দিন আমার রাত্রি আমি 'সবুজ প্রাসাদে কাটাই', যেখানে হারেমের নারীদের মতো আমি ওদের লুকিয়ে রাখি।

আমি ছাড়া আর কে ওদের রূপের পাগল-করা মধুর মায়া, ওদের কোমল

সোহাগের প্রাণ-মাতানো অতিমানবিক নিটোল আবেশ অনুভব করতে পারে ? কে বোঝে ওই আশ্চর্য ফুলগুলোর অলীক বৈচিত্র্যময়, কোমল, দুর্লভ, সুন্দর—গোলাপী, রক্তিম, অথবা শুভ্র-তৈলাক্ত শরীরে চুম্বনের কি মাধুর্য ?

আমি আর মালী ছাড়া কেউ আমার সবুজ প্রাসাদে প্রবেশ করে না। তার ভেতরে আমি পা বাড়াই ঠিক যেন কোন গোপন আনন্দ উপভোগ করার জায়গায় প্রবেশ করার মতো। উঁচু কাচের গ্যালারিতে প্রথমে দুসারি কুঁড়ির মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাই আমি। বন্ধ, আধখোলা বা সম্পূর্ণ ফুটে যাওয়া কুঁড়িগুলো মাটি থেকে উঠে থাকে ছাদের দিকে। আমার প্রতি সে-ই তাদের প্রথম চুম্বন।

যে ফুলগুলো আমার রহস্যময় আবেগের উপকক্ষটিকে সাজিয়ে রাখে, তারা আমার সেবিকা মাত্র—প্রিয়পাত্রী নয়। আমি যখন হেঁটে যাই, তখন ওরা ওদের নিত্যপরিবর্তনময় উজ্জ্বলতা আর তাজা সুগন্ধ দিয়ে অভিবাদন জানায় আমাকে। ওরা --আমার প্রণয়ীর দল—আমার ডান দিকে আট সারি আর বাঁ দিকে আট সারি থাকে থাকে ওপরের দিকে উঠে গেছে। এত ঘনিষ্ঠ ওদের বিন্যাস যে মনে হয় যেন দুটো বাগান আমার পায়ের কাছে নেমে এসেছে। ওদের দেখা মাত্র আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে, চোখদুটো হয়ে ওঠে দীপ্তিময়, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত ছুটে চলে পাগলের মতো, বুকের মধ্যে আত্মাটা লাফিয়ে ওঠে। ওদের স্পর্শ করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় হাত দুটো কাঁপতে থাকে আমার। এই উঁচু গ্যালারির শেষ প্রান্তে তিনটে বন্ধ দরজা—আমার তিনটি হারেম—এখান থেকে যে কোন একটিকে আমি বেছে নিতে পারি।

কিন্তু প্রায়ই আমি আমার ঘুম-ঘুম· তন্দ্রালু প্রিয়া অর্কিডগুলোর কাছে যাই। ওদের ঘরটা নিচু, ওখানে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ওখানকার স্যাঁতসেঁতে উষ্ণ বাতাস আমার ত্বক ভিজিয়ে তোলে, বাতাসের অভাবে গলা শুকিয়ে আসে, কাঁপতে থাকে আঙুলগুলো। এই বিচিত্র মেয়েগুলো উত্তপ্ত জলাময় অস্বাস্থ্যকর দেশ থেকে এসেছে। ওরা কুহকিনীর মতো মোহময়ী, বিষের মতো মারাত্মক। ওরা অপূর্ব অদ্ভুত, ওরা আমাকে ধ্বংস করে দেয়, মনকে ভরিয়ে তোলে.দিশেহারা আতঙ্কে। ওদের কারুর কারুর বিশাল ডানা, ছোট ছোট থাবা আর চোখ—ঠিক প্রজাপতির মতো দেখতে। চোখ আছে বলেই ওরা আমার দিকে তাকায়, আমাকে ছাখে। ছাখে—বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য সব প্রাণীদের, পবিত্র ধরিত্রীমায়ের কন্যা পরীদের আর স্পর্শাতীত বাতাস আর উষ্ণ আলোর অস্তিত্বকে। হ্যাঁ, ওদের ডানা আছে, চোখ আছে, আছে কোমল বর্ণালীর এক অতুল সম্পদ—যা কোন

শিল্পীই তার তুলিতে ধরে রাখতে পারে না। যতদূর কল্পনা করা যায় তার সবটুকু লাবণ্য, সৌন্দর্য আর মাধুর্যই ওদের আছে। ওদের শরীরের পাশগুলো চেরা, সুরভিত আর স্বচ্ছ—প্রেমের জন্যে ওরা প্রস্তুত, নারীমাংসের চাইতেও ওরা বেশি লোভনীয়। ওদের ছোট্ট শরীরের অকল্পনীয় উঁচু-নিচু রেখাগুলো মাতাল মনকে দৃষ্টির নন্দনকাননে নিয়ে যায়, পরম আনন্দে ভরিয়ে তোলে সমস্ত চেতনার বিশ্বকে। বোঁটার ওপরে ওরা এমন ভাবে কাঁপে যে দেখে মনে হয়, বুঝি এখুনি উড়ে যাবে। ওরা কি উড়ে যাবে, আসবে আমার কাছে? না, আসলে প্রেমে জরোজরো কোন অতীন্দ্রিয় পুরুষ প্রাণীর মতো আমার হৃদয়ও শুধু ঘুরে ফিরে ওদের নিয়ে ভেবে মরে।

কোন পতঙ্গের ডানা ওদের স্পর্শ করতে পারে না। আমি ওদের জন্যে যে স্বচ্ছ কারাগার বানিয়ে দিয়েছি তাতে আমরা—ওরা আর আমি—একেবারে একা। একটি একটি করে আমি ওদের প্রত্যেককে লক্ষ্য করি, মন দিয়ে চিন্তা করি, প্রশংসা করি আর প্রেম নিবেদন করি।

কি নরম-মসৃণ ওদের শরীর, কি রহস্যময় গোলাপ-রঙা দেহ! দেখে ঠোঁটদুটো বাসনায় ভিজে ওঠে! কত ভালবাসি আমি ওদের। ওদের বৃতির ধারগুলো বৃত্তাকারে বাঁকানো, গলার চাইতে ফিকে রঙের। দলমণ্ডল নিজেকে লুকিয়ে রাখে সেখানে। রহস্যময় মোহিনী মুখ, জিভের কাছে পরম লোভনীয়। নিজেদের কোমল অদ্ভুত পবিত্র অঙ্গগুলোকে কি অসাধারণ যত্নে লুকিয়ে রাখে এই দেবোপম স্বর্গীয় সৃষ্টিগুলি। ওরা কথা বলে না, শুধু মিষ্টি সুগন্ধ ছড়ায়।

মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে কোন একটির জন্যে আমি আবেগে অধীর হয়ে উঠি। কয়েক দিন, কয়েকটা রাত—যতক্ষণ সে আবেগের অস্তিত্ব থাকে, আমি তা সহ্য করে থাকি। তারপর সেটাকে সাধারণ গ্যালারি থেকে তুলে এনে ছোট্ট একটা কাচের নিভৃত পাত্রে রাখি, সুতোর মতো জলের ধারা তিরতির করে ঝরে পড়ে পাত্রটার তলার দিকে বিছানো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ থেকে নিয়ে আসা বিষুবীয় ঘাসের ওপরে। সেখানে আমি ওর পাশে পাশে থাকি পরম উৎসাহে, উত্তেজিত আর উৎপীড়িত হয়ে। জানি, মৃত্যু ওর খুব কাছে এগিয়ে এসেছে—লক্ষ্য করি ওর বিবর্ণ হয়ে ওঠা। তখন অবর্ণনীয় সোহাগে ওকে উপভোগ করি আমি—ওর গন্ধ শুঁকি, পান করি, লুট করি ওর ছোট্ট জীবনটাকে।

*

অনুচ্ছেদগুলো পড়া শেষ করে কৌঁসুলী ভদ্রলোক বলে চললেন, 'মাননীয় জুরিবৃন্দ, এই বেহায়া ভাববাদী উন্মাদ ব্যক্তিটির বিচিত্র স্বীকারোক্তি আমি আর

আপনাদের কাছে পড়তে পারছি না, শালীনতাবোধ আমাকে বাধা দিচ্ছে। আমার ধারণা, এইমাত্র যে সামান্য কটি অনুচ্ছেদ আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি তা এই মানসিক রোগের ব্যাপারটাকে আপনাদের বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের এই উত্তেজনাময় চিত্তভ্রংশ ও কলুষিত অধঃপতনের যুগেও মানুষ যতটা কল্পনা করতে পারে, এ ঘটনা তার চাইতেও বিরল।

'সুতরাং আমি মনে করি, স্বামীর বিচিত্র মানসিক বিশৃঙ্খলার জন্যে আমার মক্কেল যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন, তাতে অন্য যে কোন রমণীর চাইতে তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবি করার পক্ষে অনেক বেশি উপযুক্ত।'

তদন্তকারী বিচারক ম্যঁসিয় বারমিতুঁর সাঁ ক্লাউদের রহস্যময় ঘটনাটার সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করছিলেন। তাঁকে ঘিরে উৎসাহী জনতার এক ছোটখাটো সমাবেশ। গত এক মাস ধরে এই দুর্বোধ্য অপরাধকে কেন্দ্র করে তামাম পারী শহর উত্তাল হয়ে রয়েছে। কিন্তু কেউই এর সঠিক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

ম্যঁসিয় বারমিতুঁর তাপচুল্লির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সমস্ত সূত্রগুলোকে একত্র করে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের অবতারণা করছেন, কিন্তু কোন উপসংহার টানতে পারছেন না। একদল স্ত্রীলোক তখনও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, চেষ্টা করছে ম্যঁসিয়র কাছাকাছি যাবার। ম্যঁসিয়র চকচকে মুখ আর ঠোঁটের দিকে দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ওদের। যখনই তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, তখনই আতঙ্ক আর প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওরা।

ওদের মধ্যে একজন সকলের চাইতে বিবর্ণ ও পাণ্ডুর। কথা বলতে বলতে বিচারক বারমিতুঁর ক্ষণিকের জন্যে থামতেই মহিলাটি মন্তব্য করে উঠলো, 'কি ভয়ঙ্কর! এ যে একেবারে অলৌকিক ব্যাপার! কেউই এর রহস্য ভেদ করতে পারবে না।'

বিচারক মহিলার দিকে ঘুরে তাকালেন, 'হ্যাঁ মাদাম, সম্ভবত কেউই তা পারবে না। কিন্তু আপনার ওই 'অলৌকিক' শব্দটার সঙ্গে এ ঘটনাটার কোন সংস্রব নেই। আসলে এ ক্ষেত্রে আমরা এক সুপরিকল্পিত, সুদক্ষ অপরাধ-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তদন্ত করছি। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা এতই রহস্যময় যে আমরা কোনই আলোর সন্ধান পাচ্ছি না। কিন্তু একবার আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিলো, যার অলৌকিকত্বকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। সে ব্যাপারটা নিয়ে এখন আমরা আর মাথা ঘামাই না, ওটা চিরদিন রহস্যময় হয়েই রইলো।'

কয়েকটি মহিলা সমস্বরে বলে উঠলো, 'দয়া করে সেই গল্পটা আমাদের বলুন।'

তদন্তকারী বিচারকের মতোই গাম্ভীর্য বজায় রেখে মৃদু হাসলেন ম্যঁসিয় বারমিতুঁর, 'কিন্তু দয়া করে আপনারা মনে করবেন না যে এক মুহূর্তের জন্যেও সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাটার পেছনে কোন অলৌকিক কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে আমি স্বীকার করে নিয়েছিলাম। যা স্বাভাবিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য, আমি শুধু তাতেই

বিশ্বাসী। আসলে 'অলৌকিক' শব্দের চাইতে 'দুর্বোধ্য' শব্দটাই আমার বেশি পছন্দ। হ্যাঁ, যে গল্পটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম—

তখন আমি অ্যাজিকিওর তদন্তকারী বিচারক। সমুদ্রের তীরে পাহাড়ে ঘেরা ওই ছোট্ট শহরটা সত্যিই ভারি মনোরম। অনেক নাটকীয় সংঘাত, দুঃসাহসে ভরা অসংখ্য বংশগত এবং শরিকী বিবাদ-বিসম্বাদ ওখানে লেগেই থাকতো। ওখানে গিয়ে আমি যে এ ধরনের কত রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা শুনে'ছি, কত প্রত্যক্ষ ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি—তার কোন ইয়ত্তা নেই। দু বছর ধরে আমি শুধু খুনোখুনির গল্পই শুনেছি। ওখানকার লোকগুলোর স্বভাব-চরিত্র একেবারে আদিম মানুষের মতো, আইন-কানুন সকলেই নিজ নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। নিজের চোখে আমি যে কত বৃদ্ধের ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কাটা মুণ্ডু দেখেছি, কত মানুষ যে সবংশে নিহত হয়েছে—তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ওই সমস্ত খুন-খারাবির গল্পে আমার মাথাটা তখন সর্বদা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো।

একদিন শুনতে পেলাম, উপসাগরের তীরে একটা ছোট্ট বাড়িতে এক ইংরেজ ভদ্রলোক গত কয়েক বছর ধরে বসবাস করছেন। মার্সেই থেকে সংগ্রহ করে আনা একটি ফরাসী চাকরও তাঁর সঙ্গে আছে। শীঘ্রিই ওই অপরিচিত বিদেশী ভদ্রলোক সকলের কৌতূহলের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলেন। শিকার অথবা মাছ ধরতে যাওয়া ছাড়া উনি বাড়ি থেকে বড় একটা বের হতেন না, কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন না, শহরের দিকেও যেতেন না কোনদিন। প্রতিদিন সকাল বেলা দুঘণ্টা ধরে ভদ্রলোক পিস্তল আর হালকা বন্দুক নিয়ে নিশানা ঠিক রাখার মহড়া দিতেন।

দেখতে দেখতে ভদ্রলোককে নিয়ে নানান ধরনের লোক-কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো। অনেকের মতে, উনি একজন বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি—রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন। আবার জনশ্রুতি শোনা গেলো, উনি আসলে এক সাংঘাতিক অপরাধ করে এখানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। ওঁর চরিত্র সম্পর্কে সম্ভব অসম্ভব নানান কথাই শহরময় ভেসে বেড়াতে লাগলো ইতস্তত।

তদন্তকারী বিচারক তথা শাসনকর্তা হিসেবে আমিও ওই লোকটির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। কিন্তু কাজটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। ভদ্রলোক নিজেকে 'স্যার জন রোয়েল' নামে পরিচয় দিতেন। আমি তাঁর ওপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখলাম। কিন্তু ফলশ্রুতি হিসেবে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার

করে উঠতে পারলাম না।

অবশেষে গুজব ক্রমশ চরম হয়ে ওঠায় আমি নিজেই ওই বিদেশীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে উত্তোগী হয়ে উঠলাম। তাই আমি তার ভূ-সম্পত্তির কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলিতে নিশানা ঠিক রাখার মহড়া দিতে শুরু করলাম। দীর্ঘদিন ধরে আমি সুযোগ খুঁজছিলাম, একদিন সে সুযোগ মিলে গেলো: আমার গুলিতে বিদ্ধ হয়ে একটা পাখি ভদ্রলোকের বাগানে গিয়ে পড়লো। আমার কুকুর ছুটে গিয়ে মুখে করে নিয়ে এলো সেই আহত পাখিটাকে। এই সুযোগে আমিও কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা চাইতে এবং পাখিটা স্বয়ং স্যার জন রোয়েলের হাতে তুলে দিতে এগিয়ে গেলাম।

ভদ্রলোকের বিশাল চেহারা। চুল, দাড়ি সমস্ত কিছুই লাল। সব মিলিয়ে যেন এ যুগের এক ভদ্র এবং আকর্ষণীয় হারকিউলিস। আমাকে তিনি সাদর সম্ভাষণ জানালেন—সেই মুহূর্তে তাঁর মধ্যে ইংরেজ জাতিসুলভ কোন কাঠিন্য বা রক্ষণশীলতা আমি দেখতে পেলাম না। তাঁর ফরাসী উচ্চারণে ইংলিশ চ্যানেলের অন্য পাড়ের টান অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ওই একই মাসে আমাদের মধ্যে আরও পাঁচ-ছবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিলো।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়ির কাছ দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক বাগান-কুর্সিতে বসে দোল খেতে খেতে তামাকের নল টানছেন। আমি তাঁকে কুশল সম্ভাষণ জানাতেই তিনি আমাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ করলেন।

আমার সঙ্গে আচার-ব্যবহারে তিনি ইংরেজসুলভ সমস্ত সৌজন্যরীতিই মেনে চলছিলেন। কর্সিকা ও ফ্রান্স সম্পর্কে উনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এক গ্লাস বিয়ারও পান করা হলো। তারপর অতি সন্তর্পণে আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দু-একটি কৌতূহলী প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। তিনিও জবাব দিলেন এতটুকু বিব্রত না হয়ে। জানালেন, দেশ ভ্রমণে তাঁর সুবিপুল অভিজ্ঞতা আছে—আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং অ্যামেরিকায় ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, জীবনে আমার অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাই হয়েছে।'

নিজের মন্তব্য সমর্থন করার জন্যে একের পরে এক শিকারের গল্প বলে চললেন ভদ্রলোক। জীবনে তিনি জলহস্তী, বাঘ, এমন কি গরিলাও শিকার করেছেন।

বললাম, 'এগুলো সবই তো সাংঘাতিক জন্তু!'

'না, এরা তেমন একটা সাংঘাতিক কিছু নয়,' ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন।

'সব চাইতে সাংঘাতিক জীব হচ্ছে মানুষ।' একজন ভিলবরিয়া ইংরেজের মতোই ভদ্রলোকের মৃদু হাসি সরব হয়ে উঠলো।

বললেন, 'জীবনে আমি মানুষও শিকার করেছি অনেক।'

তারপর তিনি অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন এবং বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র দেখাবার জন্যে আমাকে বাড়ির ভেতরে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোকের বৈঠকখানা ঘরটা সোনালী কারুকাজ করা কালো রেশমী কাপড়ে ঘেরা। কালো রঙের ধাতব পাত্রে বড় বড় হলদে রঙের ফুলগুলো যেন আগুনের শিখার মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে। 'এটা জাপানী ধাতু,' জানালেন উনি।

হঠাৎ কপাটের খুপরিতে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে থমকে দাঁড়ালাম। লাল মখমলে মোড়া কালো রঙের কি যেন একটা অজ্ঞাত বস্তু। এগিয়ে গেলাম ওটার দিকে। দেখলাম, একটা হাত…মানুষের হাত! কোন কঙ্কালের সাদা পরিষ্কার হাত নয়, চামড়া শুকিয়ে যাওয়া একখানা কালো হাত! নখগুলো ঝুলে রয়েছে, অনাবৃত পেশীগুলো একেবারে স্পষ্ট, বাসি রক্তের শুকনো দাগ আবিষ্কার করাও কঠিন নয়। বেশ নিপুণভাবে কেটে রাখা হয়েছে হাতটাকে, মনে হয় যেন কোন ধারালো কুঠারের এক আঘাতে কনুই থেকে হাতের অর্ধেকটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিলো।

হাতি বেঁধে রাখার মতো উপযুক্ত একটা শক্তসমর্থ মোটা শেকল হাতটাকে ঘিরে রেখেছে এবং ওই শেকলের সাহায্যেই ঝুলে রয়েছে হাতটা।

'এটা কি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওটা আমার পরমতম শত্রু,' ইংরেজ ভদ্রলোক শান্ত গলায় বললেন, 'অ্যামেরিকা থেকে এসেছে। একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে, ছুঁচলো পাথর দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে, আট দিন ধরে ওটা সূর্যের তাপে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। ওটা আমার সৌভাগ্যের উৎস!'

ওই বিচ্ছিন্ন অঙ্গটাকে আমি স্পর্শ করে দেখলাম। নিশ্চয়ই ওটা কোন বিশাল চেহারার মানুষের হাত। আঙুলগুলো অসম্ভব লম্বা, শক্তিশালী পাকানো পেশীগুলোর জায়গায় তখনও কিছু কিছু মাংস লেগে রয়েছে। দেখেই ভয় লাগে, মনে হয় যেন এক নিদারুণ বন্য প্রতিহিংসা ওর মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে।

'হাতটা যার, সে নিশ্চয়ই খুব শক্তিমান ছিলো—' আমি বললাম।

'ঠিকই বলেছেন,' ভদ্রলোক মিষ্টি গলায় বললেন। 'তবে কিনা আমি তার

চাইতেও শক্তিমান। তাই ওটাকে শেকল দিয়ে অমন সুন্দর করে বেঁধে ফেলেছি।'

মনে হলো ভদ্রলোক যেন রসিকতা করছেন। তাই বললাম, 'কিন্তু এখন তো শেকলের দরকার নেই। কাটা হাত নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবে না।'

এবারে কিন্তু স্যার জন রোয়েল গম্ভীর গলায় বললেন, 'ওটা সব সময়েই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাই শেকলটা ভীষণ দরকারী।'

এক ঝলকে ভদ্রলোকের মুখের ভাষা পড়ে নেবার চেষ্টা করলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, লোকটা কি পাগল? না কি উনি হালকা ঠাট্টা-তামাশায় অভ্যস্ত? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে কিছু অনুমান করা একেবারে অসম্ভব। বাধ্য হয়েই আমি প্রসঙ্গান্তরে ফিরে গেলাম, প্রশংসা করলাম ওঁর বন্দুকগুলোর।

লক্ষ্য করলাম, গুলিভর্তি তিনটে পিস্তল দেরাজটার ওপরে রয়েছে। দেখে মনে হয়, সব সময়েই উনি যেন এক অজ্ঞাত আক্রমণের আশঙ্কায় রয়েছেন।

এর পরেও আমি বার কতক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু তারপর আর যাইনি। সাধারণ মানুষও ক্রমশ তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে উঠেছিলো।

একটা বছর এমনি করেই কেটে গেলো। তারপর নভেম্বর মাসের শেষ দিককার এক সকাল বেলায় আমার চাকর আমাকে ঘুম থেকে তুলে খবর দিলো, স্যর জন রোয়েল গত রাত্রে খুন হয়েছেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন কমিশনার জেনারেল এবং পুলিসের বড়কর্তা। বাড়ির চাকরটা হতবিহ্বল অবস্থায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। প্রথমটাতে আমি তাকেই সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু আসলে সে ছিলো নিরপরাধ। সত্যিকারের অপরাধীকে কোনদিনই খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি।

স্যার জনের বৈঠকখানায় ঢুকে প্রথমেই দেখলাম, ভদ্রলোকের প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহটা ঘরের মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। গায়ের জামাটা ছিঁড়ে ফালা ফালা, একটা আস্তিন ঝুলছে নিরালম্বের মতো। সবকিছু মিলে প্রমাণ দেয়, এখানে একটা বড় গোছের লড়াই হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকের মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ। মুখটা কালচে হয়ে ফুলে উঠেছে। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। দাঁত দিয়ে তখনও কি যেন কামড়ে রয়েছেন উনি। ঘাড়ের কাছে পাঁচটা গভীর ক্ষত, দেখে মনে হয় কোন লোহার ফলা দিয়ে যেন খুঁচিয়ে

খুঁচিয়ে ওগুলো করা হয়েছে। ক্ষতস্থানগুলো চাপ চাপ জমাট রক্তে ঢাকা।

আমাদের সঙ্গে একজন ডাক্তারও এসে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে আততায়ীর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে তিনি বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য! এগুলো যে একটা কঙ্কালের আঙুলের ছাপ!'

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে গেলো। ঘুরে তাকালাম সেই দেয়ালের দিকে, যেখানে একদিন আমি একটা কাটা হাত ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে দেখেছিলাম। ওটা আর সেখানে নেই। শুধু শেকলটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে মেঝের ওপরে।

গভীর কৌতূহলে আমি শবদেহটার দিকে ঝুঁকে তাকালাম এবং তখনই আবিষ্কার করলাম, উধাও হয়ে যাওয়া হাতটার একটা আঙুল ভদ্রলোকের দাঁতের কঠিন পেষণে আটকে রয়েছে। ওটাকে তিনি শেষ পর্যন্ত হাতটা থেকে ছিঁড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রাথমিক তদন্ত এবং অনুসন্ধানের কাজ শেষ হলো, কিন্তু কিছুই বোঝা গেলো না। কোন দরজায় কোন হাত পড়েনি, জানলাগুলোতেও তাই। আসবাবপত্র-গুলো যেমনটি ছিলো, ঠিক তেমনটিই রয়েছে। বাড়ির কুকুর দুটোও কিছু টের পায়নি। ভদ্রলোকের চাকরটি জানালো, গত এক মাস ধরে তার মনিবকে খুব উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিলো। এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলো চিঠি পেয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো পুড়িয়েও ফেলেছেন। ঘোড়া পেটানোর চাবুকটা নিয়ে তিনি যখন-তখন দেয়ালে ঝোলানো কাটা হাতটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন, তারপর প্রাণপণে চাবুক চালাতেন সেটার ওপরে। অনেক রাত করে বিছানায় শুতে যাবার অভ্যেস ছিলো তাঁর। কিন্তু তার আগে প্রতিদিন খুব সাবধানে ঘরের দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দিতেন। সব সময়েই হাতের সামনে কোন অস্ত্র রাখতেন। অনেক সময় মাঝরাতে তাঁকে চড়া গলায় কথাবার্তা বলতে শোনা যেতো, মনে হতো যেন কারুর সঙ্গে তিনি দারুণ ঝগড়া করছেন।

অথচ ওই বিশেষ রাতটিতে তাঁর ঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। পরদিন চাকরটি জানলা খুলে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পায়। এ ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

এই ঘটনার তিন মাস বাদে একদিন রাত্রিবেলায় আমি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, সেই কাটা হাতটা—সেই বীভৎস কাটা হাতটা—একটা

কাঁকড়া বিছে বা একটা মাকড়সার মতো আমার ঘরের পর্দার ওপরে আর দেয়ালের গায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিন তিন বার আমি ঘুম ভেঙে জেগে উঠি, তিনবারই ফের ঘুমিয়ে পড়ি এবং তিনবারই স্বপ্নে সেই বীভৎস হাত আর থাবার মতো আঙুল-গুলোকে নড়তে চড়তে দেখি।

পরের দিনই একটা কাটা হাত আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। স্যার জন রোয়েলের কবরের ওপরেই নাকি ওটাকে পাওয়া গিয়েছিলো। তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ না পাওয়ায় আমরাই তাঁকে সমাধিস্থ করেছিলাম।

হ্যাঁ, ভালো কথা—যে হাতটাকে ওভাবে পাওয়া গিয়েছিলো, সেটারও কিন্তু একটা বিশেষ আঙুল ছিলো না।

অতএব মহিলারা, আমার গল্প এখানেই শেষ। এর বেশি আর কিছুই আমি জানি না।

মেয়েরা আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো।

'কিন্তু এটা কেমন যেন একটা অর্ধেক গল্প হলো।' ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বললো, 'আসল ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। আপনি যদি রহস্যটা একটু খুলে না বলেন, তাহলে ওই নিয়ে সাত-পাঁচ চিন্তা করতে করতে আমরা হয়তো সারারাত ঘুমোতেই পারবো না।'

'ইস! তবে কি আমি আপনাদের ঘুম কেড়ে নিলাম?' ম্যঁসিয় বারমিতুঁর বললেন, 'আমার মত হচ্ছে—ওই কাটা হাতখানা যার, সে তখনও জীবিত ছিলো। একদিন সে সুযোগ বুঝে বাকি হাতখানা দিয়েই প্রতিশোধ নেয়। তবে কি করে সেটা সম্ভব হলো, তা আমি অবশ্যই বলতে পারবো না। নির্ঘাত শরিকী সংঘর্ষের ফল—এইটুকু মাত্র বলা যায়।'

'না, না,' মেয়েরা সমস্বরে প্রতিবাদ জানালো, 'এটা কোন যুক্তিই হলো না।'

বিচারকের মুখে তখনও সেই মৃদু হাসির রেখা। উপসংহার টেনে তিনি বললেন, 'আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি, আমার যুক্তি আপনাদের মনোমতো হবে না!'

আমরা মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। কারণ তাছাড়া পুরুষমানুষদের মধ্যে আলোচনা করার বিষয়বস্তু আর কি-ই বা থাকতে পারে? আমাদের মধ্যে একজন বললো, 'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও! এ ব্যাপারে আমার একটা অদ্ভুত গল্প মনে পড়ে গেছে।' তারপর সে ঘটনাটা আমাদের শোনালো:

গত শীতের এক সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গতায় এমন এক বিষাদ আচমকা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, দেহ আর মনের ওপরে যার আক্রমণের ফল একেবারে সাংঘাতিক। বাড়িতে তখন আমি একেবারে একা। ভালো করেই জানতাম, যদি বাড়িতেই থাকি তাহলে আমি সাংঘাতিক রকমের মন-মরা হয়ে উঠবো এবং বার বার অমন হলেই তা মানুষকে আত্মহননের পথে নিয়ে যায়।

অতএব কোটটা গায়ে চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম, যদিও কি করবো না করবো তা আমি তখন কিছুই জানতাম না। বুলেভাতে নেমে এসে কাফেগুলোর সামনে দিয়ে পায়চারি করতে শুরু করলাম। বৃষ্টি পড়ছিলো বলে কাফেগুলো প্রায় ফাঁকা। এ হচ্ছে সেই ধরনের ঝিরঝিরে বৃষ্টি যা পোশাক-পরিচ্ছদ যতটা ভেজায়, উৎসাহকেও ততটা দমিয়ে দেয়। এ মুষলধারে নেমে আসা বৃষ্টিধারা নয়, যা মানুষকে গাড়ি-বারান্দার নিচে বেদম করে ছুটিয়ে নিয়ে যায়—এ বৃষ্টি অনবরত অলক্ষিতে ফোঁটায় ফোঁটায় জমে উঠে পোশাক-আশাক চকচকে করে তোলে, শরীর ভিজে ওঠে একটু একটু করে।

এবারে আমার কি করা উচিত? আসলে আমি ঘুরে ফিরে কয়েক ঘণ্টা সময় কোথাও কাটাবার মতো একটা জায়গা খুঁজছিলাম। কিন্তু এই প্রথম আবিষ্কার করলাম যে, সন্ধ্যা বেলায় সমস্ত প্যারীতে মন ভালো করে তোলার মতো কোন জায়গা নেই। শেষ অব্দি 'মেষপালিকার বোকামো'তেই ঢুকে পড়বো বলে মনস্থির করে ফেললাম, যে নাটকটা কিনা বাজারের মেয়েমানুষদের কাছে ভীষণ প্রিয়।

বিশাল হলঘরটার মধ্যে লোকজন ছিলো কুল্লে মাত্র কয়েকজন। দীর্ঘ অর্ধবৃত্তাকার বেড়ানোর পথটাতেও সামান্য কয়েকটি মানুষ—হাঁটা-চলা, পোশাক-আশাক, চুল দাড়ির ছাঁট, টুপির ছাঁদ আর গায়ের রঙেই সাধারণভাবে তাদের জাত চিনে নেওয়া যায়। ওদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই দেখা যায়, যাকে দেখে সত্যিকারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়। আর মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে, এখানেও ঠিক

সেই একই রকমের। তেমনি সাদাসিধে, ক্লান্ত, নিস্তেজ, চলাফেরায় ত্রস্ত পদক্ষেপ এবং হাবভাবে বোকার মতো অহেতুক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমা—যার কোন কারণ আমার জানা নেই। নিজেই নিজেকে বললাম, পাঁচ পাত্তি দাবি করার পর এই সমস্ত নলখাগড়ার মতো শুঁটকি মেয়েছেলেগুলো সামান্য আয়েসেই যা বাগিয়ে নিচ্ছে, সত্যি কথা বলতে কি ওরা মোটেই তার যোগ্য নয়।

কিন্তু হঠাৎ ওদের মধ্যেই একটি মেয়েকে দেখে মনে হলো, যেন একটুকরো শান্ত বাতাস। বয়সে খুব একটা তরুণী নয়—কিন্তু তরতাজা আর লোভনীয়। ওকে থামিয়ে একেবারে জান্তব কেতায় কোন কিছু চিন্তা না করেই রাত্তিরটার মতো দরদস্তুর ঠিক করে ফেললাম। কারণ একেবারে একা একা নির্জন বাড়িটাতে আমার মোটে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিলো না। তার চাইতে বরং এই বাজে মেয়ে মানুষটার সঙ্গ আর আলিঙ্গন অনেক বেশি ভালো।

তাই ওই মেয়েটিকেই আমি অনুসরণ করলাম। মার্তের স্ট্রীটে একটা বিরাট, বিশাল বাড়িতে থাকতো মেয়েটি। সিঁড়ির আলো ততক্ষণে নিভে গিয়েছিলো। ক্রমাগত দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে, সামনে এগিয়ে চলা মেয়েটির সায়ার খসখস শব্দ অনুসরণ করে, আমি কোনরকমে আস্তে আস্তে হাতড়াতে হাতড়াতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম।

পাঁচতলায় উঠে থামলো মেয়েটি। তারপর ভেতরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি কাল সকাল অব্দি থাকতে চান?'

'হ্যাঁ, সেটাই তো ঠিক হয়েছিলো।'

'ঠিক আছে, আমি শুধু সেটাই জানতে চাইলাম। এখানে এক মিনিট একটু দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি আসছি।'

আমাকে অন্ধকারে রেখে কোথায় যেন চলে গেলো মেয়েটি। শুনলাম, ও দুটো দরজা বন্ধ করলো—মনে হলো, যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। আমার অবাক লাগছিলো আর সেই সঙ্গে অস্বস্তিও লাগছিলো খানিকটা। ব্ল্যাকমেইলের সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছিলো। কিন্তু আমার শরীরে শক্ত মাংসপেশী, ঘুষির জোরও যথেষ্ট। ভাবলাম, 'ঠিক হ্যায়, দেখা যায়গা!'

কান খাড়া করে একমনে আমি শুনছিলাম। কোন একজন নড়াচড়া করছে, চলাফেরা করছে খুব সন্তর্পণে। তারপর আরও একটা দরজা খোলা হলো। মনে হলো, তখনও যেন আমি কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু খুবই নিচু স্বরের কথাবার্তা।

একটা আলানো মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলো মেয়েটি। বললো, 'এখানে আপনি ঢুকতে পারেন।'

আমাকে দখল করে ফেলার চিহ্ন হিসাবে দিব্যি ঘনিষ্ঠ সুরে কথা বলছিলো মেয়েটি। ভেতরে ঢুকে একটা খাবার ঘর পেরিয়ে এলাম আমরা, স্পষ্টই বোঝা যায় সে ঘরে কেউ কোনদিনও খাওয়া-দাওয়া করেনি। তারপর এসে ঢুকলাম ছোট্ট একটা খুপরি ঘরে—এ ধরনের সব মেয়েদের ঘরগুলোই যেমন হয়ে থাকে। আসবাবপত্রে সাজানো ঘর, জানলায় ডোরাকাটা পর্দা। বিছানায় পালকের রেশমী লেপ, তাতে সন্দেহজনক লালচে দাগ।

'এবারে আপনি সহজ হতে পারেন,' বললো মেয়েটি।

সন্দেহের চোখ নিয়ে আমি ঘরটা পরীক্ষা করে নিলাম। কিন্তু কোন ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার আছে বলে মনে হলো না। মেয়েটি কিন্তু এত দ্রুত নিজের পোশাক-আশাক ছেড়ে ফেললো যে ও যখন বিছানায় গিয়ে উঠেছে, আমার তখন ওভার কোটটাই খোলা হয়নি।

'কি হলো গো তোমার?' মেয়েটি হাসতে শুরু করলো, 'হঠাৎ একেবারে লবণের খুঁটি হয়ে উঠলে নাকি? এসো! জলদি করো!'

ওকে অনুসরণ করে আমিও বিছানায় গিয়ে উঠলাম। এবং মিনিট পাঁচেক পরেই ফের পোশাক পরে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে একটা হাস্তকর বাসনা অনুভব করলাম। কিন্তু বাড়িতে যে ভয়ঙ্কর অবসন্নতা আমাকে গ্রাস করে ফেলেছিলো, সেই মুহূর্তে সেই নিদারুণ ক্লান্তি আবার ফিরে এসে আমাকে নড়াচড়া করার সমস্ত শক্তি থেকে বঞ্চিত করে তুললো। ওই সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বিছানার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা অনুভব করা সত্ত্বেও আমি সেখানেই পড়ে রইলাম। নাট্যশালার আলোয় যে দেহে ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ আছে আমার বিশ্বাস হয়েছিলো, এখন আমার আলিঙ্গনের মাঝখানে সে আকর্ষণ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। এ শুধু মাংসপেশীর নৈকট্য···বাদবাকি সকলের মতো এ মেয়েটাও স্থূল, দেহসর্বস্ব—যার নৈর্ব্যক্তিক এবং সৌজন্যময় চুমুতে শুধু মাত্র রসুনের মতো আস্বাদ।

তবু মেয়েটির সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি অনেক দিন ধরে এখানে রয়েছো?'

'পনেরোই জানুয়ারীতে ছ মাস হবে।'

'এর আগে কোথায় ছিলে?'

'রোজেল স্ট্রীটে। কিন্তু সেখানকার বাড়িউলী আমার জীবন এমন অতিষ্ঠ করে

ভুলেছিলো যে শেষ অব্দি ওখান থেকে চলে এলাম।'

এই বলে মেয়েটি সেই বাড়িউলীকে নিয়ে বিশদ গল্প ফেঁদে বসলো। কিন্তু হঠাৎ আমাদের ধারে-কাছেই আমি কেমন যেন নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। প্রথমে একটা দীর্ঘশ্বাস। তারপর সামান্য হলেও স্পষ্ট একটা আওয়াজ, ঠিক যেন কেউ কুর্সি থেকে পড়ে গেলো।

এক ঝটকায় বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের আওয়াজ?'

ও শান্ত স্বরে আমাকে আশ্বস্ত করলো, 'অত উত্তেজিত হয়ো না লক্ষ্মীটি! ওটা পাশের ঘরের আওয়াজ। আসলে মাঝখানের দেয়ালগুলো এত পাতলা যে অন্য ঘরের সবকিছুই আমরা শুনতে পাই, মনে হয় যেন এখানেই আওয়াজটা হচ্ছে। ঘর তো নয়, নোংরা কতগুলো বাক্স—পিজবোর্ড দিয়ে তৈরী।'

এত আলসেমি লাগছিলো যে ফের আমি লেপের নিচে ঢুকে পড়লাম, তারপর কথাবার্তা বলতে লাগলাম দুজনে। এক নিবিড় কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হয়ে জানতে চাইলাম ওর প্রথম প্রেমিকের কথা—যে কৌতূহলের জন্যে প্রতিটি পুরুষ-মানুষই তাদের এ ধরনের প্রথম রোমাঞ্চকর অভিযানে এই সমস্ত মেয়েমানুষদের প্রশ্ন করতে শুরু করে, ওদের প্রথম পাপ থেকে পর্দা তুলে ওদের মধ্যে সুদূর নিষ্কলুষতার সন্ধান পেতে চায়, ওদের ভালোবাসবার জন্যে কোনযুক্তি খুঁজে পেতে চায় হয়:তো ওদের অকপট সারল্য আর অনেক দিন আগেকার লজ্জার স্মৃতি থেকে জেগে ওঠা অনর্গল দ্রুত কথাবার্তা থেকে।

জানতাম, ও মিথ্যে কথা বলবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? হয়তো ওর সমস্ত মিথ্যের ভেতর থেকেও আমি কোন আন্তরিক অথবা দুঃখজনক ঘটনা আবিষ্কার করে ফেলতে পারবো।

'বলো, কে ছিলো সে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সে ছিলো একজন নাবিক।

'বেশ, তারপরে বলো। তখন তুমি কোথায় থাকতে?'

'আর্জেঁতিউলে।'

'সেখানে তুমি কি করতে?'

'একটা রেস্তোরাঁতে ঝিয়ের কাজ করতাম।'

'কোন্ রেস্তোরাঁয়?'

'রেস্তোরাঁটার নাম 'তাজা জলের নাবিক'। তুমি চেনো?'

'চিনি, বোনাফানের রেস্তোরাঁ।'

'হ্যাঁ, সেটাই।'

'তা ওই নাবিকটি কিভাবে তোমাকে প্রস্তাব জানালো?'

'আমি তার জন্মে বিছানা করে দিচ্ছিলাম। সে তখন আমাকে জোর দেখিয়ে বাধ্য করে।'

আচমকা ঠিক তখনই পরিচিত এক ডাক্তারের কথা আমার মনে পড়ে গেলো। ভদ্রলোক একটা বিরাট হাসপাতালের ডাক্তার। সেখানে প্রতিদিনই তিনি এই সমস্ত 'কুমারী মাতা' এবং বাজারের মেয়েমানুষদের দেখতে পান, তাদের দুঃখ আর লজ্জার কথা শোনেন। তিনি জানেন, কিভাবে এই হতভাগীরা পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মুসাফিরদের শিকার হয়ে ওঠে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'কোন মেয়েকে নষ্ট করে ঠিক তারই মতো সমপর্যায়ের কোন পুরুষ। এর ওপরে ভিত্তি করে আমার পর্যবেক্ষণ নিয়ে আমি মোটা মোটা বই লিখে ফেলেছি। সাধারণভাবে বড়লোকদের নামে এই দোষ দেওয়া হয় যে, তারাই নির্দোষ ফুলগুলোকে ছিঁড়ে নেয়। কিন্তু তা সত্যি নয়। তারা ফুলের তোড়ার জন্মে পয়সা দেয়। হ্যাঁ, ফুল তারাও বেছে নেয়—কিন্তু সে শুধু ছেঁড়া ফুল, তারা নিজেরা কক্ষনো প্রথমে ফুল তোলে না।'

সঙ্গিনীটির দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি হাসতে শুরু করলাম, 'সেই নাবিকটিই কিন্তু প্রথম পুরুষ নয়। এ কথা তুমি যেমন জানো, আমিও জানি।'

'হ্যাঁ গো, সত্যি বলছি। বিশ্বাস করো—'

'তুমি মিথ্যে বলছো!'

'মোটেই না, আমি দিব্যি করে বলছি!'

'বাজে কথা ছাড়ো তো! সত্যি কথাটা বলো।'

মেয়েটিকে যেন দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হলো, মনে হলো যেন খানিকটা বিস্মিত।

আমি বলেই চললাম, 'জানো তো, আমি একজন জাদুকর—সম্মোহন বিদ্যা জানি। সত্যি কথা না বললে আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলবো, তারপর তোমার কাছ থেকেই সবকিছু জেনে নেবো।'

মেয়েটা ভয় পেয়ে গেলো—এ ধরনের মেয়েরা যেমন বোকা হয়ে থাকে, তেমনি আর কি। বিড়বিড় করে বললো, 'তুমি জানলে কি করে?'

বললাম, 'নাও, এবারে বলো।'

'সেই প্রথমবারে আমার লাভ কিন্তু কিছুই হয়নি। ঘটনাটা হয়েছিলো গাঁয়ের একটা উৎসবের সময়। ওরা সে জন্মে আলেকজাঁদ্র নামে একজন বাবুর্চিকে নিয়ে

এসেছিলো। লোকটা এসে সবাইকেই—এমন কি বাড়ির কর্তা আর গিন্নীকেও হুকুম করতে শুরু করলো, যেন একেবারে রাজামশাই। কিন্তু নিজে উনুনের কাছে এক দণ্ডও দাঁড়াবে না। লোকটার বিরাট লম্বা-চওড়া চেহারা আর ভারি সুন্দর দেখতে। সব সময়েই শুধু এটা চাই, ওটা চাই, মাখন দাও, ডিম আনো, মদ কোথায়—বলে তার সে কি চেঁচামেচি হুলুস্থুলু কাণ্ড! আর মুখ থেকে কোন কথা ফেললে তক্ষুনি তা দৌড়ে ছুটে নিয়ে আসতে হবে, নয়তো এমন মুখ করবে যে স্কার্টের তলা অব্দি লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে।

'দিনটা যখন শেষ হলো তখন সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তামাকের নল ফুঁকছিলো। একগাদা প্লেট নিয়ে আমি সেখান দিয়ে যাচ্ছি, সে আমাকে ডেকে বললো, 'এই যে ছোট্ট হাঁসপাখি, হ্রদের কাছে যাবে চলো। তারপর তুমি আমাকে তোমাদের গাঁ-খানা একটু ঘুরে ফিরে দেখাবে।' বোকার মতো আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। হ্রদের ধারে সবে পৌঁছেছি, হঠাৎ সে এমন জোর করলো যে আমি বুঝতেও পারলাম না, কখন সব কিছু হয়ে গেছে। সেদিনই নটার ট্রেনে লোকটা চলে গেলো। তারপরে আমি আর কোন দিনও তাকে দেখিনি।'

বললাম, 'ব্যাস্? আর কিছু নেই?'

মেয়েটা হোঁচট খেতে খেতে বললো, 'ইয়ে···মানে আমার বিশ্বাস, ফ্লোরেনটাইন আসলে ওরই।'

'ফ্লোরেনটাইন কে?'

'আমার ছোট্ট ছেলেটা।'

'বাঃ চমৎকার! তাহলে তুমি ওই নাবিককে বুঝিয়ে দিয়েছিলে যে, সে-ই ওর বাবা—তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটার পয়সাকড়ি ছিলো?'

'হ্যাঁ। ফ্লোরেনটাইনের ভরণপোষণের জন্যে সে আমাকে তিন লাখ ফ্রাঁ দিয়েছিলো।'

আমি তখন রীতিমতো অবাক হতে শুরু করেছি। বললাম, 'বহুৎ আচ্ছা! তা এখন ফ্লোরেনটাইনের বয়েস কত?'

'বারো বছর,' জবাব দিলো ও। 'এবারের বসন্তেই ও দীক্ষা নেবে।'

'ভালো কথা! কারণ বিবেকের সঙ্গে তাহলে তুমি খানিকটা লেনদেন করেছো।'

হতাশ ভঙ্গিমায় দীর্ঘশ্বাস ফেললো মেয়েটি, 'একটা ছেলের যতটুকু সাধ্য, ততটুকু সে নিশ্চয়ই করবে।'

সেই মুহূর্তে ঘরের অন্যদিক থেকে একটা জোর আওয়াজ শুনে আমি তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে এলাম। মনে হলো কেউ যেন পড়ে গেছে, তারপর দেয়ালে ভর রেখে হাতড়ে হাতড়ে উঠছে। ভীত এবং ক্ষিপ্ত অবস্থায় মোমবাতিটা তুলে নিয়ে আমি খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলাম। মেয়েটিও ততক্ষণে উঠে পড়েছে। আমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে ও বললো, 'ও কিছু না, সোনা! আমি তোমাকে বলছি শোনো, ও কিচ্ছু নয়।'

কিন্তু দেয়ালের কোন্ দিক থেকে ওই বিচিত্র আওয়াজটা এসেছিলো, আমি তখন তা আবিষ্কার করে ফেলেছি। খাটের মাথার দিকে লুকনো দরজাটার কাছে সোজা এগিয়ে গিয়ে একটানে সেটা খুলে ফেলতেই দেখি—বেচারা ছোট্ট একটা ছেলে রয়েছে সেখানে। আতঙ্কভরা দু চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কাঁপছে ছেলেটা। রোগা, পাতলা, ফ্যাকাশে চেহারা। পাশেই খড় বোঝাই একটা বিরাট কুর্সি, সেখান থেকেই পড়ে গিয়েছিলো ও।

আমাকে দেখেই কাঁদতে শুরু করলো বাচ্চাটা। মার দিকে হাত দুটি তুলে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমাকে বোকো না মামণি, আমার একটুও দোষ নেই। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তাই পড়ে গেছি।'

মেয়েমানুষটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, 'কি বলতে চাইছে ও?'

মেয়েটাকে যেন বিভ্রা : দেখালো, মনে হলো যেন মন ভেঙে গেছে ওর। শেষ অব্দি ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'এ ছাড়া আর কি আশা করতে পারো তুমি? আমি এত রোজগার করি না যে বাচ্চাটাকে স্কুলে পাঠাবো। আলাদা একটা ঘর ভাড়া নেবার সঙ্গতিও আমার নেই। যখন আমার কোন সঙ্গী থাকে না, তখন ও আমার সঙ্গেই ঘুমোয়। ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে কেউ এলে ও ওই খুপরিটার মধ্যে দিব্যি চুপচাপ বসে থাকতে পারে—ও জানে, কেমন করে থাকতে হয়। কিন্তু কেউ যখন সারা রাত্রি থাকে—যেমন তুমি—তখন কুর্সিতে বসে থেকে থেকে ওর সমস্ত শরীর ঘুমে ভেঙে আসে। কাজেই ও বেচারার কোন দোষ নেই। তুমি নিজে সারা রাত একটা কুর্সিতে বসে থাকো না, দেখি! তখন তুমিও অন্য গান গাইবে…'

মেয়েটা তখন উত্তেজনায় রেগে উঠেছে, কাঁদছে।

বাচ্চাটাও কাঁদছিলো। বেচারা—দেখে মায়া হয়! লক্ষীটি হয়ে ওই ঠাণ্ডা

অন্ধকার খুপরির মধ্যে বসে থাকে ও। যে মুহূর্তে বিছানা খালি হয়, তখনই সামান্য একটু উষ্ণতার জন্যে বেরিয়ে আসে ওখান থেকে।

আমারও কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো।

আমিও বাড়িতে আমার নিজের বিছানায় ফিরে এলাম।

জেনোয়া থেকে মার্সাইতে যাবার ট্রেনটা সবে মাত্র ছেড়েছে। একদিকে ইস্পাতের পাতের মতো ঝলমলে সমুদ্র, অন্যদিকে ধূসর পাহাড়—দুয়ের মাঝখানে শিলাময় বাঁকা তীরভূমি দিয়ে এগিয়ে চলেছে ট্রেনটা। গুটিসুটি হয়ে চলেছে রূপোলী ঢেউয়ের পাড় বসানো হলুদ বেলাভূমির ওপর দিয়ে। কখনো বা ঢুকে পড়ছে সুড়ঙ্গ পথে, যেমন করে পশুর দল গুহার মধ্যে গিয়ে ঢোকে।

গাড়িটার শেষ কামরায় এক শক্তসমর্থ চেহারার মহিলা আর একটি যুবক মুখোমুখি হয়ে বসেছিলো। দুজনেই নির্বাক, কিন্তু দুজনেই দুজনকে দেখছিলো বারবার। মেয়েটির বয়েস প্রায় পঁচিশ, ঘন নীল রঙা চোখ, ভরাট বুক আর চওড়া চোয়াল। আসলে মেয়েটি পিডমণ্টের এক কৃষক রমণী। কাঠের আসনটার নিচে বেশ কয়েকটা মালপত্তর ঢুকিয়ে, কোলের ওপরে একটা ঝুড়ি নিয়ে, দরজার কাছাকাছি বসে যেন একমনে বাইরের দৃশ্য দেখছিলো ও।

যুবকটির বয়েস প্রায় কুড়ি, পাতলা গড়ন, মাঠে কাজ করার দরুন গায়ের রঙ রোদে-পোড়া। পাশেই একটা কাপড়ের পুঁটলিতে তার সমস্ত জিনিসপত্র। জিনিস বলতে একজোড়া জুতো, একটা জামা, একটা পাতলুন আর একটা বেলচা। কাজের সন্ধানে সে ফ্রান্সে চলেছে।

সময়টা মে মাসের শেষাশেষি। আকাশের সূর্য তীরভূমির ওপরে তার কিছুটা আগুনে-উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসছে মন-মাতানো সৌরভ। কমলালেবুর গাছে ফুল ধরেছে। শান্ত বাতাসে তাদের আকুল করা মধুর সুগন্ধ আশেপাশের গোলাপের সুরভির সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ঘর বাড়ি বাগান সব কিছু ম-ম করছে সেই ভিড় জমানো সুগন্ধে। তীরদেশে এত অসংখ্য গোলাপ যে তাদের সূক্ষ্ম অথচ অপ্রতিরোধ্য সৌরভ মদের চাইতেও মনকে বেশি করে মাতাল করে তোলে। এই আয়েসী বাগানে যেন একটু বেশি সময় কাটাবার জন্যেই ট্রেনটা খানিকটা ঢিলে তালে চলেছে, ছোট ছোট স্টেশনগুলোতেও থামছে, তারপর লম্বা বাঁশি বাজিয়ে ফের চলতে শুরু করছে গদাই লস্করী চালে। তামাম দুনিয়াটাতেই যেন এমনি ঢিলেঢালা ভাব, গ্রীষ্মের এই সকাল বেলায় কোথাও চলাফেরা করাটাও যেন বিরক্তিকর।

মাঝে মাঝেই হৃষ্টপুষ্ট যুবতীটি চোখ বুজছে আর যেমনি বুঝতে পারছে কোল

থেকে ঝুড়িটা পড়ে যাচ্ছে, অমনি হঠাৎ করে চোখ মেলে তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণ ঝুড়িটা সে শক্ত করেই ধরে রাখে, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মিনিট, তারপর ফের ঝিমুতে থাকে। মেয়েটির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, নিঃশ্বাসও নিচ্ছে যেন একটু কষ্ট করে—যেন তাতেও ওর সংকোচ।

যুবকটি তার মাথাটা পুরোপুরি বুকের ওপরে ঝুলিয়ে দিয়ে তোফা একখানা গেঁয়ো ঘুম ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ ট্রেনটা একটা ছোট্ট স্টেশন ছেড়ে যেতেই মেয়েটি পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠলো। তারপর ঝুড়িটা খুলে কিছু রুটি, কয়েকটা সিদ্ধ ডিম, কিছুটা মদ আর কয়েকটা রসালো কুল বের করে খেতে শুরু করলো। আচমকা জেগে উঠে যুবকটি দেখতে পেলো, মেয়েটি খাচ্ছে। হাত দুটো ভাঁজ করে, চাপা ঠোঁট আর শক্ত চোয়াল নিয়ে একদৃষ্টিতে সে কোল থেকে মুখ পর্যন্ত মেয়েটার প্রত্যেকটা গ্রাস লক্ষ্য করতে লাগলো। মেয়েটি স্রেফ পেটুকের মতো খাচ্ছিলো। ডিমগুলো গিলে ফেলবার জন্যে মাঝে মাঝে মদে চুমুক দিচ্ছিলো আর নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু-আধটু থামছিলো—তা ছাড়া খাওয়ার আর বিরাম নেই। আস্তে আস্তে সব কিছুই উবে গেলো—রুটি, ডিম, কুল, মদ বিলকুল সবকিছু। খাওয়া শেষ করে তাকাতেই মেয়েটি বুঝতে পারলো, ছেলেটা এতক্ষণ ওকে লক্ষ্য করছিলো। খানিকটা অস্বস্তি লাগছিলো ওর, তাই কাঁচুলিটা একটু ঢিলে করে নিতে গেলো। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে ফের তাকালো ওর দিকে। কিন্তু ও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জামার বোতাম খুলতে লাগলো। জামাটা আঁট হয়ে চেপে ছিলো এতক্ষণ, তাই বোতাম যতই খোলা হচ্ছিলো মাংসল স্তন দুটিও ততই ছড়িয়ে পড়ছিলো। দুই স্তনের মাংসও দেখা যাচ্ছিলো খানিকটা। যখন মেয়েটি একটু আরাম বোধ করলো তখন ইতালীয় ভাষায় বললো, 'যা গরম, নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না!' যুবকটিও একই ভাষায় একই রকমের উচ্চারণে জবাব দিলো, 'বেড়াবার পক্ষে আবহাওয়াটা কিন্তু ভালোই।'

'আপনি কি পিডমণ্ট থেকে আসছেন?' জানতে চাইলো মেয়েটি।

'আস্তি থেকে।'

'আমি কাসেল থেকে।'

ওরা পাশাপাশি জায়গার লোক, অতএব গল্প শুরু হয়ে গেলো। খেটে খাওয়া মানুষরা বারবার যে সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করে, সে সব সাধারণ কথার আলোচনাই চললো অনেকক্ষণ ধরে। উৎসাহহীন সীমাবদ্ধ মনের পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। ওরা যে যার ঘর-সংসারের কথা বললো। দেখা গেলো, সে ব্যাপারে

ত্বজনের মধ্যেই কিছু কিছু মিল আছে। ত্বজনের কাছেই পরিচিত, এমন কিছু কিছু নামও বললো ওরা। রেশমের মতো মোলায়েম ইতালীয় ঝোঁকের শব্দস্রোত দ্রুত ঝরে পড়তে লাগলো ওদের ঠোঁট দিয়ে। অবশেষে ওরা নিজেদের বিষয়ে এলো। মেয়েটি বিবাহিতা—তিনটি ছেলেমেয়ের মা। বাচ্চাদের ও বোনের কাছে রেখে এসেছে। কারণ মার্সাইতে এক ফরাসী মহিলার কাছে নার্সের কাজ পেয়েছে ও—বেশ ভালো কাজ—এখন সেখানেই চলেছে। যুবকটিও কাজের সন্ধানে মার্সেইতে চলেছে। সে শুনেছে, সেখানে গেলে নাকি চাকরি পাওয়া যেতে পারে।

এর পর তারা কথা থামালো।

ওদিকে উত্তাপ বাড়ছে, গাড়ির ছাদে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। পেছনের ধুলো উড়ে আসছে জানলা দিয়ে। গোলাপ আর কমলাফুলের গন্ধ এখন আরও তীব্র। ওরা ত্বজনে ফের ঘুমিয়ে পড়লো এবং প্রায় একই সময়ে আবার চোখ মেলে তাকালো। সূর্য তখন সমুদ্রের বুকে ডুবে যাচ্ছে, সমুদ্রের নীল জলে সূর্যাস্তের আভা। বাতাস অনেকটা হালকা আর ঠাণ্ডা। এদিকে হবু-নার্সটি তখন হাঁফাচ্ছে। তার জামা-টামা খোলা, চোখত্বটো ঘোলাটে। হতাশার স্বরে সে বললো, 'গতকাল থেকে আমি ত্বধ দিইনি। এখন মনে হচ্ছে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবো।' যুবকটি কোন জবাব দিলো না। মেয়েটি ফের বলে চললো, 'কোন মেয়ের যদি আমার মতো ত্বধ হয়, তবে তাকে দিনে অন্তত তিনবার ত্বধ দিতে হয়—নইলে ভীষণ বিশ্রী লাগে। মনে হয় বুকের ওপরে যেন একটা ওজন চেপে রয়েছে। আমার তো নিশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে. এত ত্বধ থাকা সত্যিই খুব বিপদের ব্যাপার।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?' জিজ্ঞেস করলো যুবকটি।

মেয়েটিকে এখন রীতিমতো অসুস্থ দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। অস্ফুট স্বরে ও বললো, 'একমাত্র উপায় হচ্ছে, চাপ দিয়ে ত্বধগুলোকে বের করে দেওয়া। চাপ দিলে একেবারে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসবে। দেখতে অদ্ভুত লাগে সন্দেহ নেই—গাঁয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই দেখতে আসতো।'

'সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। আপনাকেও দেখাতে পারি—কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না,' বলে চুপ করলো মেয়েটি।

ট্রেন একটা ছোট্ট স্টেশনে এসে থামলো। একটা দরজার কাছে এক মহিলা

বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বাচ্চাটা কাঁদছে। মহিলাটির চেহারা যেমন রোগা-পাতলা, পোশাক-আশাকেও তেমনি দারিদ্র্যের ছাপ।

'ওই যে মহিলাটি, ওকে আমি সাহায্য করতে পারি।' মেয়েটি বললো, 'তাতে আমারও বাচ্চাটার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া হবে।...আমার মন-মেজাজ বিশেষ ভালো নয়, সবাইকে আমার ছেড়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এখন তাতে কিছু এসে যায় না। আমি পাঁচ ফ্রাঁ দিয়ে খুশি হয়েই ওই বাচ্চাটাকে দশ মিনিটের জন্যে দুধ খাওয়াতে রাজী আছি। সেটা বাচ্চাটাকেও ঠাণ্ডা করবে, আমাকেও করবে। তখন আমি একেবারে অন্য মেয়ে হয়ে যাবো।' এক মুহূর্ত থেমে উষ্ণ হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিলো মেয়েটি। তারপর একেবারে ককিয়ে উঠলো, 'উঃ, আমি আর পারছি না! মনে হচ্ছে এবারে মরে যাবো!'

প্রায় হতচেতন অবস্থায় গায়ের জামা সরিয়ে দিলো মেয়েটি, স্তন দুটো ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে এলো। টান টান হয়ে ওঠা বিরাট দুটি স্তন, বাদামী রঙের বোঁটা। বেচারী গোঙানোর মতো করে বললো, 'কি যে করছি, আমি নিজেই তা বুঝতে পারছি না!'

ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করেছে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় তীব্র সুগন্ধ ছড়ানো রাশ রাশ ফুলের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। দূরে দূরে এক একটা মাছ ধরার নৌকো দেখা যায়। স্থির অচঞ্চল সাদা পালের নৌকোগুলো যেন নীল সমুদ্রে ঘুমিয়ে রয়েছে। জলে তার ছায়া দেখে মনে হয়, বুঝি আরেকটা নৌকো উপুড় হয়ে রয়েছে সেখানে।

মেয়েটির কাণ্ডকারখানা দেখে হতভম্ব যুবকটি বললো, 'ইয়ে হয়েছে মাদাম—মানে, আমি কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

'তাহলে আপনি আমার ভীষণ উপকার করবেন,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো মেয়েটি। 'মানে আপনি যদি কিছু মনে না করেন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না... সত্যিই পারছি না!'

যুবকটি ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসলো। মেয়েটিও ঝুঁকে বসে ওর কালো স্তনবৃন্ত দুটি তার মুখের দিকে এগিয়ে দিলো—যেন সে-ই ওর সন্তান। স্তনটাকে দু হাতে যুবকের দিকে তুলে দিতে গিয়ে এক ফোঁটা দুধ বোঁটার ওপরে ফুটে উঠলো। পরম আগ্রহে সেটুকু চেটে নিলো যুবকটি। তারপর দুই ঠোঁট দিয়ে স্তনটাকে আঁকড়ে ধরলো—যেন সেটা একটা পরম লোভনীয় ফল। এবং আস্তে আস্তে চুষে চুষে আগ্রহ ভরে দুধ খেতে লাগলো।

হঠাৎ মেয়েটি বললো, 'হয়েছে—ওটা আর লাগবে না। এবারে এটা নিন।'

বাধ্য ছেলের মতো যুবক অন্য স্তনটা তুলে নিলো। মেয়েটির দুটো হাতই যুবকের পিঠে, খুব আরামে এখন গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ও। ট্রেনের দোলায় দোল খাচ্ছে ফুলের গন্ধ-মেশা হালকা বাতাস।

'বাঃ! এখানে গন্ধটা তো ভারি সুন্দর,' বললো মেয়েটি।

যুবকটি সে কথায় কোন জবাব দেয় না, প্রাণভয়ে স্তনের ঝরনা থেকে দুধ খেয়ে যেতে থাকে একমনে। তার চোখ দুটি বন্ধ, যেন ভারি উপভোগ করছে ব্যাপারটা।

কিন্তু এক সময় মেয়েটি তাকে একটু ঠেলে দিলো, 'খুব হয়েছে। এখন অনেকটা ভালো লাগছে। বাব্বাঃ, যেন নতুন জীবন পেলাম!'

যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে নিলো।

জামার ভেতরে স্তন দুটো ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে মেয়েটি বললো, 'আপনি আমার খুব উপকার করলেন, ম্যঁসিয়। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

কৃতজ্ঞ যুবক উত্তর দিলো, 'কিন্তু আপনাকেই আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, মাদাম। এ জিনিস আমি এর আগে আর কখনও পাইনি।'

অনুতাপ

ম্যঁতেসের সকলেই ম্যঁসিয় সাভেলকে 'পিতা সাভেল' বলেই ডাকে। এইমাত্র তিনি ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। তিনি কাঁদছিলেন।

আজ শরতের এক বিষণ্ণ দিন। বৃষ্টির সঙ্গে মিশে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ছে টুপটাপ। এও যেন এক ধরনের বৃষ্টি—পাতা ঝরার বৃষ্টি। কিন্তু এ বৃষ্টি আরও ভারি, আরও মন্থর।

ম্যঁসিয় সাভেলের মনটা ভালো নেই। তাপচুল্লি থেকে জানলা এবং জানলা থেকে তাপচুল্লি পর্যন্ত বারবার পায়চারি করছিলেন তিনি। জীবনে আলো-অন্ধকার আনন্দ-বিষাদ দুই-ই থাকে। কিন্তু তার এই বাষট্টি বছরের জীবনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি একেবারে একা, নিঃসঙ্গ—অবিবাহিত এক বৃদ্ধ। তাঁর জন্যে ভাববার মতো কেউ নেই। হায় রে, নিঃসঙ্গ মৃত্যু কি মর্মান্তিক—স্নেহস্পর্শ-হীন অনাদৃত মৃত্যু!

নিজের ঊষর অর্থহীন জীবনটার কথা ভাবছিলেন ম্যঁসিয় সাভেল। ভাবছিলেন তাঁর ফেলে আসা দিনগুলোর কথা—তাঁর শৈশব, মা-বাবার ঘর, কলেজ-জীবন, পারীতে সেই শিক্ষানবিসী, বাবার অসুখ আর মৃত্যুর কথা। তারপর মায়ের সঙ্গে থাকার জন্যে ফিরে এলেন তিনি। দুজনের নিরিবিলি শান্ত সংসার—একজন তরুণ, অন্যজন বৃদ্ধা। তখন এর চাইতে বেশি কিছু তিনি চাইতেনও না। হায়, জীবন কতই না দুঃখের! সেই থেকে চিরটা কাল তিনি একা একাই জীবন কাটিয়েছেন আর এখন তাঁরও পালা এসেছে—এবারে শীঘ্রিই তাঁকেও চলে যেতে হবে।' তিনি উধাও হয়ে হারিয়ে যাবেন এবং সেখানেই সব কিছুর শেষ। তারপর পৃথিবীতে সাভেল বলতে আর কিচ্ছু থাকবে না। ওঃ, কি ভয়ঙ্কর কথা! অন্যেরা বেঁচে থাকবে, হাসবে, আনন্দ-ফুর্তি করবে—কিন্তু তিনি আর থাকবেন না! মৃত্যু শাশ্বত আর নিশ্চিত জেনেও মানুষ হাসতে পারে, আনন্দ করে, খুশি হয়—এ কি আশ্চর্য নয়! মৃত্যু যদি শুধু একটা সম্ভাবনা মাত্র হতো, তবে না হয় মানুষ আশা রাখতে পারতো। কিন্তু দিনের পরে যেমন রাত্রি আসে, মৃত্যুও তো তেমনি অবশ্যম্ভাবী!

তবু যদি তাঁর জীবনটা পূর্ণ হয়ে উঠতো! যদি তেমন কিছু করতে পারতেন, যদি রোমাঞ্চকর কোন দুঃসাহসের তীব্র আনন্দ অথবা অন্য কোন ধরনের সফলতা

বা আত্মতৃপ্তি পেতেন! কিন্তু না, তেমন কিছুই নেই। নিয়মিত সময় ধরে বিছানা ছেড়ে ওঠা, খাওয়া এবং আবার শুতে যাওয়া ছাড়া তিনি কক্ষনো কিছু করেননি। এই একইভাবে তিনি বাষট্টিটা বছর অব্দি চলে এসেছেন। অন্য সকলের মতো একটি জীবনসঙ্গিনীও জুটিয়ে নেননি। কিন্তু কেন? কেন তিনি বিয়ে করেননি? সামর্থ্য যখন ছিলো, তখন তিনি নিশ্চয়ই বিয়ে করতে পারতেন। তবে কি সুযোগের অভাবে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন? হতে পারে। কিন্তু সুযোগ তো মানুষ তৈরি করে নিতে পারে! আসলে সে বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। এই নির্লিপ্ত উদাসীনতাই তাঁর সব চাইতে বড় অপূর্ণতা, তাঁর ত্রুটি, তাঁর দোষ। উদাসীনতার জন্যে কত মানুষই না তাদের জীবন নষ্ট করে ফেলে! বিছানা ছেড়ে ওঠা, ঘোরাফেরা করা, দূরের পথে হেঁটে যাওয়া, কথাবার্তা বলা, কোন প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো—এগুলো অনেকের কাছে রীতিমত কঠিন কাজ।

সাভেল কখনো প্রেমে পড়েননি। প্রেমে আত্মহারা হয়ে কোন নারী তাঁর বুকে লুটিয়ে পড়েনি। প্রতীক্ষার মধুর যন্ত্রণা, আলিঙ্গনে বেঁধে রাখা দু হাতের স্বর্গীয় শিহরণ, সফল কামনার অধীর আবেশ—কিছুই তিনি জানেন না।

দুটি অধর যখন প্রথম বার মিলিত হয়, তখন এক অলৌকিক আনন্দের জোয়ারে হৃদয় উপছে ওঠে। চার বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনে দুটি অস্তিত্ব যখন এক হয়ে মিশে যায়, তখন এক অবর্ণনীয় পুলকে দুটি সত্তা মোহাবিষ্ট হয়ে ওঠে পরস্পরের প্রতি। মঁ্যসিয় সাভেলের কাছে এর সব কিছুই চির-অজানা।

আটপৌরে অঙ্গাবরণীটা গায়ে জড়িয়ে তাপচুল্লির বেষ্টনীর ওপরে পা রেখে বসে ছিলেন মঁ্যসিয় সাভেল। জীবনটা তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য ভালো তিনি বেসেছিলেন। কিন্তু বেসেছিলেন নিতান্ত সংগোপনে। সে ভালোবাসা ছিলো বড় যন্ত্রণাময়। এবং নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অন্য সমস্ত বিষয়ের মতো সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একান্ত নির্বিকার। হ্যাঁ, তাঁর পুরনো দিনের সঙ্গী সার্দর স্ত্রী মাদাম সার্দকে ভালোবেসেছিলেন তিনি। ইস, মেয়েটির অল্প বয়সে যদি তিনি ওকে চিনতেন! কিন্তু দেখা হলো অনেক দেরি হয়ে যাবার পর, ততদিনে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। না হলে তিনি অবশ্যই ওকে বিয়ে করতে চাইতেন এবং করতেনও ঠিক তাই। কি ভালোই না ওকে বেসেছিলেন! প্রথম দেখা হবার দিন থেকে সে প্রেমে আর ছেদ পড়েনি কোনদিন। আবেগে আকুল হয়ে নয়—এমনিতেই মঁ্যসিয় সাভেলের মনে পড়লো, যতবার তিনি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন ততবারই বিদায়বেলায় কি

নিদারুণ বেদনাই না তিনি অনুভব করেছেন ! ওর ভাবনায় বিভোর হয়ে কতো রাত তাঁর দু চোখে ঘুম নামেনি। কিন্তু সকালবেলায় যখন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতেন, তখন সন্ধ্যাবেলাকার প্রেমের সেই উদ্দামতা যেন অনেকটা স্তিমিত হয়ে যেত।

কিন্তু কেন ? মেয়েটি আগে দিব্যি সুন্দরী আর পরিপূর্ণা ছিলো। মাথায় রাশ রাশ সোনালী চুল, সর্বদা হাসিখুশি ভাব। সার্দ ওর পছন্দ করে নেবার মতো মানুষ নয়। এখন ওর বয়েস বাহান্ন। দেখে সুখী বলেই মনে হয়। ওহ্, সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে ও যদি তাকে শুধু একটুখানিও ভালোবাসতো ! হ্যাঁ, শুধুমাত্র ভালোবাসা ! ও যদি দেখতে পেতো যে সাভেল ওকে—মানে মাদাম সার্দকে—কতটা ভালোবাসেন, তাহলে ও-ই বা তাকে ভালোবাসবে না কেন !

শুধু ও যদি একটু জানতে পেতো ! কিন্তু ও কি কিছুই জানতে পারেনি ? কিছুই দেখেনি ? কখনো কিছুই অনুমান করেনি ? জেনে থাকলে, ও কি ভাবতো ? তিনি জিগেস করলে কি জবাব দিতো ও ?

এভাবে নিজেকে হাজার রকমের প্রশ্ন করে চললেন সাভেল। মনে মনে নিজের সারাটা জীবন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। মনে পড়লো সার্দর বাড়িতে কাটানো সেই সব দীর্ঘ সন্ধ্যার স্মৃতি, যখন মাদাম সার্দ তরুণী ও প্রিয়দর্শিনী। তখন মাদাম সার্দ সুরেলা গলায় কত কথাই না তাঁকে বলেছে, কত অর্থময় হাসি হেসেছে তাঁর দিকে তাকিয়ে !

সার্দ ডেপুটি কালেক্টরের অফিসে কাজ করতেন। মনে পড়লো প্রতি রোববার তাঁরা তিনজনে সেন নদীর তীর ধরে হেঁটে বেড়াতেন, দুপুরের ভোজ সারতেন ঘাসের ওপরে বসে। আচমকা একটা বিকেলের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে মনে পড়লো ম্যঁসিয় সাভেলের। মাদাম সার্দর সঙ্গে নদীর ধারে একটা ছোট্ট বাগানে সেই বিকেলটা কাটিয়েছিলেন তিনি। এক মাতাল-করা বাসন্তী প্রভাতে ঝুড়ির মধ্যে খাবারদাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। চারদিকের সব কিছুতেই তখন সতেজ সুগন্ধ, সব কিছুতেই খুশি খুশি ভাব। পাখির গানে আরও আনন্দ, ডানায় আরও বেশি চঞ্চলতা। সূর্যের আলোয় ঝলমলে নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা উইলো গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপরে বসে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছিলেন তাঁরা। বাতাস ছিলো সজীব প্রকৃতির মধু সৌরভে ভরা। সব চাইতে সুস্বাদু মদে সেদিন তৃষ্ণা দূর হয়েছিলো তাঁদের।

খাওয়া শেষ হবার পরে সার্দ তাঁর প্রশস্ত পিঠখানা ঘাসের ওপর ছড়িয়ে ঘুমিয়ে

পড়েছিলেন। জেগে উঠে বলেছিলেন, 'এত চমৎকার দিবানিদ্রা আমার সারা জীবনেও হয়নি।'

মাদাম সার্দ তখন সাভেলের হাত ধরে নদীর তীর ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করেছিলো, আলতো হয়ে এলিয়ে পড়েছিলো তাঁর বাহুর ওপরে। হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'আমি মাতাল হয়ে গেছি বন্ধু, একেবারে মাতাল হয়ে গেছি।' সাভেল তখন তাকিয়ে ছিলেন ওর দিকে, হৃৎস্পন্দন বেড়ে উঠেছিলো তাঁর। অনুভব করছিলেন, তিনি বিবর্ণ-হয়ে উঠেছেন। আশা করছিলেন, তিনি হয়তো ততটা সোজাসুজি ওর দিকে তাকাননি, তাঁর হাতের কম্পন হয়তো মনের গোপন বাসনাকে প্রকাশ করে দেয়নি।

বুনো ফুল আর জলপদ্ম মাথায় গুঁজে মাদাম সার্দ তাঁকে জিগেস করেছিলো, 'আমায় এ সাজে দেখতে তোমার ভালো লাগছে না?'

ম্যঁসিয় সাভেল সে কথার কোন জবাব দেননি, কারণ বলার মতো কোন কথাই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বরং ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করছিলো তাঁর। মাদাম সার্দ হেসে উঠেছিলো…খানিকটা অসন্তোষের হাসি সোজা তার মুখের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলো, 'হায় রে বোকার হদ্দ! কি হলো তোমার? অন্তত কথা তো বলতে পারো!'

সাভেলের কান্না পেয়ে গিয়েছিলো, একটা কথাও তিনি খুঁজে পাননি।

সেদিনকার সব স্মৃতি এখন মনে ভেসে উঠছে—এত স্পষ্ট যে যেন আজই সব কিছু ঘটেছে। আচ্ছা, ও কেন বলেছিলো, 'বোকার হদ্দ…কি হলো তোমার …অন্তত কথা তো বলতে পারো?'

মনে পড়লো, কেমন কোমল আবেশে তাঁর বাহুর ওপরে এলিয়ে পড়েছিলো ও। একটা গাছের ছায়ার নিচ দিয়ে যেতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন, ওর কান তাঁর গাল স্পর্শ করছে। হয়তো ও সত্যিকারের শারীরিক নৈকট্য চায় না, এই ভয়ে চকিতে নিজের মাথা সরিয়ে নিয়েছিলেন সাভেল। তিনি যখন জিগেস করেছিলেন, 'এবারে কি আমাদের ফেরার সময় হয়নি?' তখন ও এক পলক তাঁর দিকে তাকিয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় বলেছিলো, 'নিশ্চয়ই!' সেদিন তিনি তেমন করে কিছু ভেবে দেখেননি, কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটাই যেন খুব স্পষ্ট বলে মনে হলো।

'যা তোমার ইচ্ছে,' মাদাম বলেছিলো। 'তুমি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকো, তাহলে ফিরে যাই চলো।'

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি ক্লান্ত হয়েছি, তা নয়। কিন্তু সার্দ হয়তো এতক্ষণে উঠে পড়েছে।'

'তুমি যদি আমার স্বামীর জেগে উঠবার ভয় করো, তো সে আলাদা কথা। চলো, ফেরা যাক।'

ফেরার পথে ও চুপ করেই ছিলো, তাঁর বাহুতেও আর এলিয়ে পড়েনি। কেন? সে সময়ে কক্ষনো তার নিজেকে এ প্রশ্নটা করার কথা মনে হয়নি। সেদিন তিনি যা বুঝতে পারেননি, এখন যেন তা অনুমান করে নিতে পারছেন।

সেটা কি?

মঁ্যসিয় সাভেল অনুভব করলেন, তিনি লাল হয়ে উঠেছেন। এক লাফে উঠে পড়লেন তিনি, নিজেকে যেন তিরিশ বছর বয়সের এক যুবক বলে মনে হলো তাঁর। তিনি নিশ্চিত বুঝলেন যে মাদাম সার্দকে তখন বলা উচিত ছিলো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

কিন্তু তাও কি সম্ভব? মনের মধ্যে এইমাত্র জেগে ওঠা সন্দেহটা তাঁকে রীতিমতো যন্ত্রণা দিতে থাকে। যা তিনি দেখেননি, স্বপ্নেও ভাবেননি—তা-ও কি সত্যি হওয়া সম্ভব? ওফ্, যদি তা সত্যি হয়…যদি এমন সৌভাগ্যকে আঁকড়ে না ধরে তিনি হেলায় তা হারিয়ে থাকেন! মঁ্যসিয় সাভেল নিজেই নিজেকে বললেন, 'আমি জানতে চাই…মনের মধ্যে এমন ধারা সন্দেহ নিয়ে আমি চুপটি করে বসে থাকতে পারি নে। আমাকে জানতে হবে!' দ্রুত পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলেন তিনি। ভাবলেন, 'আমার বয়েস এখন বাষট্টি আর ওর আটান্ন। এখন আমি ওকে কথাটা জিগেস করলে আর ততটা দোষের হবে না।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন মঁ্যসিয় সাভেল।

সার্দর বাড়িটা রাস্তার অন্য ধারে, প্রায় তাঁর নিজের বাড়ির মুখোমুখি। দরজায় আঘাত করতেই অল্পবয়সী একটি ঝি এসে দরজা খুলে দিলো।

'মঁ্যসিয় সাভেল, আপনি এ সময়ে? কোন অঘটন হয়নি তো?'

'না গো, মেয়ে,' মঁ্যসিয় সাভেল বললেন। 'তুমি গিয়ে তোমার গিন্নীমাকে বলো, আমি এক্ষুনি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কিন্তু কথা হচ্ছে, মাদাম এখন উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে শীতের জন্যে নাসপতির আচার তৈরি করে রাখছেন। কাজেই বুঝতে পারছেন, তিনি এখন ঠিক গোছালো অবস্থায় নেই!'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি গিয়ে তাকে বলো যে আমি একটা জরুরী ব্যাপারে তার

সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।'

মেয়েটা চলে গেলে সাভেল বিচলিতভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে বৈঠকখানা ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলেন। অবশ্য নিজেকে তাঁর এতটুকুও বিব্রত বলে মনে হচ্ছিলো না। শ্রেফ রান্নাবান্নার কথা জিগেস করার মতোই তাকে শুধু একটা কথা জিগেস করতে হবে এবং তা হচ্ছে, 'তুমি কি জানো যে আমার বয়েস বাষট্টি বছর?'

ভাবতে ভাবতেই দরজা খুলে মাদাম ভেতরে এসে হাজির হলো। এখন ওর দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। মুখে দিলখোলা হাসি। জামার হাতা কাঁধ অব্দি গোটানো। চিনির রসে ভেজা হাত দুটো শরীর থেকে দূরে রেখে হেঁটে এলো ও। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপার, বন্ধু? তুমি অসুস্থ নও তো?'

'না, সখী। আমি তোমার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই—যা আমার কাছে সব চাইতে দরকারী কথা, যা আমার মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু তার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে যে, তুমি স্পষ্ট করে আমার কথার উত্তর দেবে।'

মাদাম হাসলো, 'আমি সব সময়েই স্পষ্ট কথা বলি। বলো, কি বলবে।'

'বেশ, শোনো। আমি প্রথম যেদিন তোমায় দেখেছিলাম, সেদিন থেকেই তোমাকে ভালোবেসেছি। এ বিষয়ে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে?'

অনেকটা ঠিক আগের মতো স্বরেই হেসে উঠলো মাদাম, 'বোকার হদ্দ! হঠাৎ কি হলো তোমার? সে তো আমি প্রথম দিন থেকেই ভালো করে জানতাম!'

সাভেল কাঁপতে শুরু করলেন। হোঁচট খেতে খেতে বললেন, 'তুমি…তুমি তা জানতে? তাহলে…তাহলে—' বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি।

'তাহলে? তাহলে কি?' জিগেস করলো মাদাম।

'তাহলে…তাহলে তুমি তখন কি ভাবতে? আমি জিগেস করলে কি…কি উত্তর দিতে তুমি?'

হাসির দমকে ভেঙে পড়লো মাদাম। ওর আঙুলের ডগা বেয়ে চিনির রস ঝরে পড়লো গালিচার ওপরে।

'আমি? কিন্তু তুমি তো আমায় কিছুই জিগেস করোনি! কথাটা তো আমারই প্রথমে জানাবার কথা নয়।'

ওর দিকে এক পা এগিয়ে এলেন সাভেল, 'বলো—আমাকে বলো, সেদিনটার কথা তোমার মনে আছে? সেই যেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সার্দ ঘাসের

ওপরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম নদীর বাঁক পর্যন্ত, নিচে…’

ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন সাভেল। মাদাম হাসি বন্ধ করে সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকালো, ‘হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি—নিশ্চয়ই মনে আছে।’

থর থর করে কেঁপে উঠলেন সাভেল, ‘সেদিন আমি যদি…আমি যদি দুঃসাহসী হয়ে উঠতাম, তবে তুমি কি করতে?’

মাদাম হাসতে শুরু করলো। একজন সুখী মহিলা, যার পরিতাপ করার মতো কিছু নেই, একমাত্র তিনিই শুধু এমন হাসি হাসতে পারেন। কণ্ঠস্বরে সামান্য বিদ্রূপের রেশ মিশিয়ে ও স্পষ্ট করে বললো, ‘তাহলে আমি তোমার কাছেই ধরা দিতাম, বন্ধু।’ তারপর ফের আচার তৈরি করার কাজে ফিরে গেলো।

মাথা নিচু করে এক ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন সাভেল, যেন তাঁর বিরাট কোন সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোথায় চলেছেন কিছু না ভেবেই দৈত্যের মতো বিরাট পদক্ষেপে তিনি বৃষ্টির ভেতরে সোজা হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধার অব্দি পৌঁছে গেলেন। তারপর এগিয়ে চললেন ডান দিক ধরে। যেন এক সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় বহুক্ষণ ধরে হাঁটলেন তিনি। বৃষ্টিতে তাঁর পোশাক-আশাক ভিজে সপসপে হয়ে উঠলো। টুপিটা চুপসে হয়ে উঠলো এক টুকরো ন্যাকড়ার মতো, খোড়ো চালের মতো তা থেকে জল ঝরতে লাগলো টুপটাপ করে। তবু সামনের পথ ধরে সোজা এগিয়ে চললেন তিনি। অবশেষে গিয়ে পৌঁছলেন সেই জায়গাটাতে যেখানে অনেক—অনেক দিন আগে তাঁরা দুপুরের খাওয়া খেয়েছিলেন, যার স্মৃতি তাঁর মনটাকে আজও যন্ত্রণায় ভরিয়ে রেখেছে।

‘সেখানে সেই নিষ্পত্র গাছগুলোর তলায় বসে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মঁ্যসিয় সাভেল।

'আমি এখন বুড়ো হয়েছি,' কর্ণেল লাপোর্তে বললেন, 'আমার বাতব্যাধি আছে, বেড়ার খুঁটির মতো আমার পা ছুটো এখন অচল অনড়। কিন্তু এখনও যদি কোন মহিলা, কোন সুন্দরী মহিলা, আমাকে ছুঁচের ফুটো দিয়ে গলে যেতে আদেশ করে তা হলে আমার বিশ্বাস, সার্কাসের জোকার যেমন করে চাকীর মধ্য দিয়ে লাফায় আমিও তেমনি করে লাফিয়ে পড়বো। আমি সেভাবেই মরবো, কারণ সেটা আমার রক্তের মধ্যেই রয়েছে। আমি একজন প্রবীণ অবলাবান্ধব, পুরনো ধ্যান ধারণার ধারক ও বাহক। মহিলা, বিশেষ করে কোন সুন্দরী মহিলাকে দেখলেই আমার পায়ের জুতো অব্দি শিহরণ জাগে। সত্যি বলছি, ঠিক তাই-ই হয়।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা ফরাসীরা সবাই এই একই রকমের। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমরা প্রেম ও বিপদের ত্রাণকর্তা হয়ে থাকবো। কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা যাঁর দেহরক্ষী, সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা এখন বিচ্ছিন্ন।

'কিন্তু আমাদের হৃদয় থেকে কেউ রমণীরত্ন ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেখানে তার অবস্থান চিরায়ত, শাশ্বত। তাকে আমরা ভালোবাসি, ভালোবাসবো। যতদিন ইউরোপের মানচিত্রে ফ্রান্সের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন তার জন্যে আমরা যে কোন ধরনের পাগলামো করে যাবো। এমন কি ফ্রান্স যদিও বা কোনদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবু ফরাসী জাতি চিরদিনই থাকবে।

'নিজের কথাই বলছি—যখন কোন সুন্দরী নারী আমার দিকে তাকায়, আমার মনে হয় আমি যে কোন কাজই করে ফেলতে পারি। যখন অনুভব করি, তার আশ্চর্য চোখ ছুটো আমার দিকে স্থির হয়ে রয়েছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে আমার শিরার মধ্যে—তখন আমার যে কি করতে ইচ্ছে হয় তা ঈশ্বরই জানেন! ইচ্ছে হয় মারামারি করে, ধস্তাধস্তি করে, আসবাবপত্র ভেঙে চুরমার করে প্রমাণ করে দিই যে আমি তাবৎ পৃথিবীর সব চাইতে বড় শক্তিমান সাহসী বেপরোয়া পুরুষ, মানবতার শ্রেষ্ঠতম পূজারী।

'আমি একা নই—শপথ করে বলছি, তামাম ফরাসী বাহিনীর সকলেই এমনি। কোন সুন্দরী মহিলা জড়িত থাকলে সেপাই থেকে শুরু করে সেনাপতি অব্দি আমরা সকলেই ঘটনাটার শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাই। মনে করে দেখুন, সেই প্রাচীন যুগে জোয়ান অফ আর্ক আমাদের দিয়ে কি-ই না করিয়েছিলেন। আমি

বাজি ফেলে বলছি, সেডান-যুদ্ধের আগের দিন রাত্রিবেলা মার্শাল ম্যাকমোহন আহত হবার পর যদি কোন সুন্দরী নারী সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব নিতো, তাহলে আমরা প্রাশিয়ান ব্যূহ পেরিয়ে তাদের কামানের মুখে দাঁড়িয়েই আমাদের জয়োৎসবের ব্রাণ্ডি পান করতাম। ত্রোচু নয়, পারীতে আমাদের প্রয়োজন ছিলো একটি সাঁৎ জেনেভিয়েভের।

'এই প্রসঙ্গে যুদ্ধের একটা ছোট্ট ঘটনা আমার মনে পড়ছে। এই ঘটনাটাতেই প্রমাণ হয় যে, একজন মহিলা উপস্থিত থাকলে আমরা যে কোন কাজই করে ফেলতে পারি।

'সে সময়ে আমি একজন সাধারণ ক্যাপ্টেন। প্রাশিয়রা যে সমস্ত জায়গা বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলো, তারই একটা জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পশ্চাৎদিকবর্তী ঘাঁটি সামলানোর জন্যে যুদ্ধরত একদল স্কাউটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম আমি। মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা ক্রমাগত তাড়া খেয়ে ফিরছি। দেহ ও মনে আমরা তখন শ্রান্ত ক্লান্ত, খিদে আর অমানুষিক পরিশ্রমে মৃতপ্রায় অবস্থা।

'পরের দিনটা শুরু হবার আগেই আমাদের বা-সু-তেইতে পৌছতে হবে, নয়তো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। এতদিন আমরা কি করে বেঁচে এসেছি, জানি না। অবিশ্রান্ত তুষারপাতের মধ্যে পুরু বরফের ওপর দিয়ে রাত্রিবেলা খালি পেটে আমাদের বারো লীগ পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে। ভাবলাম, 'এই শেষ। বেচারারা কোন দিনই জায়গা মতো গিয়ে পৌছবে না'।

'আগের দিন থেকে আমরা কিচ্ছু খাইনি। সারাটা দিন একটু বেশি উষ্ণতা পাবার আশায় গাদাগাদি করে একটা গোলাবাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। কারোরই নড়াচড়া করা বা কথাবার্তা বলার শক্তি নেই, সকলেই চরম ক্লান্তিতে সম্পূর্ণ অবসন্ন মানুষের মতো ঘুমিয়ে পড়ছিলাম যখন-তখন।

'পাঁচটার মধ্যে অন্ধকার নেমে এলো—তুষার-ঝরা দিনের নিরেট ঘন অন্ধকার। লোকগুলোকে ঝাঁকুনি লাগালাম, অনেকেই উঠতে অস্বীকার করলো। ঠাণ্ডায় গাঁটগুলো জমে শক্ত হয়ে যাওয়ায় ওদের যেন হাঁটা চলা করা বা উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও নেই।

'আমাদের সামনে বিস্তীর্ণ এক খোলা প্রান্তর, ঠিক যেন একটা নরক। মাথার ওপরে এক টুকরো আচ্ছাদনও নেই, অথচ সাদা সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি একটা পর্দার মতো হয়ে তুষার ঝরে পড়ছে অবিরাম। ঠিক যেন একটা পুরু প্রাণহীন পশমী আচ্ছাদনের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে সমস্ত বিশ্বচরাচর। মনে হচ্ছিলো, এই

বুঝি পৃথিবীর শেষ।

'এসো সবাই, সারি বেঁধে দাঁড়াও'।

'আকাশ থেকে নেমে আসা সাদা ধুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। যেন ভাবলো, 'যথেষ্ট হয়েছে, আমরা বরং এখানেই মরবো'।

'অতএব আমি রিভলভারটা টেনে নিয়ে বললাম, 'যে পেছবে, তাকেই আগে গুলি করবো'।

'পা অকেজো হয়ে যাওয়া মানুষের মতো ধীরে, অতি ধীরে বেরিয়ে এলো ওরা। চারজন স্কাউটকে তিনশো গজ আগে সামনের সারিতে পাঠালাম আমি। অবশিষ্টরা বিশৃঙ্খল সারিতে, যতটা তাদের শ্রান্ত শরীরে বয় এবং যতটা লম্বা করে তারা পা ফেলতে পারে তেমনিভাবে, অনুসরণ করলো প্রথম দলকে। যারা সব চাইতে বলবান, তাদের আমি রাখলাম সব চাইতে শেষে—আদেশ দিলাম, পেছিয়ে পড়া লোকগুলোর পিঠে সঙ্গিনের গুঁতো মেরে তারা যেন জোরে চলতে বাধ্য করে।

'বলতে গেলে, সেদিন বরফ আমাদের জীবন্ত অবস্থায় কবর দিয়ে ফেলেছিলো। টুপি আর কোটের ওপরে তরল না হওয়া তুষারের প্রলেপ ভূতের মতো করে তুলেছিলো আমাদের—ঠিক যেন ক্লান্তিতে মৃত একদল সৈনিকের ভূত। নিজের মনেই ভাবলাম, কোন অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আমরা কোনদিনই এখান থেকে উদ্ধার পাবো না।

'যারা তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলো না, তাদের জন্যে মাঝে মাঝে কয়েক মিনিট থামছিলাম আমরা। সমস্ত প্রান্তর জুড়ে শুধু তুষারপাতের অস্পষ্ট মৃদু ফিসফিসানি ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিলো না। কয়েকজন নিজেদের ঝাঁকুনি দিয়ে সতেজ করে তুলবার চেষ্টা করছিলো, অন্যেরা এতটুকুও নড়লো না। আমি ফের ওদের এগিয়ে চলার আদেশ দিলাম। পিঠে রাইফেল তুলে, ঝিমিয়ে পড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে আবার ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চললো ওরা।

'হঠাৎ অগ্রবর্তী স্কাউটরা আমাদের কাছে ফিরে এলো। ওদের মধ্যে কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। সামনের দিকে ওরা গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। ছ জন লোক আর একটি সার্জেন্টকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'আচমকা তুষার রাজ্যের নিরেট স্তব্ধতা চিরে নারীকণ্ঠের এক তীক্ষ্ণ চিৎকার বাতাসে ভর করে ভেসে এলো। এবং তার সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজন বন্দীকে নিয়ে আসা হলো আমার সামনে। একজন বৃদ্ধ আর একটি তরুণী।

'চাপা গলায় আমি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। একদল মাতাল প্রাশিয়ান সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় ওদের বাড়িটা দখল করে নিয়েছে, তাদের কাছ থেকেই পালাচ্ছিলো ওরা। মেয়ের নিরাপত্তার জন্যে শঙ্কিত পিতা চাকরবাকরদের পর্যন্ত না জানিয়ে, দুজনে মিলে অন্ধকারে পালিয়ে এসেছে।

'সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম, এরা মধ্যবিত্ত অথবা তার চাইতেও উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ।

'বললাম, 'আমাদের সঙ্গে আসুন'।

'আবার শুরু হলো চলা, শুধু চলা। বৃদ্ধ এ অঞ্চলটা চিনতো বলে আমাদের পথ প্রদর্শকের কাজ করছিলো। ক্রমে তুষারপাত বন্ধ হলো, তারা ফুটলো আকাশের কোলে। আর সেই সঙ্গে ঠাণ্ডার তীব্রতাও বেড়ে উঠলো সাংঘাতিক রকমের। তরুণীটি বাবার হাত ধরে টলমলো পায়ে অতি কষ্টে এগুচ্ছিলো। বেশ কয়েক বারই ও মৃদুভাবে বলছিলো, 'পা দুটো আছে বলে আর বুঝতে পারছি না।' আমার কথা বলতে গেলে—ওভাবে অত কষ্টে বরফের মধ্য দিয়ে মেয়েটির নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলা দেখে, আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম আরও বেশি।

'হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় মেয়েটি। বলে, 'বাবা, আমি এত ক্লান্ত যে আর এগুতে পারছি না'।

'বৃদ্ধ তার মেয়েকে বয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলো, কিন্তু মাটি থেকে তুলতেই পারলো না। একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে অজ্ঞান হয়ে গেলো মেয়েটি।

'সকলে ওকে ঘিরে দাঁড়ালো। আমি একবার সময়টা দেখে নিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, কি করি। লোকটা আর তার মেয়েকে ফেলে রেখে যাবো কিনা, সে বিষয়েও মনস্থির করতে পারছিলাম না।

'তখন আমার লোকজনের মধ্যে পারীর এক তরুণ, যাকে 'রোগা জিম' বলে ডাকা হয়, সে হঠাৎ বলে উঠলো, 'এসো বন্ধুগণ, আমরা এই মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে যাবো। তা না হলে, ধিক আমাদের—বৃথাই আমরা সুসভ্য ফরাসীজাতি বলে বড়াই করি'।

'আমার বিশ্বাস আমিও তখন নির্মল আনন্দে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছিলাম, 'চমৎকার প্রস্তাব! আমিও সে কাজের ভাগ নেবো'।

'বাঁ দিকে একটা ছোট্ট জঙ্গলের গাছপালাগুলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিলো। কয়েকজন ছুটে গিয়ে সেখান থেকে একগোছা ডাল এনে, তা দিয়ে একটা মাচা তৈরি করে ফেললো।

"বন্ধুগণ, একটি সুন্দরী মেয়ের জন্যে কে তার কোটটা খায় মেরে?" প্রশ্ন করলো রোগা জিম।

'দশটা কোট রোগা জিমের পায়ের কাছে এসে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যেই গরম পোশাকের বিছানায় শুয়ে ছয় জওয়ানের কাঁধে উঠে পড়লো মেয়েটি। আমি ছিলাম সামনের দিকে ডান ধারে। সত্যি কথা বলতে কি, এ বোঝা বইতে পেরে ভালোই লাগছিলো আমার।

'আমরা এমনভাবে চলছিলাম যেন আরও প্রাণ আর উত্তাপময় এক গ্লাস সুরা পান করেছি। এমন কি হাসি-মস্করার কথাবার্তাও শুনতে পেলাম। অতএব বুঝতেই পারছেন, ফরাসীদের উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্যে প্রয়োজন শুধু একটি নারীর!

'উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সৈনিকরা নিজেদের মধ্যে আবার প্রায় সত্যিকারের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলো। একজন অনিয়মিত বৃদ্ধ সৈনিক সওয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলো, যাতে বাহকদের মধ্যে একজন ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে তার জায়গা নিতে পারে। মৃদুস্বরে বললেও আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম সে তার পাশের লোকটাকে বলছে, 'এখন আমি আর যুবক নই। কিন্তু যাই বলো বাপু, পুরুষ মানুষের বুকে বল আনতে মেয়েমানুষের তুল্য আর কিছু নেই'।

'ভোর তিনটে পর্যন্ত আমরা প্রায় না থেমেই একটানা এগিয়ে চললাম। হঠাৎ অগ্রবর্তী স্কাউটরা ফের দৌড়ে পেছনে চলে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটা স্রেফ ছায়ার মতো হয়ে বরফের ওপরে শুয়ে পড়লো।

'চাপা গলায় আমি নির্দেশ দিচ্ছিলাম। শুনতে পাচ্ছিলাম, আমাদের পেছন দিক থেকে রাইফেলে গুলি পোরার ধাতব আওয়াজ উঠছে। সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বিচিত্র কিছু নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো ওটা যেন একটা অতিকায় প্রাণী—কখনো সাপের মতো লম্বা হচ্ছে, কখনো নিজেকে গুটিয়ে বলের মতো গোল করে নিচ্ছে, আচমকা এগিয়ে চলছে একবার ডান দিকে আবার বাঁ দিকে, তারপর থেমে গিয়ে চলতে শুরু করছে আবার।

'হঠাৎ সেই চলমান মূর্তিটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমি দেখলাম, ওরা পথ-হারানো বারোজন উলান, ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসছে একের পরে এক। তখন ওরা এত কাছাকাছি চলে এসেছিলো যে ওদের ঘোড়াগুলোর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, রণসজ্জার ঝনৎকার, জিনের মচমচে

আওয়াজ—সবই আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। চিৎকার করে বললাম, 'চালাও গুলি'।

'পঞ্চাশটা গুলির শব্দ রাতের স্তব্ধতা ভেঙে দিলো। তারপর আরও চার পাঁচটা, তারপর একসঙ্গে আবার। পোড়া বারুদের চোখ-ধাঁধানো আলোটা ফিকে হয়ে আসতে দেখলাম, বারোটা লোক আর তাদের ঘোড়াগুলোর মধ্যে নটা ঘোড়া পড়ে রয়েছে। অন্য জানোয়ার তিনটে পাগলের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে। একটা আবার তার সওয়ারীর দেহকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে, রেকাবে একটা পা আটকে যাওয়ার ফলে মাটিতে আছাড় লেগে সাংঘাতিকভাবে লাফাতে লাফাতে চলেছে দেহটা।

'আমার পেছনে একজন সৈনিক দারুণভাবে হেসে উঠলো।

'আর একজন বললো, 'কয়েকজন বিধবা হলো'।

'হয়তো ওই লোকটা বিবাহিত ছিলো।' তৃতীয় জন মন্তব্য করলো, 'আমাদের কিন্তু বেশি সময় লাগেনি'।

'মাচা থেকে একটি মুখ বেরিয়ে এলো, 'কি হচ্ছে?' মেয়েটি জানতে চাইলো, 'যুদ্ধ নাকি'?

''ও কিছু নয়, মাদমোয়াজেল,' আমি জবাব দিলাম, 'এইমাত্র এক ডজন প্রাশিয়ানকে আমরা পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি'।

''আহা, হতভাগা বেচারারা!' অস্ফুটে বললো মেয়েটি। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগার দরুন ফের তক্ষুনি সৈনিকদের কোটগুলোর তলায় উধাও হয়ে গেলো।

'আবার চলতে শুরু করলাম আমরা। অনেকক্ষণ চলার পরে অবশেষে আকাশটা ফিকে হয়ে এলো। বরফগুলো হয়ে উঠলো উজ্জ্বল, ঝলমলে আর দীপ্তিমান। পুব দিগন্তে দেখা দিলো আলোর এক উষ্ণ রেখা।

'দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বললো, 'কে যায়'?

'পুরো বাহিনীটা থমকে দাঁড়ালো। সান্ত্রীকে আশ্বস্ত করার জন্যে আমি এগিয়ে গেলাম—আমরা ফরাসী সীমানায় পৌঁছে গেছি।

'আমার লোকজনেরা যখন সারবন্দী হয়ে সদর দপ্তরের দিকে যাচ্ছিলো, তখন ঘোড়ার পিঠে বসা একজন অফিসার, যাকে আমি সেইমাত্র আমাদের কাহিনীটা বলেছিলাম, তিনি মাচাটাকে নিয়ে যেতে দেখে উঁচু গলায় জিগেস করলেন, 'ওটার মধ্যে কি রয়েছে'?

'সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর একখানা হাসিভরা ছোট্ট মুখ এলোমেলো চুল নিয়ে মাথা

বের করে বললো, 'আমি রয়েছি, মঁ্যসিয়' ।

'লোকগুলোর মধ্যে হাসির দমক ওঠে, নির্মল আনন্দে মন ভরে যায় আমাদের। মাচার পাশে পাশে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসা রোগা জিম তার টুপিটা নেড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'ফ্রান্সের জয়' !

'কেন জানি না, আমি রীতিমতো শিহরণ অনুভব করলাম—ওর ওই ভঙ্গিমা আমার কাছে এত দুঃসাহসী আর শৌর্যময় বলে মনে হলো। মনে হলো, এইমাত্র আমরা যেন দেশমাতৃকাকে রক্ষা করেছি—এমন কিছু করেছি যা অন্যেরা করতে পারতো না। কাজটা সহজ, কিন্তু সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের কাজ।

'মেয়েটির সেই ছোট্ট মুখখানা আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না। দুন্দুভি আর রণশিঙা বিলোপ করার সম্পর্কে আমাকে মতামত দিতে বললে, আমি সেগুলোর বদলে প্রতিটি সেনাদলের সঙ্গে একটি করে সুন্দরী মেয়েকে যুক্ত করার প্রস্তাব দিতাম। ফরাসী বিপ্লবীদের গান 'মার্সাইএজ'-এর চাইতে তাতে ভালো ফল হতো। ওঃ ঈশ্বর, কর্ণেলের পাশাপাশি একটি জলজ্যান্ত ম্যাডোনাকে এগিয়ে যেতে দেখলে সাধারণ সেনাবাহিনীর মধ্যে কি ভীষণ উৎসাহই না জাগতো !'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু থেমে কর্ণেল মাথা দুলিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ফের বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা ফরাসীরা প্রচণ্ড রমণীপ্রেমিক।'

ওয়াল্টার শ্লাফসের অভিযান

দখলদার বাহিনীর সঙ্গে ফ্রান্সে ঢোকার পর থেকেই ওয়াল্টার শ্লাফস নিজেকে তাবৎ পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশি দুর্ভাগা বলে মনে করছিলো। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা তার, কিন্তু হাঁটতে বড় কষ্ট—নিশ্বাস ফেলে ভোঁসভোঁস করে। ভীষণ মোটা আর বদখত রকমের পা দুটো নিয়ে তার যন্ত্রণার শেষ নেই। বাইরে থেকে দেখলে তাকে শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী মানুষ বলেই মনে হয়। লোকটা সাহসীও নয়, রক্ত-পিপাসুও নয়। চারটি সন্তানের জনক সে, ওদের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা। তরুণী স্বর্ণকেশী স্ত্রীর আদর যত্ন আর কোমলতার কথা ভেবে প্রতিটি সন্ধ্যাতেই ভীষণ মন খারাপ লাগতো তার। দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, তাড়াতাড়ি বিছানায় শুতে যাওয়া, ভালো-মন্দ জিনিস রয়ে সয়ে খাওয়া আর কাফেতে বসে বিয়ার পান করা ছিলো তার প্রিয় অভ্যেস। কিন্তু বর্তমানের এই জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্বের সবটুকু আনন্দই উধাও হয়ে গেছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং যুক্তিযুক্ত কারণেই কামান, বন্দুক, রিভলভার ও তলোয়ার সম্পর্কে তার সাংঘাতিক ভীতি ও বিতৃষ্ণা। বিশেষ করে সঙ্গিন নামক বস্তুটাকে তার ভীষণ ভয়—সে নিজেই অনুভব করে যে, যথেষ্ট দ্রুত এদিক ওদিক সরে গিয়ে অমন একটা অস্ত্রের আক্রমণ থেকে নিজের বিশাল দেহটাকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা তার নেই।

রাত্রি নেমে এলে মাটিতে সঙ্গীদের পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তো সে। সঙ্গীদের নাক ডাকতো আর সে ভাবতো অনেক দূরে জার্মানীতে ফেলে আসা তার বাড়ির কথা, সারা পথের অজস্র বিপদ-আপদের কথা। 'আমি যদি মারা পড়ি, তবে বাচ্চাগুলোর কি হবে?' ভাবতো সে। 'কে তাদের খাওয়াবে আর কে-ই বা তাদের বড় করে তুলবে?' যদিও আসবার সময় সে ধারদেনা করে কিছু টাকা-পয়সা রেখে এসেছে, কিন্তু সেজন্যে তারা বড়লোক হয়ে ওঠেনি।...এসব কথা ভেবে মাঝে মাঝে কাঁদতো ওয়াল্টার শ্লাফস।

যুদ্ধের শুরুতে সে অনুভব করতো, তার হাঁটু দুটো দুর্বল হয়ে উঠেছে। পড়ে গেলে সমস্ত বাহিনীটাই তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে—এ কথা জানা না থাকলে সে হয়তো পড়েই যেতো। গুলি ছোটার সাঁইসাঁই আওয়াজে তার চুল খাড়া হয়ে উঠতো। প্রথম কটা মাস এমনিধারা আতঙ্ক আর উদ্বেগ নিয়ে দিন কেটেছে তার।

তাদের বাহিনী তখন নর্মাণ্ডির দিকে এগুচ্ছিলো। একদিন তাকে ছোট একটা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে পাঠানো হয়। আসলে জায়গাটা চিনে এসে খবর দেওয়াই ছিলো তার কাজ। গ্রামটা একেবারে শান্ত বলেই মনে হয়েছিলো তার, প্রতিরোধের কোন চিহ্নই ছিলো না কোথাও। একটা গভীর গিরিখাতে দ্বিধাবিভক্ত ছোট্ট উপত্যকাটাতে নিঃশব্দে নেমে আসছিলো প্রাশিয়ানরা। হঠাৎ হিংস্র এক ঝাঁক গুলি তাদের থামিয়ে দিলো, শত্রুরা পাঁচজনকে শুইয়ে দিলো ভূমিশয্যায়। পরক্ষণেই ছোট একটা জঙ্গল থেকে সুদক্ষ একদল বন্দুকবাজ সঙিন উঁচিয়ে এগিয়ে এলো তাদের দিকে।

প্রথমটাতে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলো ওয়াল্টার শ্নাফস। বিস্ময় আর আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে সে পালাবার কথা পর্যন্ত চিন্তা করেনি। তারপর ছুটে পালাবার একটা মূর্খ বাসনা তাকে পেয়ে বসলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝলো, তা অসম্ভব। কারণ এক পাল ছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসা ছিপছিপে চেহারার ফরাসীদের তুলনায় তার গতি হবে কচ্ছপের মতো। ফলে ছ পা দূরে ঝোপঝাড় আর মরা পাতায় ঢাকা একটা বড়সড় গর্ত দেখে, সেটা কতখানি গভীর হতে পারে তা চিন্তা পর্যন্ত না করে, ওয়াল্টার দু পা তুলে ঝাঁপ দিলো তার মধ্যে—যেমন করে মানুষ সাঁকো থেকে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোটা লতা আর তীক্ষ্ণ ডালপালার আচ্ছাদন ভেদ করে সবেগে ছুঁড়ে দেওয়া বর্শার মতো পড়তে লাগলো তার শরীরটা। মুখ আর হাত দুটো ছড়ে গেলো। অবশেষে দেখলো, পাথুরে জমির ওপরে সশব্দে বসে পড়েছে সে। চোখ তুলে একটা ফাঁকের ভেতর দিয়ে আকাশটা দেখতে পেলো সে—ওপর থেকে পড়ার সময় সে নিজেই ওই ফাঁকটা তৈরি করেছে। এই ফাঁকের ভেতর দিয়েই হয়তো ওরা তাকে আবিষ্কার করে ফেলবে ভেবে, যত দ্রুত সম্ভব চার হাত পায়ে গুঁড়ি মেরে অতি সন্তর্পণে একটা ধারে গাছপালার নিরাপদ আচ্ছাদনের নিচে সরে গেলো সে। তারপর শুকনো ঘাসবনের মধ্যে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকা খরগোশের মতো বসে রইলো চুপটি করে।

আরও কিছুক্ষণ গোলাগুলির আওয়াজ, আহতদের চিৎকার শুনতে পেলো সে। তারপর যুদ্ধের কোলাহল ক্ষীণ হতে হতে এক সময় একেবারেই থেমে গেলো—শান্ত, স্তব্ধ হয়ে উঠলো চতুর্দিক।

হঠাৎ তার কাছেই কি যেন একটা নড়ে উঠলো, শিউরে উঠলো সে। আসলে সেটা ছোট্ট একটা পাখি—ডালের ওপরে বসে কয়েকটা শুকনো পাতা ঝরিয়ে ফেলেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে মানুষটার হৃৎপিণ্ড একেবারে জোর কদমে

টিপটিপ করতে লাগলো।

গিরিখাতে ছায়া ফেলে রাত্রি নেমে এলো। সৈন্যটি ভাবতে শুরু করলো এবার। এখন সে কি করবে? কি হবে তার? আবার কি নিজের দলেই যোগ দেবে সে? কিন্তু কি ভাবে? এবং কোথায়? যুদ্ধের শুরু থেকে যে আতঙ্ক, ক্লান্তি আর যন্ত্রণার জীবন সে যাপন করে চলেছে, আবার সে জীবন শুরু করার কোন প্রয়োজন আছে কি? না! সে সাহস তার কখনই হবে না। সেই কুচকাওয়াজ করা আর প্রতিটি মুহূর্তে বিপদের মোকাবিলা করার মতো উৎসাহ তার আর কক্ষনো হবে না।

কিন্তু এখন কি করা যায়? যুদ্ধবিগ্রহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চয়ই এই গর্তের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। অবশ্য খাওয়া-দাওয়া বলে একটা ব্যাপার যদি না থাকতো, তবে এ প্রস্তাবটা তার কাছে হয়তো ততটা ফেলনা বলে মনে হতো না। কিন্তু খেতে তাকে হবেই, প্রতিদিনই খেতে হবে।

ওয়াল্টার ভেবে দেখলো—সে এখন নিঃসঙ্গ, নিরস্ত্র। তার পরনে সৈনিকের উর্দি, সে রয়েছে শত্রুদলের এলাকায়। যারা তাকে রক্ষা করতে পারে, তাদের কাছ থেকে সে রয়েছে অনেক দূরে। ভাবতেই একটা শীতল স্রোত বয়ে গেলো তার সমস্ত শরীর দিয়ে। হঠাৎ করেই তার মনে হলো, 'ইস্, আমি যদি বন্দী হতাম!' সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদের হাতে বন্দী হবার এক অস্বাভাবিক ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় তার মন দুলে উঠলো। বন্দী হলে সে খেতে পাবে, গুলিগোলা থেকে নিরাপদ আশ্রয় পাবে, সুরক্ষিত প্রহরায় কয়েদখানার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবে। একজন বন্দী! আহা, কি মধুর স্বপ্ন!

তক্ষুনি সে মনস্থির করে ফেললো, 'আমি যাবো। গিয়ে বন্দী হিসেবে আত্মসমর্পণ করবো।' একটা মিনিটও দেরি না করে পরিকল্পনাটার বাস্তব রূপ দেবার জন্যে উঠে পড়লো সে। কিন্তু আচমকা মনের মধ্যে কাপুরুষের মতো চিন্তা এবং একটা নতুন আতঙ্ক জেগে ওঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সেখানেই।

আত্মসমর্পণ করার জন্যে কোথায় যাবে সে? কিভাবেই বা যাবে? কোন্ দিকে যাবে? মৃত্যুর সমস্ত ভয়ঙ্কর ছবি তার মনে এসে হানা দিলো। ধাতুর এই ছুঁচলো শিরস্ত্রাণটা মাথায় নিয়ে একা একা গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলতে গেলে, সে যে কোন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে। যদি গাঁয়ের কোন লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? দলছুট প্রতিরোধহীন একজন প্রাশিয়ানকে দেখতে পেলে এই চাষাগুলো তাকে একটা রাস্তার কুকুরের মতো খুন করে ফেলবে! খুন করবে

তাদের কাঁটাওয়ালা কুড়ুল, গাঁইতি, কাস্তে আর শাবল দিয়ে। বিজয়ীর বন্য ক্রোধে তারা ওকে দলা পাকিয়ে মাংসের কিমা করে ফেলবে।

আর যদি অভ্রান্ত নিশানার কোন বন্দুকবাজদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়? আইন-শৃঙ্খলাহীন ওই লোকগুলো নিজেদের মধ্যে ফুর্তি করার জন্যে, সময় কাটাবার জন্যে, তার মুখের অবস্থা দেখে মজা লোটার জন্যে স্রেফ তাকে গুলি করে বসবে। ওয়াল্টার কল্পনা করছিলো, সে যেন একটা দেয়ালের দিকে পিঠ রেখে এক ডজন বন্দুকের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বন্দুকের নলের ছোট্ট গোল অন্ধকার গর্তগুলো যেন তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

আর ফরাসী সেনাবাহিনীর সঙ্গেই যদি তার দেখা হয়ে যায়? অগ্রবর্তী সান্ত্রীটা তাহলে নিশ্চয়ই তাকে একজন গুপ্তচর বলে ধরে নেবে। ভাববে, শত্রুদলের এই সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু লোকটাকে নিশ্চয়ই তাদের খবরাখবর নেবার জন্যে পাঠানো হয়েছে। এবং তাহলে সান্ত্রীটা তক্ষুনি তাকে গুলি করে বসবে। ইতিমধ্যেই যেন ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা সৈনিকদের ইতস্তত গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো ওয়াল্টার। দেখতে পাচ্ছিলো, সে যেন খোলামাঠের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে…গুলিতে তার শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সে যেন অনুভব করছিলো, গুলিগুলো তার মাংসপেশীর ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

হতাশ হয়ে আবার বসে পড়লো ওয়াল্টার। তার পক্ষে পরিস্থিতিটা আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়।

তখন রাত্রি নেমে এসেছে, নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত। ওয়াল্টার আর নড়াচড়া করছিলো না, অন্ধকার থেকে ভেসে আসা প্রতিটা অচেনা এবং সামান্য আওয়াজের দিকেই তাকিয়ে থাকছিলো প্রাণপণে। গর্তের ধারে লাফালাফি করা একটা খরগোশ ওয়াল্টারকে প্রায় পালাতে বাধ্য করে তুলেছিলো আর কি। পেঁচার তীক্ষ্ণ চিৎকার এক আচমকা আতঙ্কে তার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছিলো। অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টায় ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো সে। প্রতিমুহূর্তেই তার মনে হচ্ছিলো, কে যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

সীমাহীন মানসিক যন্ত্রণায় অনন্ত প্রহর কাটাবার পর ডালপালার আচ্ছাদনের ভেতর দিয়ে সে দেখলো, আকাশ উজ্জ্বল হয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে এক পরম স্বস্তি নেমে এলো তার মধ্যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এলিয়ে পড়লো হঠাৎ, হৃৎস্পন্দন সহজ

হয়ে উঠলো, চোখ দুটো বুজে এলো—ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ঘুম ভেঙে সূর্যটাকে মাঝ আকাশের কাছাকাছি বলে মনে হলো তার। কাজেই এটা দুপুর হওয়াই উচিত। কোন আওয়াজই প্রান্তরের একঘেয়ে নিস্তব্ধতায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না। ওয়াল্টার শ্নাফস অনুভব করলো, প্রচণ্ড খিদেয় সে কাতর হয়ে উঠেছে। হাই তুললো সে। চমৎকার সামরিক সসেজের কথা মনে হতেই মুখ ভরে জল এলো তার। অথচ তার পেটের মধ্যে কেমন যেন যন্ত্রণা হচ্ছিলো একটা।

উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলো সে। কিন্তু পা দুটো দুর্বল মনে হওয়ায় ফের বসে পড়ে চিন্তা করতে লাগলো। তিন-চার ঘণ্টা ধরে প্রতি মুহূর্তে মত পালটে, পক্ষে-বিপক্ষে নানান যুক্তি খাড়া করে, নিজের সঙ্গেই তর্কবিতর্ক করলো সে। কিন্তু শেষ অব্দি পরস্পরাবরোধী যুক্তিতর্কে নিজেই একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠলো।

একটা চিন্তা তার কাছে যুক্তিপূর্ণ আর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো। তা হচ্ছে, কোন নিঃসঙ্গ গ্রামবাসীর হাঁটা-চলার দিকে নজর রাখা। তবে লোকটার কাছে অস্ত্র বা কোন ভয়ঙ্কর যন্ত্রপাতি থাকলে চলবে না। সে ছুটে গিয়ে তার হাতে ধরা দেবে, বুঝিয়ে বলবে যে সে আত্মসমর্পণ করছে। শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেললো ওয়াল্টার শ্নাফস, কারণ সেটা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তারপর অতি সন্তর্পণে মাথাটা গর্তের ভেতর থেকে বের করে আনলো।

কোথাও কোন লোকজন নজরে এলো না। ডান দিকের ছোট্ট গ্রামটা ছাদগুলো থেকে আকাশে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। তার মানে রান্নাঘরের ধোঁয়া। বাঁ দিকে এক সারি গাছের পরে অনেক মিনারওয়ালা একটা বিশাল দুর্গ। অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্ধ্যা অব্দি অপেক্ষা করে রইলো ওয়াল্টার। কিন্তু কাকের ঝাঁক ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেলো না…নিজের পেটের গুড়গুড় শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পেলো না।

আবার রাত্রি নেমে এলো তার ওপরে। নিজের গোপন আশ্রয়ে শরীর বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে—দুঃস্বপ্নে ভরা ক্ষুধার্ত মানুষের ঘুম। তারপর ভোর হলো। আবার নজর রাখতে শুরু করলো সে। কিন্তু গ্রাম্য অঞ্চলটা ঠিক আগের দিনের মতোই জনশূন্য। একটা নতুন ভয় জেগে উঠলো ওয়াল্টার শ্নাফসের মনে—ক্ষুধায় মৃত্যু হবার ভয়। নিজেই দেখতে পেলো, যেন গর্তের তলায় হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে সে, চোখ দুটো বোজা।…এখনই কিছু কিছু প্রাণী, সব রকমেরই প্রাণীরা এসে তার মৃতদেহটা খেতে শুরু করবে…সব দিক দিয়ে

একসঙ্গে আক্রমণ করবে তাকে···পোশাকের নিচে ঢুকে দাঁত বসাবে তার ঠাণ্ডা মাংসে···বিশাল এক দাঁড়কাক এসে তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে নেবে তার চোখ দুটো।

সে আর হাঁটতে পারবে না, দুর্বলতায় সে মূর্ছা যেতে বসেছে—এ সব কথা ভেবে উন্মাদ হয়ে উঠলো ওয়াল্টার শ্নাফস। অবশেষে গ্রামের দিকেই রওনা দেবে বলে তৈরি হয়ে নিলো সে—ঠিক করলো কোন কিছুকেই সে পরোয়া করবে না, সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করবে। কিন্তু তখনই দেখতে পেলো, তিনজন চাষী কাঁধে কাঁটাওয়ালা কুড়ুল নিয়ে মাঠে চলেছে। তাই আবার নিজের লুকিয়ে থাকার জায়গায় সেঁধিয়ে গেলো সে।

সন্ধ্যা যখন সমস্ত প্রান্তরটাকে আবার অন্ধকার করে তুললো, তখন আস্তে আস্তে গর্তটা থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে গুঁড়ি মেরে দূরের দুর্গটার দিকে এগুতে লাগলো সে। হৃৎপিণ্ডটা ঢিপঢিপ করছিলো তার। গ্রামের চাইতে দুর্গটাতে গিয়ে ঢোকাই সে পছন্দ করছিলো বেশি, গ্রামটাকে তার মনে হচ্ছিলো বাঘের গুহার মতো ভয়ঙ্কর।

দুর্গের নিচের দিককার জানলাগুলোয় ঝলমলে আলো, একটা জানলা খোলা। সেখান থেকে রান্না করা খাবারের তীব্র গন্ধ ওয়াল্টার শ্নাফসের নাকের ফুটো দিয়ে শরীরের গভীরে ঢুকে সমস্ত দেহটাকে উত্তেজিত করে তুললো—আকুল হয়ে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো সে। দুর্নিবার সেই আকর্ষণ বেপরোয়া করে টেনে নিয়ে চললো তাকে। তারপর আচমকা কোন কিছু না ভেবেই, মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে জানলার কাছে এসে হাজির হলো সে।

একটা বিরাট টেবিলকে ঘিরে চাকরবাকরেরা রাতের খাওয়া সেরে নিচ্ছিলো। হঠাৎ একটা চাকরাণী একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেলো—তার মুখটা তখনও হাঁ করা, হাত থেকে গ্লাসটা পড়লো খসে, চোখের দৃষ্টি স্থির। সকলে অনুসরণ করলো তার দৃষ্টিকে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে দেখে ফেললো তারা। হা ভগবান! প্রাশিয়ানরা দুর্গটা আক্রমণ করেছে তাহলে!

প্রথমে আটটা ভিন্ন ভিন্ন স্বরের এক সম্মিলিত ভয়ার্ত চিৎকার, তারপরেই একেবারে দূরতম প্রান্তের দরজাটাকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি, ধস্তাধস্তি। কুর্সিগুলো পড়লো উলটে, আগে আগে বেরোবার জন্যে পুরুষরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো মেয়েদের। দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই ঘরটা একেবারে ফর্সা। ওয়াল্টার শ্নাফস তখনও অবাক হয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে—তার সামনে টেবিল ভর্তি খাবার।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর এক লাফে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে

থালাগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো সে। নিদারুণ খিদে জরাক্রান্ত মানুষের মতো কাঁপিয়ে তুলছিলো তাকে। কিন্তু আতঙ্ক তখনও তাকে অবশ করে রেখেছে। সে শুনলো, সমস্ত বাড়িটাতে প্রচণ্ড সোরগোল চলেছে। দরজাগুলো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। ওপর তলার মেঝেতে দ্রুত পায়ে ছোটাছুটির শব্দ। বিচলিত প্রাশিয়ানটি কান খাড়া করে ওই বিভ্রান্তিকর শব্দগুলো শুনতে লাগলো। শুনলো ভারি কিছু পড়বার আওয়াজ—যেন দোতলা থেকে প্রাচীরের কাছে নরম মাটিতে কারা সব লাফিয়ে পড়ছে। তারপর সমস্ত চাঞ্চল্য, সমস্ত উত্তেজনা থেমে গেলো—কবরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো বিশাল দুর্গটা।

একেবারে না-ছোঁয়া একটা থালার সামনে বসে খেতে শুরু করলো ওয়াল্টার শ্নাফস। যথেষ্ট খাওয়ার আগেই যদি বাধা পড়ে, যেন সেই ভয়েই মুখ ভর্তি করে গোগ্রাসে গিলছিলো সে। দু হাতে খাবারের টুকরোগুলো তুলে মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো, যেন মুখটা একটা খুলে রাখা ফাঁদ। বড় বড় খাবারের টুকরোগুলো তার গলায় যন্ত্রণা দিতে দিতে পাকস্থলীতে নেমে যাচ্ছিলো একের পর এক। অতিরিক্ত ঠাসা নলের মতো কণ্ঠনালীটা ফেটে যাবে বলে মনে করে, মাঝে মাঝে একটু বিরাম দিচ্ছিলো সে। আর আটকে যাওয়া নল পরিষ্কার করার মতো করে ভৃঙ্গার থেকে সুরা ঢেলে দিচ্ছিলো গলার মধ্যে।

সব কটা থালা, সবগুলো বোতল নিঃশেষ করে ফেললো শ্নাফস। খাদ্য আর পানীয়তে বোঝাই হয়ে তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। মুখটা লাল, চকচকে। হিক্কা উঠতে লাগলো ঘনঘন। আর একটা পা ফেলারও শক্তি নেই। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে উর্দির বোতামগুলো খুলে দিলো সে। চোখ দুটো বুজে গেলো, অস্পষ্ট হয়ে এলো চিন্তাভাবনাগুলো। টেবিলের ওপরে আড়াআড়িভাবে রাখা দু হাতের ওপরে ভারি মাথাটা নামিয়ে আনলো সে, তারপর মধুর আবেশে পরিবেশ সম্পর্কে সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেললো এক সময়।

বাগানের গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো, ক্ষয়ে যাওয়া বাঁকা চাঁদটা দিগন্তের কোলে আবছা আলো ছড়িয়ে রেখেছে। দিন শুরু হবার ঠিক আগে এই সময়টুকুতে বড় ঠাণ্ডা। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দু-এক টুকরো জ্যোৎস্না ঝলকাচ্ছে ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ফলার মতো। স্বচ্ছ আকাশের পটভূমিকায় নিস্তব্ধ দুর্গটা যেন একটা বিশাল কালো ছায়ামূর্তি। শুধু একতলার দুটো জানলায় তখনও উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি।

হঠাৎ একটা বজ্রকণ্ঠ চিৎকার করে উঠলো, 'এগিয়ে চলো। আক্রমণ করো।'
সঙ্গে সঙ্গে জনস্রোতের জোয়ারে দরজা জানলা এমন কি খড়খড়িগুলো পর্যন্ত ভেঙে পড়লো। আপাদমস্তক সশস্ত্র পঞ্চাশজন লোক দৌড়ে গেলো রান্নাঘরের দিকে, যেখানে পরম শান্তিতে ওয়াল্টার শ্নাফস তখনও ঘুমোচ্ছে। বুকের কাছে গুলি ভরা বন্দুক ধরে ওরা তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো, তারপর বেঁধে ফেললো হাতপাগুলো।

অবাক বিস্ময়ে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলো না ওয়াল্টার শ্নাফস। কিছুই বুঝতে পারছিলো না সে। প্রচণ্ড মারের চোটে ভয়ে তার পাগল হবার মতো অবস্থা। হঠাৎ সোনালী ফিতে লাগানো সৈনিকদের মতো দেখতে মোটাসোটা একটা লোক তার গায়ের ওপরে পা চড়িয়ে বাজখাঁই গলায় বললো, 'তুমি আমার বন্দী! আত্মসমর্পণ করো।'

প্রাশিয়ানটি শুধু 'বন্দী' শব্দটাই বুঝলো, যন্ত্রণায় কাত্‌রে উঠলো সে।

টেনে তুলে একটা কুর্সির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো ওয়াল্টারকে। বিজয়ী বীরেরা উন্মুখ আগ্রহে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। শুশুক জাতীয় প্রাণীর মতো তারা তখন ফুলে ফুলে উঠছিলো…উত্তেজনা আর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বসে পড়েছিলো অনেকেই।

ওয়াল্টার হাসলো। এখন সে হাসতে পারে, কারণ অবশেষে সে বন্দী হয়েছে—এটা একেবারে নিশ্চিত।

একটি অফিসার ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলো, 'কর্ণেল, শত্রুদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, তাদের মধ্যে অনেকেই আহত। এখন আমরাই এখানকার অধিকর্তা।'

মোটা অফিসারটি তার ভ্রূজোড়া মুছে নিয়ে হুঙ্কার করে উঠলেন, 'আমাদের জয়!' তারপর পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবই বের করে লিখে নিলেন, 'প্রচণ্ড সংগ্রামের পর প্রায় পঞ্চাশজন হতাহতদের নিয়ে প্রাশিয়ানরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছে। কয়েকজন বন্দীও হয়েছে আমাদের হাতে।'

তরুণ অফিসারটি জানতে চাইলো, 'এখন আমাদের কি করতে হবে, কর্ণেল?'

কর্ণেল জবাব দিলেন, 'গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাপক পুনরাক্রমণ এড়াবার জন্যে আমরা এখন পেছিয়ে যাবো।'

দুর্গ প্রাচীরের ছায়ায় আবার সার বেঁধে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলো সকলে। ছজন যোদ্ধা রিভলভার হাতে ঘেরাও করে খুব সাবধানে পাহারা দিয়ে

নিয়ে চললো ওয়াল্টার খ্রাফসকে। পথঘাটের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে স্কাউটদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো সকলের আগে, মাঝে মধ্যে থেমে থেমে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললো তারা। দিনের আলোয় সকলে গিয়ে পৌঁছলো লা-রোশ-ওয়েসলে সহ-অধ্যক্ষের অফিসে, যার জাতীয় রক্ষীবাহিনী যুদ্ধে এই পরম কৃতিত্বটি দেখিয়েছে।

উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত শহরবাসী তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। বন্দীর শিরস্ত্রাণটা দেখামাত্র তাদের মধ্যে ভয়চকিত চিৎকার উঠলো। মেয়েরা তাদের দু হাত উঁচুতে তুলে ধরলো, বৃদ্ধেরা কাঁদতে লাগলে—একজন বুড়ো ঠাকুরদা তার ক্রাচটা প্রাশিয়ানটিকে ছুঁড়ে মারায় সেটা লাগলো একজন প্রহরীর নাকে।

কর্নেল চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্দীর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখুন!'

অবশেষে গণ-ভবনে গিয়ে পৌঁছলো সকলে। কয়েদখানার দরজা খোলা হলো, বাঁধন খুলে ওয়াল্টার খ্রাফসকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো তার মধ্যে। দুশো জন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত হলো বাড়িটা পাহারা দেবার জন্যে।

যদিও বদহজমের লক্ষণ কিছুক্ষণ ধরে প্রাশিয়ানটিকে মুশকিলে ফেলেছিলো, তবু তখন সে আনন্দে পাগল হয়ে নাচতে শুরু করলো। নাচতে লাগলো উন্মাদের মতো হাত-পা তুলে, চিৎকার করতে লাগলো অধীর উত্তেজনায়—যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়লো সে।

অবশেষে সে বন্দী হয়েছে। রক্ষা পেয়েছে সে।

এইভাবে মাত্র ছ ঘণ্টা শত্রুদের কবলে থাকার পর শাঁপিনে দুর্গ ফের দখল করে নেওয়া হয়েছিলো।

কাপড়ের ব্যাপারী কর্নেল রাতিয়ে, যিনি লা-রোশ-ওয়েসলের জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রধান হিসেবে এই কৃতিত্বটি অর্জন করেছিলেন, তাঁকে এজন্যে সামরিক সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিলো।

বনিফাসিওর পাহাড়ি এলাকায় পাওলো সাভেরিনির বিধবা স্ত্রী তার ছেলেকে নিয়ে ছোট্ট একটা জীর্ণ কুটিরে একা একাই বাস করতেন। পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা শহরটা জায়গায় জায়গায় যেন সমুদ্রের ওপরে ঝুলে রয়েছে, গিরিসঙ্কটের ফাঁক দিয়ে তাকালে সার্ডিনিয়ার নিম্নভূমি এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। অন্তধারে, পাহাড়ের পায়ের কাছে, বিশাল বারান্দার মতো একটা ফোকড় প্রায় সমস্ত জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। ফোকড়ের মধ্যে জল থাকায় সেটা এখানকার বন্দরের কাজ করে। ইতালী কিংবা সার্ডিনিয়ার ছোট ছোট মাছধরা নৌকোগুলো ওই খালের পথ বেয়ে এখানে চলে আসে একেবারে প্রথম দিককার বাড়িগুলোর কাছাকাছি। প্রতি দু-সপ্তাহ অন্তর অ্যাজাকিও থেকে যাতায়াতকারী পুরনো ভাঙাভাঙা স্টিমারটাও এখানে এসে লাগে।

সাদা পাহাড়ের ওপরে গাদাগুচ্ছের বাড়িগুলো জায়গাটাকে আরও সাদা করে রেখেছে। পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকা এই বাড়িগুলোকে দেখতে ঠিক বুনো পাখির বাসার মতো—নিচের ওই সাংঘাতিক খাঁড়ির দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ, যেখান দিয়ে জাহাজগুলো পর্যন্ত যাতায়াত করতে ভয় পায়। অবিশ্রান্ত দামাল বাতাস অকারণে হয়রান করে তোলে এখানকার সমুদ্র আর ঊষর, নগ্ন উপকূলভূমিকে। সামান্য গাছগাছালি ছাড়া আর সব কিছুই খুঁটে খুঁটে নিশ্চিহ্ন করে দেয় ওই বাতাস, দুদিক খোলা গিরিখাতের ভেতর দিয়ে দিনরাত্রি বয়ে যায় হু-হু করে। সমুদ্রের মধ্য থেকে মাথা জাগানো অজস্র ডুবো পাহাড়ের কালো কালো শীর্ষবিন্দুতে বাঁধা সাদা ফেনার রেখাগুলোকে দেখে মনে হয় যেন এক এক ফালি কাপড় জলের ওপরে ভাসছে আর দোল খাচ্ছে।

বিধবা সাভেরিনির বাড়িটা পাহাড়ের একটা দুরারোহ দিকের ধার ঘেঁষে। বাড়ির জানলা তিনটে খুললেই চোখে পড়ে এই আদিম নির্জন দিগন্তরেখা। ওখানেই ছেলে আঁতোয়ানকে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন মাদাম সাভেরিনি। তাঁদের সঙ্গে থাকতো সেমিলাঁৎ নামে একটা বিশাল মাদী কুকুর—গায়ে লম্বা লম্বা খসখসে লোম, জাতে মেষ পাহারাদার। শিকারের সময় আঁতোয়ানকে সাহায্য করতো এই কুকুরটা।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কিছু বাদানুবাদের পর নিকোলাস রাভোলাতি বিশ্বাস-

ঘাতকের মতো ছুরির এক ঘায়ে খুন করে ফেললো আঁতোয়ান সাভেরিনিকে। সেই রাতেই সার্ভিনিয়ায় পালিয়ে গেলো নিকোলাস।

পথচারীরা যখন আঁতোয়ানের দেহটা বয়ে নিয়ে এলো, তখন বৃদ্ধা কিন্তু একটুও কাঁদলেন না—শুধু বহুক্ষণ ধরে নিশ্চুপ হয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। তারপর মৃতদেহের ওপরে শিরা কোঁচকানো একখানা হাত এগিয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন প্রতিশোধ নেওয়ার। তিনি চাইছিলেন না কেউ তাঁর সঙ্গে থাকুক, তাই মৃতদেহ আর কুকুরটাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটা তার প্রভুর দিকে মাথা বাড়িয়ে, লেজটা দু পায়ের মাঝখানে উঁচু করে তুলে ধরে একটানা ডেকে চললো। জন্তুটা আঁতোয়ানের মায়ের মতোই অনড়। ছেলের মৃতদেহের দিকে ঝুঁকে আঁতোয়ানের মা অপলক চোখে কেঁদে চলেছেন নিঃশব্দে। ছেলেটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, দেখে মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে। গায়ে ধূসর রঙের কোট—বুকের কাছটা ছেঁড়া, রক্তে ভেজা। রক্ত সমস্তটা জায়গা জুড়ে। রক্ত ওর জামায়, যেটা প্রথমেই ওপরের দিকে টেনে তোলা হয়েছিলো। রক্ত ওর ওয়েস্ট কোটে, পাতলুনে, মুখে আর হাত দুটোতে। রক্তের ছোট ছোট চাপ জমাট বেঁধে রয়েছে ওর দাড়ি আর চুলের মধ্যেও।

বৃদ্ধা মা কথা বলতে শুরু করলেন ছেলের সঙ্গে। তাঁর গলার আওয়াজে নিশ্চুপ হয়ে উঠলো কুকুরটা।

'ছোট্ট সোনা মানিক আমার, তুই ঘুমো বাছা। শোন্, আমি এর শোধ নেবোই—শুনতে পাচ্ছিস তুই?' বৃদ্ধা বললেন, 'আমি তোর মা বলছি, আমি এর শোধ নেবো! তুই তো ভালো করেই জানিস বাছা, তোর মা সব সময়েই নিজের কথা রাখে।'

আলতো করে ঝুঁকে মৃত পুত্রের ঠোঁটে নিজের ঠাণ্ডা ঠোঁট দুখানি ছোঁয়ালেন বৃদ্ধা। সেমিলাঁৎ আবার ডুকরে কাঁদতে শুরু করলো। একটানা দীর্ঘ, একঘেয়ে, যন্ত্রণাদায়ক আর বীভৎস সেই কান্না।

সকাল অব্দি মৃতদেহ, মহিলা আর জন্তুটা সেই একইভাবে রইলো। পরদিন আঁতোয়ান সাভেরিনিকে কবর দেওয়া হলো। তার পর থেকে বনিফাসিওতে কেউই আর তার কথা বলতো না, শীঘ্রিই তার কথা ভুলে গেলো সকলে।

আঁতোয়ানের কোন ভাই বা কোন নিকট আত্মীয় ছিলো না। প্রতিশোধ

নেবার মতো কোন পুরুষমানুষই ছিলো না তাদের। শুধু তার মা, ওই বৃদ্ধামহিলা কথাটা চিন্তা করতেন। প্রতিদিন সকাল আর সন্ধ্যায় পাহাড়গুলোর অন্তধারে উপকূলের একটা সাদা বিন্দুর মতো জায়গা লক্ষ্য করতেন তিনি। জায়গাটা লঁগোসাদো—সার্ভিনিয়ার সেই ছোট্ট গ্রামটা, যেখানে প্রচণ্ডতাড়া খেয়ে কর্সিকান বদমাশরা গিয়ে আশ্রয় নেয়। ওখানকার লোকদের মধ্যে অধিকাংশই ওই শ্রেণীর স্বদেশের অপর পাড়ে আশ্রয় নিয়ে তারা আবার নিজেদের দেশে ফিরে যাবার সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। সাভেরিনির স্ত্রী জানতেন, নিকোলাস রাভোলাতি ওখানেই আশ্রয় নিয়েছে।

সারাটা দিন জানলার কাছে একা একা বসে মহিলা ওই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করতেন। নিজে তিনি শারীরিক দিক দিয়ে সবল নন, মৃত্যুর দিনও প্রায় ঘনিয়ে এসেছে—এ অবস্থায় কারুর সাহায্য ছাড়া কি করে তিনি প্রতিশোধ নেবেন? কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, ছেলের মৃতদেহ ছুঁয়ে শপথ করেছেন প্রতিশোধ নেবেন বলে। সে কথা তিনি ভুলতে পারেন না। আর দেরি করাও উচিত নয়। কিন্তু কিভাবে করবেন? রাত্রিবেলাও তিনি ঘুমোতে পারতেন না—এতটুকু শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, অনরবত শুধু সেই এক চিন্তা। কুকুরটা তাঁর পায়ের কাছেই ঘুমোয় আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে দূরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে। প্রভু মারা যাবার পর থেকে মাঝে মাঝেই এভাবে চিৎকার করে কুকুরটা, যেন এভাবে তার প্রভুকেই ডাকে, যেন তার সান্ত্বনাতীত মনে প্রভুর স্মৃতি সে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছে—কিছুতেই সে স্মৃতি মুছে যাবার নয়।

একদিন রাত্রে সেঁমেলাঁৎ যখন এভাবে চিৎকার করছে, তখন হঠাৎ করেই আঁতোয়ানের মায়ের মাথায় একটা বুদ্ধি জেগে উঠলো—জেগে উঠলো নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাময়, ভয়ঙ্কর এক চিন্তা। সকাল পর্যন্ত তিনি সেটা নিয়ে ভাবলেন, ভোর হতেই চলে গেলেন গির্জায়। সেখানে তিনি প্রার্থনা করলেন…মেঝের ওপরে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানালেন যাতে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন, যাতে ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাঁর অক্ষম, ফুরিয়ে যাওয়া শরীরটাতে শক্তি দিয়ে তিনি তাঁকে টিঁকিয়ে রাখেন। তারপর ফিরে এলেন বাড়িতে।

উঠোনে এক দিক মুখ বন্ধ করা একটা পিপে ছিলো, চালা দিয়ে বৃষ্টির জল ঝরে পড়লে তার মধ্যে জমা হতো। পিপেটা খালি করে সেটা উলটে দিলেন বৃদ্ধা। তারপর কয়েকটা খুঁটি আর পাথর দিয়ে সেটাকে মাটির সঙ্গে আটকে, সেমিলাঁৎকে তার মধ্যে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন।

ঘরে ঢুকে অনবরত পায়চারি করতে লাগলেন বৃদ্ধা, চোখের দৃষ্টি সার্ডিনিয়ার উপকূলের দিকে স্থির। ওখানেই কোথাও রয়েছে সে—সেই খুনীটা।

সারাদিন সারারাত ধরে চিৎকার করলো কুকুরটা। পরদিন সকালে একটা পাত্রে করে তাকে খানিকটা জল দিলেন বৃদ্ধা। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়—না ঝোল, না রুটি। সে দিনটাও কেটে গেলো। খাদ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সেমিলাঁৎ। পরের দিন কিন্তু তার চোখদুটো জলজ্বলে হয়ে উঠলো, খাড়া হয়ে উঠলো গায়ের লোমগুলো, মরিয়া হয়ে শেকলটা টানাটানি করতে লাগলো সে। তবু বৃদ্ধা তাকে কিছু খেতে দিলেন না। খিদের তাড়নায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো জন্তুটা, চিৎকার করতে লাগলো তারস্বরে। সে রাত্তিরটাও কেটে গেলো এইভাবে।

পরদিন সকাল বেলায় এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে দু আঁটি খড় নিয়ে এলেন আঁতোয়ানের মা। স্বামীর ব্যবহার করা জামাকাপড়ের মধ্যে ওই খড়গুলো পুরে একটা মানুষের মূর্তি গড়ে তুললেন তিনি। তারপর পুরনো কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে সেটার মাথা বানিয়ে, সেমিলাঁতের কুলুঙ্গির সামনে সেটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মাটিতে খাড়া করে রাখলেন।

খিদেয় অস্থির হওয়া সত্ত্বেও খড়ের মানুষটাকে দেখে অবাক হয়ে চুপ করে রইলো কুকুরটা। বৃদ্ধা তখন কসাইখানা থেকে বড়সড় এক টুকরো শুয়োরের মাংস কিনে এনে উঠোনেই কাঠ জ্বেলে সেটা ঝলসে নিলেন। উত্তেজনায় পাগলের মতো হয়ে শেকল নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো সেমিলাঁৎ—তার মুখময় গাঁজলা, চোখ দুটো মাংসের টুকরোটার দিকে স্থির, যার গন্ধ তার পাকস্থলীতে গিয়ে ঢুকছিলো।

ধোঁয়া ওঠা মাংসের টুকরোটা বৃদ্ধা তখন রুমালের মতো করে খড়ের মানুষটার গলায় বেঁধে দিলেন—বারবার ঠেসে দিলেন সেটা, যেন একেবারে ঢুকিয়ে দিতে চাইলেন গলার ভেতরে। তারপর শেকল খুলে ছেড়ে দিলেন কুকুরটাকে।

নকল মানুষটার গলার ওপরে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুরটা, কাঁধের ওপরে থাবা বসিয়ে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো সেটাকে। এক টুকরো মাংস মুখে নিয়ে পড়ে গেলো মাটিতে, কিন্তু তক্ষুনি আবার লাফিয়ে উঠে সুতোর মধ্যে দাঁত বসিয়ে আরও খানিকটা খাদ্য ছিনিয়ে নিলো—ফের মাটিতে পড়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো নতুন উৎসাহে। দাঁতের প্রচণ্ড আঘাতে মূর্তির মুখটাকে ছিঁড়ে ফেললো কুকুরটা, ফালাফালা করে ফেললো সমস্ত ঘাড়টাকে।

নীরব নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধা, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো তাঁর। ফের জন্তুটাকে শেকল দিয়ে বেঁধে আবার দুদিন সেটাকে তিনি উপোস করিয়ে রাখলেন। তারপর পুনরাবৃত্তি করলেন ওই একই বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের।

তিন মাস ধরে কুকুরটাকে এ ধরনের সংগ্রামে অভ্যস্ত করে তুললেন মহিলা। শেখালেন, কি করে দাঁত আর থাবা দিয়ে খাদ্য ছিনিয়ে নিতে হয়। এখন কুকুরটাকে উনি আর শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেন না, কিন্তু এক বিশেষ ভঙ্গিমায় নকল মানুষটার দিকে তাকে লেলিয়ে দেন। এমন কি গলায় খাবার বাঁধা না থাকলেও, ওকে তিনি মূর্তিটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে শিখিয়েছেন। অভ্যেস করার পরে অবশ্য কুকুরটাকে তিনি পুরস্কার হিসেবে ওর জন্যেই রান্না করে রাখা মাংসের টুকরো দিয়ে থাকেন।

এখন মূর্তিটাকে দেখলেই কুকুরটা গর্জন করে উঠে মহিলার দিকে তাকায়, কখন উনি আঙুল তুলে তীক্ষ্ণ স্বরে বলবেন, 'যাও!'

মা সাভেরিনি যখন বুঝলেন যে এবারে সময় হয়েছে, তখন একদিন সকাল বেলা গির্জায় গিয়ে তিনি স্বর্গীয় উৎসাহে স্বীকারোক্তি করলেন। তারপর এমন-ভাবে পুরুষের বেশ পরে নিলেন, যেন তাঁকে একটা গরীব ভিখারি বলে মনে হয়। ওই বেশেই একজন সার্ডিনিয় জেলের কাছে গেলেন তিনি, সে লোকটা কুকুর-সুদ্ধু তাঁকে নৌকো করে উলটো দিকের তীরে নিয়ে গেলো।

মহিলার সঙ্গে কাপড়ের থলেতে বড় একখণ্ড মাংস ছিলো। ওদিকে সেমিলাঁৎ উপোসী ছিলো দুদিন ধরে। কিছুক্ষণ অন্তরই বৃদ্ধা থলের গন্ধ শোঁকাচ্ছিলেন কুকুরটাকে, চেষ্টা করছিলেন যাতে কুকুরটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

অবশেষে লঁগোসাদো গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন বৃদ্ধা। তারপর এক রুটিওয়ালার দোকানে গিয়ে জানতে চাইলেন, নিকোলাস রাভোলাতি কোথায় থাকে। জানা গেলো, সে তার পুরনো ব্যবসা ছুতোরগিরিই করছে।

দোকানের পেছন দিকে একা একা বসে কাজ করছিলো নিকোলাস। বৃদ্ধা দরজা খুলে ডাকলেন, 'ওহে, নিকোলাস!'

লোকটা পেছনে ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধা, 'যা, যা! গিলে খা ওকে, ছিঁড়ে ফেল্!'

উত্তেজিত জন্তুটা লাফিয়ে উঠে লোকটার টুটি চেপে ধরলো। দু হাত দিয়ে কুকুরটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো লোকটা।

কয়েক মিনিট ধরে মাটিতে পা আছড়ে ছটফট করলো, তারপর পড়ে রইলো নিস্পন্দ হয়ে—পেম্বিলাং ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেললো তার গলাটা।

দোকানের দরজার কাছাকাছি বসে থাকা ছুজন প্রতিবেশী মনে করে করে শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিলো যে, তারা একটা বুড়ো মতো লোককে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। তার সঙ্গে ছিলো কালো রঙের একটা কুকুর—চলতে চলতেই মনিবের দেওয়া কি যেন একটা বাদামী রঙের খাবার খাচ্ছিলো কুকুরটা।

সেদিন সন্ধ্যাতেই বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা। রাতে ঘুমটাও খুব ভালো হয়েছিলো তাঁর।

মেয়েটি ছিলো সুন্দরী অপরূপাদের মধ্যে একজন। যেন ভাগ্যদোষেই সামান্ত কেরানীকুলে জন্ম হয়েছিলো ওর। লোকে ওকে জানবে, প্রশংসা করবে, বিয়েতে ও যৌতুক পাবে—এমন কোন আশা ওর ছিলো না। কোন ধনী অথবা গণ্যমান্ত মানুষ ওকে ভালোবেসে বিয়ে করবে, তেমন আশাও ছিলো না। তাই শিক্ষা পর্ষতের এক কনিষ্ঠ কেরানীর সঙ্গেই বিয়েতে মত দিয়েছিলো ও।

নিজেকে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতে না পারায় মেয়েটিকে নিতান্তই সহজ সরল লাগতো। কিন্তু এ জন্তে ভারি অ-সুখী ছিলো ও, যা ওদের শ্রেণীর মেয়েদের পক্ষে বিচিত্র। কারণ যাদের জাত-কুলের গরব নেই, তেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য আর মাধুর্যই জাতজন্মের কাজ করে থাকে। জন্মগত সৌন্দর্য, সহজাত মার্জিত ভাব এবং রুচিপূর্ণ রসবোধই তাদের একমাত্র আভিজাত্য—যা কোন কোন সাধারণ মানুষের মেয়েদেরও অভিজাত মহিলাদের সমকক্ষ করে তোলে।

অবিরাম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতো মেয়েটি। অনুভব করতো, যেন সমস্ত বিলাস-বৈভব উপভোগ করার জন্তেই ওর জন্ম। ঘরের দৈন্যদশা, রঙচটা দেওয়াল, জীর্ণ কুর্সি, মলিন পোশাক-পরিচ্ছদ—সবকিছুর জন্তেই ও কষ্ট পেতো। এই সমস্ত জিনিসপত্র, যা ওর সমপর্যায়ের কোন মহিলা হয়তো লক্ষ্যই করতো না, তা ওকে যন্ত্রণা দিতো, রাগিয়ে তুলতো। ও ভাবতো, ঘরের লাগোয়া নিরিবিলি ছোট্ট ঘরের কথা, তাতে প্রাচ্যদেশের চিক ঝোলানো। ব্রোঞ্জের দীপাধার থেকে ঝলমলে আলো ছড়িয়ে পড়ে সে ঘরে। ভাবতো, খাটো পাতলুন পরা দুজন চমৎকার চাপরাসীর কথা, যারা লম্বা আরাম-কুর্সিতে ঘুমোয়, তাপযন্ত্রের ভারি বাতাস যাদের তন্দ্রাতুর করে তোলে। ভাবতো, বিশাল বৈঠকখানা ঘরের কথা, যে ঘরে পুরনো রেশমী পর্দা ঝোলানো। সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্রে নানান ধরনের দুর্লভ টুকিটাকি জিনিস সাজানো থাকে সে ঘরে। আর ভাবতো, বিকেল পাঁচটায় সময় সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে গল্পসল্প করার জন্তে একখানা সুরভিত অ্যাপার্টমেন্টের কথা, —যে সব পুরুষদের সকলে চেনে, যাদের সাহচর্য সমস্ত মেয়েরা কামনা করে, যাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলে তারা একে অন্তকে হিংসে করে—তেমনি সব পুরুষ বন্ধুদের কথা।

রাত্রিবেলা খাওয়ার জন্তে ও যখন স্বামীর উলটো দিকে গোল টেবিলটার

কাছে গিয়ে বসতো, যে টেবিলের ঢাকনাটা পরপর তিনদিন ধরে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ওর স্বামী যখন খাবারের ঢাকা তুলে মহানন্দে বলে উঠতো, 'ইস্ কি চমৎকার মটরশুঁটির তরকারি! এর চাইতে ভালো খাবার আর কিছু আছে বলে আমি জানি না—' তখন ও মার্জিত রুচির অভিজাত খাওয়া-দাওয়া, রূপোর বাসনের ঝিলিক আর পরীর দেশের জঙ্গলে দুর্লভ পাখি আঁকা দেয়াল-কাগজের কথা ভাবতো। ভাবতো, চমৎকার বাসনে পরিবেশন করা অপূর্ব খাদ্যের কথা, অকুতোভয় প্রেমগুঞ্জনের কথা আর ট্রাউটের গোলাপ মাংস অথবা মুরগীর ডানা চিবোতে চিবোতে স্ফিংকসের মতো হাসি হাসি মুখে তা শোনার কথা।

ভালো পোশাক বা গয়নাগাটি কিছুই ওর ছিলো না। অথচ শুধু সে সবই ও ভালোবাসতো। লোকে ওকে পছন্দ করবে, প্রশংসা করবে, ওকে চাইবে—এজন্যে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিলো ওর।

একজন ধনী বান্ধবী ছিলো মেয়েটির, ওর স্কুল-জীবনের বান্ধবী। কিন্তু তার কাছে যাওয়াও পছন্দ করতো না। কারণ সেখান থেকে ফিরে এসে ওর মনোকষ্টটা আরও বেড়ে যেতো। তখন বিরক্তি, অনুতাপ, দুঃখ আর হতাশায় সারা দিন ধরে ও শুধু কাঁদতো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ওর স্বামী বড়সড় একটা লেফাফা হাতে নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে বাড়ি ফিরে বললো, 'এই ছাখো, তোমার জন্যে কি এনেছি!'

তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে একখানা ছাপানো কার্ড বের করলো মেয়েটি। তাতে লেখা রয়েছে: 'মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মাদাম গেয়র্গ রেপঁনু আগামী ১৮ই জানুয়ারী, সোমবার সন্ধ্যাবেলা ম্যঁসিয় ও মাদাম লোজেলকে মন্ত্রী মহোদয়ের বাসগৃহে সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন।'

স্বামী যেমনটি আশা করেছিলো মেয়েটি কিন্তু তেমনি খুশি না হয়ে, আমন্ত্রণ-লিপিখানা অবজ্ঞাভরে টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'ওটা দিয়ে আমি কি করবো বলে তুমি আশা করছো?'

'কিন্তু সোনা, আমি ভেবেছিলাম ওটা পেয়ে তুমি খুশি হবে। তুমি তো কক্ষনো বেরোও না। আর এটা তো সে দিক দিয়ে একটা চমৎকার উপলক্ষ। ওটা পেতে আমাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। সবাই একটা করে কার্ড চায়। কিন্তু কার্ড দেওয়া হয়েছে বেছে বেছে, কর্মচারীদের বেশি দেওয়াই হয়নি। সমস্ত সরকারী দুনিয়াটাকেই তুমি ওখানে দেখতে পাবে।'

বিরক্তি ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি অধৈর্য হয়ে বললো, 'অমন একটা জায়গায় আমি কি পরে যাবো, শুনি ?'

স্বামী কথাটা ভেবে দেখেনি। তাই তোতলাতে তোতলাতে বললো, 'কেন, আমরা থিয়েটারে যাবার সময় তুমি যে পোশাকটা পরো, সেটা তো আমার কাছে বেশ সুন্দর...'

স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে চুপ করে গেলো স্বামী বেচারা। বড় বড় দু ফোঁটা অশ্রু মেয়েটির চোখের কোণ থেকে আস্তে আস্তে ঠোঁটের কাছে নেমে এলো।

'এ কি ব্যাপার ?' ভীষণ এক হোঁচট খেয়ে প্রশ্ন করলো স্বামী, 'কি হলো ?'

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলো মেয়েটি। ভিজে গালদুটি মুছে শান্ত গলায় বললো, 'কিছু না। কিন্তু আমার তেমন কোন পোশাক নেই, তাই ওখানে যেতে পারছি না। তুমি বরং কার্ডটা তোমার অফিসের কোন বন্ধুকে দিয়ে দাও, যার বৌকে আমার চাইতে ওখানে ভালো মানাবে।'

ভীষণ দুঃখ পেয়ে স্বামী বললো, 'দাঁড়াও না, মাতিলদা, দেখা যাক কি করা যায়। আচ্ছা, এই উপলক্ষে পরে যাওয়ার মতো একটা মানানসই পোশাক—যেটা তুমি অন্য জায়গাতেও পরে যেতে পারবে, তেমন একটা মোটামুটি খুব সাধারণ পোশাকের দাম কত হবে, বলো তো ?'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলো মেয়েটি। চিন্তা করে নিলো, কত দামের কথা বললে স্বামীটি সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে 'না' বলে দেবে না। অবশেষে একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললো, 'ঠিক কত হবে বলতে পারছি না। তবে মনে হয় চারশো ফ্রাঁতে হয়ে যাওয়া উচিত।'

সামান্য বিবর্ণ হয়ে উঠলো স্বামীটি। কারণ একটা বন্দুক কেনার জন্যে ঠিক ওই পরিমাণ টাকাটাই সে সঞ্চয় করেছিলো, যাতে পরের গ্রীষ্মে নাঁতেরের সমভূমিতে সে বন্ধুদের সঙ্গে শিকারে যেতে পারে। বন্ধুরা রোববার দিন সেখানে ভরত পাখি শিকার করতে যায়। যাই হোক, সে বললো, 'বেশ, আমি তোমাকে চারশো ফ্রাঁ দেবো। কিন্তু তা দিয়ে তুমি একটা সুন্দর পোশাক কিনতে চেষ্টা কোরো।'

বল নাচের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো মাদাম লোয়েজেলকে ততই বিষাদগ্রস্ত, বিক্ষিপ্ত আর উদ্বিগ্ন বলে মনে হতে লাগলো। অথচ ওর পোশাকটা প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার

কি হয়েছে বলো তো? দু-তিন দিন ধরে তোমার ভাবসাব একেবারে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।'

'আমার ভয় লাগছে,' স্ত্রী বললো, 'কারণ আমার কোন দামী পাথরের গয়না নেই। নিজেকে সাজাবার মতো কিছুই নেই আমার। আমাকে একটা বিশ্রী হা-ঘরের মতো দেখাবে। তার চাইতে ওখানে আমার না যাওয়াই ভালো।'

'কেন, তুমি কয়েকটা ফুল পরে নিলেই পারো। এই ঋতুটাতে ফুলগুলো দারুণ সুন্দর হয়। দশ ফ্রাঁ দিয়েই তুমি গোটা দুত্তিন চমৎকার গোলাপ কিনে নিতে পারো।'

'নাঃ,' মেয়েটি আদৌ আশ্বস্ত না হয়ে বললো, 'একগাদা বড়লোক মেয়ে-মানুষদের মাঝখানে ম্যাড়মেড়ে ভাবে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে লজ্জার আর কিছু নেই।'

'ওহো, আমরা কি বোকা দেখেছো!' স্বামীটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি তোমার বান্ধবী মাদাম ফরেস্তেয়ারের কাছে গিয়ে কয়েকটা গয়নাগাটি ধার চাইলেই পারো? সে রকম অন্তরঙ্গতা তোমাদের যথেষ্ট আছে।'

'ঠিক বলেছো!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েটি, 'এ কথাটা আমার মনেই হয়নি!'

পরের দিন বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে মেয়েটি তাকে ওর দুঃখের কাহিনী শোনালো। মাদাম ফরেস্তেয়ার তখন আলমারির কাচের পাল্লা খুলে একটা বড়সড় গয়নার বাক্স বের করে আনলো। তারপর ওর কাছে সেটা খুলে ধরে বললো, 'বেছে নে।'

প্রথমে কয়েকটা ব্রেসলেট, তারপর একটা মুক্তোর বোতাম তারপর সোনা আর দামী পাথরের সুন্দর কাজ করা একটা ক্রুশ নিয়ে আয়নার সামনে পরে দেখলো মেয়েটি। ওগুলো নেবে কি রেখে দেবে, তা ঠিক করতে পারছিলো না ও। একটু ইতস্তত করে বললো, 'আর কিছু নেই তোর?'

'হ্যাঁ, এই তো রয়েছে। নিজেই ভাখ্ না। কোন্‌টা তোর পছন্দ হবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

হঠাৎ একটা কালো মখমলের বাক্সে চমৎকার একছড়া হীরের মালা আবিষ্কার করে এক অবাধ বাসনায় হৃৎস্পন্দন বেড়ে উঠলো মেয়েটির। মালাটা তুলতে গিয়ে হাতদুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো ওর। পোশাকের ওপরে গলার কাছে হারটা তুলে ধরে নিবিড় আনন্দে ভরে উঠলো সমস্ত মন। দ্বিধাজড়িত গলায় একরাশ

উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা ধার দিতে পারিস? শুধু এটা?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

অসীম আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরলো মেয়েটি। তারপর মূল্যবান সম্পত্তিটা নিয়ে চলে এলো নিজের বাড়িতে।

নাচের দিন চরম সফলতা পেলো মেয়েটি। সেখানে ও ছিলো সব চাইতে সুন্দরী, মার্জিত, হাসি-ঝলমলে আর আনন্দে উচ্ছল মহিলা। সমস্ত পুরুষরাই ওকে লক্ষ্য করলো, ওর পরিচয় জানতে চাইলো, নিজেদের উপস্থিত করতে চাইলো ওর কাছে। মন্ত্রিসভার সমস্ত সভ্যরাই ওর সঙ্গে ওয়ালজ নাচতে চাইলেন। এমন কি শিক্ষামন্ত্রীও খানিকটা নজর দিলেন ওর দিকে।

সফলতার আনন্দ, সৌন্দর্যের স্বীকৃতি আর জয়ের গর্বে পরম উৎসাহে নিবিড় আবেশে মাতাল হয়ে নাচলো মেয়েটি। মনে অন্য কোন চিন্তার রেশ নেই। সকলের সপ্রশংস স্বীকৃতি যেন সুখের মেঘ হয়ে ঘিরে ফেললো ওর সমস্ত চেতনা।

ভোর চারটে নাগাদ বাড়িতে ফিরলো ও। স্বামীটি মাঝরাত্তির থেকেই ছোট-খাটো একটা ঘরে আধোঘুমন্ত অবস্থায় সময় কাটাচ্ছিলো। তার সঙ্গে আরও তিনজন ভদ্রলোক—তাদের স্ত্রীরাও খুব আনন্দ-ফুর্তি করছিলো নিজেরা মিলে।

স্বামীটি ওর গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দিলো। বাড়িতে ফেরার জন্যে ওরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো চাদরটা। কিন্তু জিনিসটা নেহাতই সাধারণ, নিতান্তই প্রতিদিনকার পোশাক--বল নাচের ঝলমলে পোশাকের সঙ্গে সেটার পার্থক্য বড় বেশি প্রকট। মেয়েটিও তা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সেটা গা থেকে সরিয়ে দিতে চাইলো, যাতে অন্যান্য মহিলারা সেটা দেখতে না পায়—কারণ তাদের সকলের গায়েই দামী ফারের পোশাক জড়ানো।

লোজেল বললো, 'তুমি এখানে দাঁড়াও, বাইরে গেলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। আমি একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে আসছি।'

কিন্তু মেয়েটি তার কথা না শুনে তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো। রাস্তায় এসে ওরা কোন গাড়িই দেখতে পেলো না। তখন খোঁজাখুঁজি শুরু করলো, দূর থেকে কোন গাড়ি দেখতে পেলে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো কোচোয়ানকে। অসহায় অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে স্যেন নদীর দিকে এগুলো ওরা এবং অবশেষে ফেরিঘাটের কাছে একটা প্রাচীন নৈশ গাড়ি পেলো। এ ধরনের

গাড়িগুলোকে প্যারী শহরে রাত্রিবেলাতেই দেখা যায়, যেন দিনের আলোতে নিজেদের দৈন্য দেখাতে লজ্জা পায় ওরা।

গাড়িটা ওদের মার্তা স্ট্রীটে বাড়ির দরজা অব্দি পৌঁছে দিলো, ক্লান্ত শরীরে নিজেদের ফ্ল্যাটে উঠে এলো ওরা। মেয়েটির কাছে সব কিছুই এখন শেষ। আর লোয়েজেলের মনে শুধু একটাই কথা, কাল বেলা দশটার মধ্যে তাকে আবার অফিসে হাজিরা দিতে হবে।

শেষবার নিজের অপরূপ রূপ দেখার জন্যে আয়নারসামনে দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে চাদরটা সরালো মেয়েটি এবং তারপরেই ওর কণ্ঠ থেকে আচমকা এক টুকরো আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

স্বামীটি ইতিমধ্যেই অর্ধেক পোশাক খুলে ফেলেছিলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো?'

উত্তেজিত ভঙ্গিমায় তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি, 'মাদাম ফরেস্তেয়ারের হারটা…হারটা নেই!'

'কি!' আতঙ্কে উঠে দাঁড়ালো লোয়েজেল, 'তা কি করে হয়! না না, তা অসম্ভব!'

জামার ভাঁজ, কোটের ভাঁজ, পকেট—সর্বত্র খুঁজে দেখলো ওরা, কিন্তু কোথাও পেলো না।

লোয়েজেল জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ঠিক জানো যে, আমরা যখন ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, হারটা তখনও ছিলো?'

'হ্যাঁ, বেরোনোর সময় বাড়ির গলিটাতেও ছিলো।'

'কিন্তু তুমি যদি ওটা রাস্তায় হারিয়ে থাকো, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই ওটা খসে পড়ার শব্দ শুনতে পেতাম। ওটা নির্ঘাৎ গাড়িতেই পড়েছে।'

'হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। তুমি কি গাড়ির নম্বরটা নিয়েছিলে?'

'না। আর তুমি—তুমি কি দেখেছিলে, নম্বরটা কত?'

'না।'

সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। শেষ পর্যন্ত লোয়েজেল ফের পোশাক-টোশাক পরে নিয়ে বললো, 'যেখান দিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে এসেছি আমি সে রাস্তাগুলো একটু দেখে আসতে যাচ্ছি। দেখি, যদি খুঁজে পাই।'

লোয়েজেল চলে গেলো। মেয়েটির তখন আর বিছানায় যাবার মতো শক্তিটুকুও

নেই। শূন্যমনে সান্ধ্য পোশাক পরা অবস্থাতেই একটা কুর্সিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে রইলো ও।

সাতটা নাগাদ স্বামীটি ফিরে এলো। কিছুই সে পায়নি—পুলিসের কাছে গেছে, ভাড়াটে গাড়ির অফিসে গেছে, তারপর পুরস্কার দেবার কথা জানিয়ে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে এসেছে। তার অর্থ, আশা পাবার আশায় সবকিছুই করেছে সে।

সারাটা দিন প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করে রইলো মেয়েটি। সন্ধ্যাবেলায় হয়রান আর বিবর্ণ হয়ে ফিরে এলো লোজেল—না, সে কিছুই পায়নি।

বললো, 'তোমার বান্ধবীকে লিখে দেওয়া দরকার যে, তুমি হারটার খিল ভেঙে ফেলেছো—সেটা সারিয়ে দিতে হবে। তাতে আমরা ওটা ফেরত দেবার জন্যে কিছুটা সময় পাবো।'

তার কথা শুনে সেই মতোই লিখে দিলো মেয়েটি।

একটা সপ্তাহ শেষ হতে ওরা সমস্ত আশাই হারিয়ে ফেললো। বয়সে পাঁচ বছরের বড় লোজেল তখন বললো, 'হারটা আমাদের বদলে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে।'

হারের বাক্সটার মধ্যে যে মণিকারের নাম লেখা ছিলো, পরদিন বাক্সটা নিয়ে সেই দোকানে গিয়ে হাজির হলো ওরা। মণিকার তার খাতাপত্তর দেখে বললো, 'না মাদাম, আমি এই হার বিক্কিরি করিনি। আমি শুধু বাক্সটা বিক্কিরি করেছিলুম।'

বিরক্তি আর উদ্বেগে তিতিবিরক্ত হয়ে স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে সেই হারটার মতো অন্য একটা হার খুঁজে বেড়াতে লাগলো ওরা। অবশেষে পালে-রোয়ালের একটা দোকানে একছড়া হীরের মালা খুঁজে পেলো, যেটা দেখতে ঠিক ওদের হারিয়ে ফেলা হারটার মতো। হারটার দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ, সেটা ওরা ছত্রিশ হাজারে পেতে পারে। তিনটে দিন হারটা বিক্রি না করার জন্যে ওরা মণিকারকে অনুরোধ জানালো আর এমন একটা বন্দোবস্ত করে নিলো, যাতে ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হবার আগে অন্য হারটা পেলে ওরা এই হারটা চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁর বিনিময়ে মণিকারকে ফেরত দিয়ে দিতে পারে।

লোজেলের যথাসর্বস্ব ছিলো আঠারো হাজার ফ্রাঁ, যেটা ওর বাবা ওর জন্যে

রেখে গিয়েছিলেন। বাকিটা সে ধার করলো। ধার করলো একজনের কাছ থেকে হাজার, আর একজনের কাছ থেকে পাঁচশো ফ্রাঁ, এর কাছ থেকে পাঁচ লুই, তার কাছ থেকে তিন লুই—এমনি করে। ভবিষ্যতে এ টাকা সে কোনদিনও ফেরত দিতে পারবে কিনা সে কথা না ভেবে, অনবরত ঋণ স্বীকারের খতে সই করে যত রাজ্যের তেজারতি-কারবারিদের কাছ থেকে ধার নিয়ে নিয়ে নিজের সমস্ত অস্তিত্বটাকেই সে সন্দেহজনক করে তুললো। তারপর দৈহিক কষ্ট এবং মানসিক যন্ত্রণার সম্ভাবনা সত্ত্বেও বর্তমানে তাকে ঘিরে থাকা নিরেট দুর্দশা আর ভবিষ্যতের জন্যে উদ্বেগে আকুল হয়ে লোজেল নতুন হারটা নেবার জন্যে সেই ব্যবসায়ীটির কাছে গিয়ে ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ জমা করলো।

মাদাম লোজেল যখন সেই হারটা মাদাম ফরেস্তেয়ারের কাছে নিয়ে গেলো, তখন শেষোক্তজন হিমকণ্ঠে বললো, 'এটা [illegible] উচিত ছিলো। কারণ এটা আমার [illegible]।'

কিন্তু বাক্সটা সে খুলে দেখলো না, যা সে করবে বলে তার বান্ধবী আশঙ্কা করছিলো। যদি ওটা বদলে দেওয়া হয়েছে বলে সে বুঝতে পারতো, তাহলে কি ভাবতো সে? তার জবাবে ও নিজেই বা কি বলতো তাকে? ওকে কি সে তাহলে চোর হিসেবেই ধরে নিতো?

মাদাম লোজেল এখন অভাবী জীবনের ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে। তবু নিজের ভূমিকা ও সাহসের সঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে পালন করে চলেছে। এই সাংঘাতিক দেনাটা শোধ করে দেওয়া প্রয়োজন এবং ও তা দেবেও। বাড়ির ঝিকে ওরা ছাড়িয়ে দিয়েছে, বাসস্থানও পালটে নিয়েছে। যে ঘরগুলো এখন ওরা ভাড়া নিয়েছে, তার ছাদের নিম্নাংশ ওপরের অংশ থেকে বেশি দুরারোহ।

ঘরদোরের কাজকর্ম, রান্নাঘরের বিরক্তিকর জঘন্য কাজ—সবই ও শিখে নিয়েছে। তেলচিটে বাসনপত্রের ওপরে-নিচে গোলাপী নখগুলো বুলিয়ে ও এখন থালা-বাটি সাফ করে। নোংরা অন্তর্বাস, সেমিজ ইত্যাদি ধুয়ে-কেচে সারি বেঁধে শুকোতে দেয়। প্রতিদিন সকালে নিচের রাস্তায় নোংরা-আবর্জনা ফেলতে যায় আর জল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে আসে। সাধারণ মেয়েমানুষদের মতো পোশাক পরে ও এখন থলে হাতে নিয়ে মুদিরদোকান, মাংসের দোকান আর ফলের দোকানে কেনাকাটা করে—প্রতিটি কপর্দকের জন্যে দরাদরি করে দোকানিদের সঙ্গে।

প্রতিমাসেই সময় নেবার জন্যে আর অন্যদের ধার শোধ করার জন্যে কিছু কিছু ঋণের কাগজ নতুন করে সই করে দেবার প্রয়োজন হতো। সন্ধ্যাবেলায় স্বামীটি তাই কোন কোন ব্যবসায়ীদের খাতাপত্তর লিখে দিতো আর রাত্রিবেলা প্রায়ই পৃষ্ঠা প্রতি পাঁচ স্যু হিসেবে খাতার নকল করতো।

দশ বছর ধরে এমনি করেই জীবন কাটলো ওদের। দশ বছর পরে মহাজনদের সুদ আর বকেয়া সুদ সমেত সব কিছুই মিটিয়ে দিলো ওরা।

মাদাম লোজেলকে দেখে এখন একজন বয়স্কা মহিলা বলে মনে হয়। গরীব গৃহস্থ ঘরের গিন্নীবান্নীদের মতো শক্তসমর্থ কাঠখোট্টা চেহারা হয়েছে ওর। মাথার [illegible] অগোছালো, স্কার্টটা বাঁকাঝোঁকা, হাত দুটো লাল—[illegible] বড় জলের [illegible] আছা করে। কিন্তু স্বামী অফিসে চলে [illegible] মধ্যে এখনও [illegible] ধোয়াটে [illegible] ফেলে আসা দিনের সেই সান্ধ্য আসরের কথা ভাবে—যে বল নাচের আসরে [illegible] সুন্দর লেগেছিলো, কত প্রশংসা আর স্তুতি পেয়েছিলো ও।

যদি সেই হারটা না হারাতো, তাহলে কি হতো আজ? কে জানে!…কে জানে! জীবন কি অদ্ভুত আর কত না পরিবর্তনে ভরা! কত ছোট্ট একটা জিনিস একটা জীবনকে নষ্ট করে অথবা বাঁচিয়ে দিতে পারে!

এক রোববার দিন সাপ্তাহিক গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার বাসনায় ও যখন শাঁজেলিজে ধ[illegible] বেড়াচ্ছিলো, তখন হঠাৎ বাচ্চা নিয়ে এক মহিলাকে সেখান দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলো। মহিলা সেই মাদাম ফরেস্তেয়ার—এখনও তেমনি তরুণী, সুন্দরী আর আকর্ষণীয়া। মাদাম লোজেলের অনুভূতিতে ঝড় উঠলো। ও কি এখন বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবে। ধার যখন শোধ হয়ে গেছে, তখন ও সব কথাই খুলে বলবে। কেনই বা বলবে না?

'সুপ্রভাত জিনি,' এগিয়ে এসে বললো ও।

বান্ধবীটি কিন্তু ওকে চিনতে পারলো না, বরং এই পরিচিত সম্বোধন শুনে অবাক হয়ে উঠলো। হোঁচট খেতে খেতে বললো, 'কিন্তু…কিন্তু মাদাম, আমি তো আপনাকে চিনি না। আপনি…আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন…'

'না, আমি মাতিল্দা লোজেল।'

'অ্যাঁ!' বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠলো মাদাম ফরেস্তেয়ার, 'হায় রে বেচারী মাতিল্দা! কত পালটে গেছিস তুই…'

'হ্যাঁ। তোর সঙ্গে শেষবার দেখা করতে যাবার পর থেকে, কিছুদিন আমার ভীষণ দুঃখ-কষ্টে কেটেছে—আর তা সব কিছুই তোর জন্যে।'

'আমার জন্যে? কি রকম?'

'কমিশনারের বল নাচে পরে যাবার জন্যে তুই যে আমাকে হীরের মালাটা ধার দিয়েছিলি, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, ভালো করেই মনে আছে।'

'সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

করতে

নেই তা

কিছু মিটে

মাদাম

বদলে দেবা ... হীরের মালা কিনেছিলি,

'হ্যাঁ। তুই তখন বুঝতে পারিসনি তো? একেবারে এক রকম দেখতে।' গর্ব আর সহজ আনন্দের হাসি হাসলো মাতিলদা।

অভিভূত মাদাম ফরেস্তেয়ার ওর হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নিলো, 'হায় রে, বেচারী মাতিলদা! আমার হারটা যে নকল ছিলো! ওটার দাম পাঁচশো ফ্রাঁর একটুও বেশি নয়!'

সমাপ্ত